চিন্তার স্বাধীনতার ইতিহাস

জে.বি.বিউরি

রাজশাহী ও হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপনা করেছেন প্রায় তিরিশ বছর।

কেম্ব্রিজ ইতিহাসবিদ জে বি বিউরি রচিত *আ হিস্ট্রি অফ থট ইউরোপে* মুক্তবুদ্ধি চর্চার দীর্ঘ সংগ্রামের এক বিশিষ্ট ধারাভাষ্য। প্রাচীন কাল থেকে বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত ইউরোপ মহাদেশে চিন্তার স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে গৌরবময় লড়াই চলেছিল সেই ইতিহাসমুখর দক্ষতা ও নিখুঁত বিশদের সাথে এখানে উপস্থাপিত। এ গ্রন্থে লেখক মুক্তচিন্তার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। এ কারণে প্রাচীন গ্রেকো-রোমান সভ্যতার প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব লক্ষণীয়। পক্ষান্তরে খ্রিস্টধর্মের কর্তৃত্বাধীন মধ্যযুগীয় ইউরোপের প্রতি তাঁর বিরাগ সুস্পষ্ট। শেষ অধ্যায়ে বিউরি চিন্তার স্বাধীনতার সপক্ষে জোর সওয়াল করেছেন। তাঁর মতে মুক্তচিন্তার সামাজিক উপযোগিতা রয়েছে এবং মানব জাতির প্রগতির স্বার্থে স্বাধীন চিন্তা ও অবাধ আলোচনার সুযোগ থাকা জরুরি।

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ইউরোপেই সবচেয়ে দীর্ঘ, সংগ্রামমুখর ও ফলপ্রসূ হয়েছিল। বিশ্বসভ্যতায় পাশ্চাত্য যেসব অমূল্য অবদান রেখেছে তার মধ্যে মুক্তবুদ্ধি চর্চার অধিকার বিশিষ্টতম। বিজ্ঞান-মনস্কতা, গণতন্ত্র, মানববাদ, ইহজাগতিকতা, প্রগতির এষণা ও অভ্যুদয় মুক্তবুদ্ধি চর্চার ফসল। উদার গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল, মানবধর্মী, আধুনিক বাংলাদেশ নির্মাণের যে অঙ্গীকার আমাদের আছে, তার অনুকূলে অধ্যাপক বিউরির এই ক্ষীণতনু অথচ তথ্যঋদ্ধ পুস্তকখানি মূল্যবান অবদান রাখতে পারে।

চিন্তার স্বাধীনতার ইতিহাস

(A History of Freedom of Thought)

মূল

জে. বি. বিউরি

অনুবাদ

প্রীতি কুমার মিত্র

বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪১৪/জুন ২০০৭

বাএ ৪৫৯১

[অর্থবর্ষ ২০০৬-২০০৭ পাঠ্যপুস্তক : মাসাআবা উপবিভাগ : ২১]

মুদ্রণ সংখ্যা : ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
মানবিকীবিদ্যা, সামাজিকবিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ

প্রকাশক
ড. আবদুল ওয়াহাব
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
মোবারক হোসেন
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস

প্রচ্ছদ
মাফরুহা বেগম

মূল্য
আশি টাকা মাত্র

CHINTAR SWADHINATAR ITIHAS (A History of Freedom of Thought) By J.B. Bury Translated by Priti Kumar Mitra. Published by Dr. Abdul Wahab, Director (Incharge), Textbook Division, Bangla Academy Dhaka, Bangladesh. First Published : June 2007. Price : Tk.80.00 only

ISBN 984-07-4600-6

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও নিরন্তর হিতৈষী
প্রফেসর এ.এফ. সালাহ্উদ্দীন আহ্মদকে
গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে উৎসর্গিত
—প্রীতি কুমার মিত্র

সূচিপত্র

সম্পাদকের মুখবন্ধ			নয়
প্রথম অধ্যায়	:	চিন্তার স্বাধীনতা ও বিরোধী শক্তি	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	স্বাধীন যুক্তির যুগ : গ্রীস ও রোম	৮
তৃতীয় অধ্যায়	:	যুক্তির বন্দিদশা (মধ্যযুগ)	২৩
চতুর্থ অধ্যায়	:	পুনরুদ্ধারের প্রত্যাশা রেনেসাঁস ও রিফর্মেশন [বা ধর্মসংস্কার]	৩৩
পঞ্চম অধ্যায়	:	ধর্মীয় সহিষ্ণুতা	৪৬
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	যুক্তিবাদের বিকাশ (সতেরো ও আঠারো শতক)	৬৪
সপ্তম অধ্যায়	:	যুক্তিবাদের অগ্রগতি (উনিশ শতক)	৯০
অষ্টম অধ্যায়	:	চিন্তার স্বাধীনতার যৌক্তিকতা	১১৮
গ্রন্থপঞ্জি			১২৮

অনুবাদকের মুখবন্ধ

জন ব্যাগনেল বিউরি (১৮৩২–১৯২৭) দীর্ঘ পঁচিশ বছর (১৯০২–১৯২৭) কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ইতিহাসের রেজিয়াস প্রফেসর ছিলেন। তাঁর ইতিহাস চর্চার ব্যাপকতা ছিল বিস্ময়কর। গ্রীক ও রোমান ইতিহাসের বিশাল ক্ষেত্র ছাড়াও তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস নিয়ন্ত্রক চর্চায় মূল্যবান অবদান রেখেছেন। ইতিহাসের তাত্ত্বিক হিসেবেও তাঁর নিষ্ঠা ও নৈপুণ্য রয়েছে। বিউরির গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলির মধ্যে আছে *হিস্ট্রি অব গ্রীস* [গ্রীসের ইতিহাস] (১৮৭৫), *হিস্ট্রি অব দ্য লেটার রোমান এম্পায়ার* [পরবর্তী রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাস] (২ খণ্ড, ১৮৮৩, ১৮৯৩), *হিস্ট্রি অব দ্য ইস্টার্ন রোমান এম্পায়ার* [প্রাচ্য রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাস] *অ্যান্সিয়েন্ট গ্রীক হিস্টরিয়ান্স* [প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকগণ] (১৯০০), *হিস্ট্রি অব ফ্রিডম অব থট* [চিন্তার স্বাধীনতার ইতিহাস] (১৯১৩), এবং *দ্য আইডিয়া অব প্রগ্রেস* [প্রগতির ধারণা : ঐতিহাসিক পর্যালোচনা] (১৯২০)। এর অতিরিক্ত বিউরি এডওয়ার্ড গিবন [১৭৩৭–১৭৯৪) রচিত *ডেক্লাইন অ্যান্ড ফল অব দ্য রোমান এম্পায়ার* [রোমান সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন (১৭৭৬–১৭৮৮)]–এর একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্করণও প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি *কেম্‌ব্রিজ অ্যান্সিয়েন্ট হিস্ট্রি* [কেমব্রিজ প্রাচীন ইতিহাস]–র একজন সম্পাদক ছিলেন এবং *কেম্‌ব্রিজ মডার্ন হিস্ট্রি* [কেমব্রিজ আধুনিক ইতিহাস]–র পরিকল্পনা করেছিলেন।

ফিললজি বা ভাষাবিজ্ঞানে পারদর্শী প্রফেসর বিউরি যেমন ইতিহাসের উৎসসমূহ ব্যবহার করতে পারতেন স্বচ্ছন্দে, তেমনি ইতিহাসের দর্শন নিয়ে তিনি মৌলিক চিন্তা করেছেন। ইতিহাসের একত্বে আস্থাবান এই ইতিহাসবিদ তাঁর ডিসিপ্লিনকে একটি সার্বভৌম বিজ্ঞান বলে মানতেন। ঐতিহাসিকের উপর জাতীয়তাবাদী ও ধর্মীয় প্রভাবের ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। ইতিহাস দর্শনের দিক থেকে বিউরির উপর দার্শনিক হেগেল (১৭৭০–১৮৩১)–এর প্রভাব ছিল। ফলে তিনি মানব সভ্যতার নিরন্তর প্রগতির ধারণায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন এবং ইতিহাসে ব্যক্তি অপেক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার প্রতি তাঁর মনোযোগ অধিক আকৃষ্ট হয়। অতীত অধ্যয়নকে তিনি বর্তমানের পথনির্দেশের জন্য অপরিহার্য মনে করতেন। এতৎসত্ত্বেও কিছুটা স্বরিরোধী হয়ে বিউরি ইতিহাসে আকস্মিকতা ও আপতনের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে ঘটনার মূলীভূত কারণবাদের প্রতি ক্রমশ উদাসীন হয়ে পড়েন।

'অ্যা হিস্ট্রি অফ ফ্রিডম অফ থট' ১৯১৪ সালে উইলিয়ম্‌স অ্যান্ড নরগেট কর্তৃক লন্ডন থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। রচনাকাল ১৯১৩। লেখকের মৃত্যুর (১৯২৭) অনেক পরে ১৯৫২ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস এর দ্বিতীয় সংস্করণ বের করে। তবে বর্তমান অনুবাদে প্রথম সংস্করণই ব্যবহার করা হয়েছে। এই নাতিদীর্ঘ গ্রন্থে বিউরি প্রাচীনকাল থেকে বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত ইউরোপ মহাদেশে চিন্তার স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ ও বিবর্ণ ইতিহাস দক্ষতা ও বৈশদ্যের সাথে উপস্থাপন করেছেন। গ্রন্থের সর্বত্র মুক্ত চিন্তার সপক্ষে লেখকের দৃঢ় অবস্থান লক্ষণীয়। শেষ অধ্যায়ে বিউরি মুক্ত চিন্তার পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন। সেসব যুক্তিতর্কের সার কথা হলো : ১. মুক্ত চিন্তার সামাজিক উপযোগিতা রয়েছে এবং ২. মানবসভ্যতার প্রগতির (অর্থাৎ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক ক্রমোৎকর্ষের) স্বার্থে চিন্তা ও আলোচনার স্বাধীনতা অপরিহার্য। প্রগতি ও মুক্ত চিন্তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী হওয়া সত্ত্বেও বিউরি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ আশঙ্কামুক্ত হতে পারেননি। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় তাঁর অনুভূত উদ্বেগের যাথার্থ্য অনেকটাই সমর্থিত হয়েছে ঐ শতকের পরবর্তী ইতিহাসে।

ক্ষীণকায় কিন্তু তথ্যসমৃদ্ধ এই পুস্তকের বাংলা অনুবাদে উদ্যোগী হওয়ার পেছনের সরাসরি প্রেরণা রয়েছে অনুবাদকের শিক্ষক প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর এ.এফ. সালাহউদ্দীন আহমদের (জ. ১৯২৪)। চিন্তা চেতনার ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আহমদ মুক্ত চিন্তার ইতিহাসের একটি সফল উপস্থাপনা হিসেবে বিউরির বইটি শনাক্ত করেন এবং সেটির একটি বাংলা ভাষ্য প্রস্তুত করার দায়িত্ব বর্তমান অনুবাদককে দেন। বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসে তাঁর এই ছাত্রের অনেক দিনের উৎসাহ এবং অবাধ্য চিন্তাবিদদের নিয়ে বিদেশে তার গবেষণা সম্ভবত প্রফেসর আহমদের এমন পছন্দের হেতু। যা হোক, নানা কারণে অনুবাদ দ্রুতগামী হতে পারেনি। কয়েক বছরের সবিরাম চেষ্টায় অবশেষে অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়। বিউরির ভাষা উনিশ শতকীয় শৈলীর এবং প্রায়শই দীর্ঘ ও জটিল বাক্যে আকীর্ণ। ভাবাভিব্যক্তিও হামেশাই অপ্রত্যক্ষ। বাংলা অনুবাদে সাবলীলতা আনার চেষ্টায় আক্ষরিকতা পরিহার করা হয়েছে অনেক জায়গায়, তবে মূলের বক্তব্য যাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন, বিকৃত বা অস্বচ্ছ না হয় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়েছে। দুই-এ মিলে একটি মধ্য পন্থা অনুসরণ করেছে এই ভাষান্তর।

বাংলাদেশ জন্মগত ও সাংবিধানিকভাবে যেসব মূল্যবোধ ধারণ করে তার মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বাক্‌স্বাধীনতা আছে। এর অর্থই হচ্ছে চিন্তার বৈচিত্র্য ও আলোচনা-সমালোচনার অবাধ অধিকার। কিন্তু আধুনিক কালের এসব বিশিষ্ট মূল্যবোধ চর্চা করতে হলে ইতিবৃত্তসহ তাদের অর্থ ও তাৎপর্য শিক্ষিত জনগণের কাছে বিশদ হওয়া দরকার। এ জন্যই মুক্ত চিন্তার ইতিহাস জানা জরুরি। বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলন ইউরোপেই সবচেয়ে বেশি দীর্ঘ, সংগ্রাম মুখর, এবং ফলপ্রসূ হয়েছিল। বিশ্ব সভ্যতায় পাশ্চাত্য জগৎ যে সব অবদান রেখেছে তার মধ্যে মুক্ত বুদ্ধি চর্চার অধিকার প্রতিষ্ঠা বিশিষ্টতম। এই মূল থেকেই আধুনিক সভ্যতার অপরাপর আঙ্গিক নিঃসৃত। বিজ্ঞানমনস্কতা, গণতন্ত্র, মানবাবাদ,

উহজাগতিকতা এবং প্রগতির এষণা ও অভ্যুদয় মুক্তবুদ্ধি চর্চার ফসল। এবং এসবসহ প্রগতিময় মানবসভ্যতার নিরন্তর বিকাশও নির্ভর করছে মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তির অবাধ কর্ষণের উপর। গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল, মানবতাবাদী, আধুনিক বাংলাদেশ নির্মাণের যে প্রত্যয় আমাদের আছে তার পুষ্টি ও দার্ঢ্য নিষ্পাদনের জন্য ইউরোপে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের বিউরিকৃত সারাসারবাণীটির উপযোগিতা আছে বলে অনুবাদকের দৃঢ় বিশ্বাস।

নানা কারণে বাংলাদেশে ইতিহাস চর্চা নিদারুণভাবে সীমিত ও বিক্ষিপ্ত। এ দেশের বুনিয়াদি শিক্ষায় ইতিহাসের স্থান নেই বললেই চলে। ফলে উচ্চ শিক্ষার স্তরেও এখন ইতিহাস একটি আবশ্যিক বিষয় বা কিছু নয়। যেটুকু চর্চা হচ্ছে তাও প্রধানত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কথঞ্চিৎ সাংস্কৃতিক ইতিহাস। বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস চর্চার কোনো সংহত ট্র্যাডিশন এ দেশে গড়ে ওঠেনি। কিন্তু মানব সভ্যতায় চিন্তাধারার ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চেতনা ও মননের ঐতিহাসিক পরিচয় না নিলে ইতিহাসের অন্যান্য শাখায়ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করা যায় না, কারণ মানুষের সকল কীর্তি ও তৎপরতার মূলে থাকে চিন্তাভাবনা ও স্বপ্ন-কল্পনা। বর্তমান অনুবাদ কর্মটি বাংলাদেশে বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস চর্চায় প্রেরণা যোগাতে পারে। বাস্তব ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ বাংলা মাধ্যমে ইতিহাস, দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের উচ্চশিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের কাজে লাগবে এমনটা অনুমান করা যায়।

অনুবাদ করতে গিয়ে যেসব সমস্যার মুখোমুখি পড়তে হয়েছে সেগুলোর মোকাবেলায় কিছু কাজ করা হলো। যেমন, বিশেষ কিছু শব্দের বাংলা অনুবাদের পাশে বন্ধনীতে মূল ইংরেজি দিয়ে দেয়া হলো। তারপরও একটি গ্লসারির মাধ্যমে অনুবাদে অনুসৃত প্রতিশব্দ নীতি স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। মূলের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অভিমত নিম্নরেখ করে দেয়া হয়েছে। ব্যক্তিনামের পাশে (সম্ভবস্থলে) তৃতীয় বন্ধনীতে জীবনকাল (আংশিক) শাসনকাল উল্লেখ করা হলো। পাঠকের কাছে মূল গ্রন্থের বক্তব্য সহজ করার জন্য অনেক নতুন পাদটীকা (তৃতীয় বন্ধনী বেষ্টিত) যোগ করা হলো। পাদটীকাগুলি অধ্যায় শেষে অন্ত্যটীকা রূপে সন্নিবেশিত হলো। সংযোজনের ফলে টীকার ক্রমিক পরিবর্তিত হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জি এবং নির্ঘণ্টটিও পরিবর্ধিত আকারে লেখা হলো। অনুবাদকের সকল সংযোজনই সম্ভব মতো তৃতীয় বন্ধনী দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

এ বই অনুবাদ করার মূল প্রেরণা দানের জন্য এবং অনুবাদের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও উৎসাহ দানের জন্য আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবী প্রফেসর এ.এফ. সালাহউদ্দীন আহমদের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য, তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অনিঃশেষ। অনুবাদ কর্মে অপর উৎসাহদাতা ছিলেন বিশিষ্ট লেখক ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের তৎকালীন পরিচালক প্রফেসর শহীদুল ইসলাম। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজে আমার সহকর্মী ও বাংলার অধ্যাপক ড. স্বরোচিষ সরকার অনুবাদ-পরবর্তী সংশোধন কাজে সাহায্য করেছেন। তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। অনুবাদ চলতে থাকাকালে

প্রথম কয়েকটি অধ্যায় প্রকাশ করে 'ইতিহাস পরিষদ' পত্রিকার সম্পাদনা কর্তৃপক্ষ আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

অনুবাদে ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য আঙ্গিকে গ্রন্থটিতে ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তেমনি হয়ে থাকলে ভুলভ্রান্তি ও অসঙ্গতির দায়িত্ব অনুবাদকের। তবে প্রকাশের পরে গ্রন্থটি যদি আদৃত হয় এবং এটির যথাযোগ্য নিরীক্ষা ও সমালোচনা হয়, তখনই একটি পরিমার্জিত সংস্করণ প্রস্তুত করার অবকাশ সৃষ্টি হবে।

রাজশাহী
২৫ জুন ২০০৭

প্রীতি কুমার মিত্র
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম অধ্যায়

চিন্তার স্বাধীনতা ও বিরোধী শক্তি

সাধারণত বলা হয়ে থাকে চিন্তা অবাধ। যা খুশি তাই চিন্তা করা থেকে কোনো মানুষকে বাধা দেয়া যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার চিন্তা-ভাবনা গোপন রাখে। তার অভিজ্ঞতার চৌহদ্দি আর কল্পনাশক্তি দ্বারাই কেবল তার মনের কাজ-কর্ম সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু ব্যক্তিগত চিন্তার ক্ষেত্রে এই প্রাকৃতিক স্বাধীনতার মূল্য অতি সামান্য, ভাবুক যদি তার চিন্তা-ভাবনা অপরকে জানাতে না পারে তবে তা তার নিজের কাছে অতি অতুষ্টিকর, এমন কি যন্ত্রণাদায়ক হয়। আর তার পরিপার্শ্বের লোকের কাছে স্পষ্টতই ঐ চিন্তার কোনো মূল্য থাকে না। তাছাড়া মনের উপর যেসব চিন্তার কিছুমাত্র প্রভাব আছে সেগুলো লুকিয়ে রাখা খুবই শক্ত। যদি কোনো ব্যক্তির চিন্তা ভাবনা তাকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যায় যে তার পরিপার্শ্বের মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করছে যেসব ধ্যান-ধারণা ও প্রথা সেগুলি সম্পর্কে সে প্রশ্ন তোলে, তারা যেসব বিশ্বাস পোষণ করে সেগুলি সে প্রত্যাখ্যান করে, তারা যে জীবন-পদ্ধতি অনুসরণ করছে সে তার চেয়ে ভালো পদ্ধতির সন্ধান পায়, এবং যদি সে তার নিজ যুক্তির অভ্রান্ততা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে থাকে, তাহলে নীরবতা, হঠাৎ উক্তি, কিংবা সাধারণ ভাবভঙ্গির মাধ্যমে সে প্রকাশ না করে পারবে না যে, সে তাদের থেকে আলাদা এবং তাদের মতামতের শরিক নয়। সক্রেটিস [৪৭০-৩৯৯ খ্রি.পূ.]-এর মতো কেউ কেউ অতীতে স্বীয় চিন্তা-ভাবনা গোপন করার চেয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়াকেই অধিক পছন্দ করেছেন, এবং আজকের দিনেও কেউ কেউ তা করবেন। তাই যে-কোনো মূল্যবহ অর্থে চিন্তার স্বাধীনতার মধ্যে বাক্‌স্বাধীনতাও রয়েছে।

বর্তমানে সবচেয়ে সভ্য দেশগুলিতে বাক্‌স্বাধীনতাকে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার বলে ধরে নেয়া হয়, এবং এটি একটি একান্ত সরল-সোজা জিনিস বলেই মনে হয়। আমরা [অর্থাৎ ব্রিটেনের অধিবাসীরা] বাক্‌স্বাধীনতায় এতই অভ্যস্ত যে একে আমরা প্রাকৃতিক অধিকার বলেই মনে করি। কিন্তু এই অধিকারটি নেহাত সাম্প্রতিককালেই মাত্র লাভ করা গেছে এবং যে পথে এটির অর্জন সম্ভব হয়েছে তা অনেক রক্তগঙ্গা পার হয়ে এসেছে। ব্যক্তির নিজস্ব মতামত প্রকাশ ও সকল প্রশ্ন আলোচনা করার স্বাধীনতা যে একটি ভালো বৈ খারাপ জিনিস নয়, তা সবচেয়ে আলোকপ্রাপ্ত জনগণকেও বিশ্বাস করাতে শতাব্দীর পর শতাব্দী লেগে গেছে। মানব সমাজসমূহ (কতিপয় উজ্জ্বল ব্যতিক্রম অবশ্য আছে) সাধারণত চিন্তার স্বাধীনতার কিংবা অন্য কথায়, নতুন ভাবধারার বিরোধী থেকে গেছে, এবং কেন তা বোঝা কঠিন নয়।

সাধারণ মস্তিষ্ক স্বভাবতই অলস এবং সবচেয়ে কম প্রতিরোধের পথ ধরতেই আগ্রহী। সাধারণ মানুষের মনের জগৎটি গড়ে ওঠে কতিপয় বিশ্বাস নিয়ে যেগুলো সে কোনো প্রশ্ন না করেই মেনে নেয় এবং সেগুলোর প্রতি সে দৃঢ়ভাবে আসক্ত থাকে। এই পরিচিত জগতের

প্রতিষ্ঠিত বিন্যাসটি লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে এমন কোনো কিছুর প্রতি সে সহজাত প্রবৃত্তিবশেই প্রতিকূল। তার পোষিত কোনো কোনো বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন নতুন ধারণার অর্থই হচ্ছে তার মনের পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা ; আর এই প্রক্রিয়া শ্রমসাপেক্ষ যাতে কষ্ট করে মগজ খাটানোর দরকার হয়। সে এবং তার মতো আর সব লোক যাদের নিয়ে জনগণের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ গঠিত, তাদের কাছে নতুন ধ্যান–ধারণা এবং মতামত যেগুলি প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক করে সেগুলি অশুভ বলে প্রতিভাত হয়, কেননা তারা বেমানান।

নিছক মানসিক আলস্যজনিত বিমুখতা একটা প্রত্যক্ষ ভীতির অনুভূতি দ্বারা আরো বেড়ে ওঠে। সহজাত রক্ষণশীল মনোভাব পরিণতি পায় এক কঠিন রক্ষণশীল মতবাদে, যার মূল কথা হচ্ছে এই যে, কাঠামোতে কোনো ধরনের পরিবর্তন সমাজের ভিত্তিমূলকে বিপন্ন করে। নেহাত সাম্প্রতিককালেই মাত্র মানুষেরা এই বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে শুরু করেছে যে, রাষ্ট্রের কল্যাণ নির্ভর করে দৃঢ় স্থিতিশীলতার উপর এবং এর ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠানসমূহ অপরিবর্তিতরূপে সংরক্ষণের উপর। যেখানেই ঐ বিশ্বাস আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে সেখানে নতুন মতামতকে বিপজ্জনক তথা বিরক্তিকর বলে অনুভব করা হয় ; এবং কেউ পরিগৃহীত নীতি সম্পর্কে 'কেন' ও 'কি কারণে' প্রশ্ন উত্থাপন করে ঝামেলা বাড়ালে তাকে মারাত্মক লোক বলে ভাবা হয়।

রক্ষণশীল প্রবৃত্তি এবং তার পরিণতিতে উদ্ভূত রক্ষণশীল মতবাদ শক্তি পায় কুসংস্কার থেকে। যদি সমুদয় প্রথা ঈশ্বর কর্তৃক সংরক্ষিত ধরে নেয়া হয়, তাহলে সমাজ ব্যবস্থার সমালোচনা অধার্মিকতার আলামত হিসেবে বিবেচিত হয়। আর ধর্মীয় বিশ্বাসের সমালোচনা তো অতি প্রাকৃত শক্তির রোষের প্রতি সরাসরি চ্যালেঞ্জ।

যে মনস্তাত্ত্বিক প্রেরণা নতুন ধ্যান–ধারণা বিরোধী রক্ষণশীল চেতনার জন্ম দেয়, তা সমাজের বিশেষ বিশেষ শক্তিধর অংশের—যেমন একটা শ্রেণী, একটা জাত, কিংবা একটা যাজক সম্প্রদায় যাদের স্বার্থ বাধা আছে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা ও যেসব ধ্যান–ধারণার উপর তা দাঁড়িয়ে আছে সেগুলি বহাল রাখার সাথে তাদের—সক্রিয় পরিবর্তন–বিরোধী তৎপরতার ফলে বলীয়ান হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক, কোনো জাতি বিশ্বাস করে যে সূর্যগ্রহণ হচ্ছে তাদের দেবতা কর্তৃক তাদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্য জ্ঞাপনের বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সংকেত। এমন সময় জনৈক বুদ্ধিমান ব্যক্তি গ্রহণের আসল কারণটি বের করে ফেলেন। তখন ঐ ব্যক্তির স্বদেশবাসীরা প্রথমত তাঁর আবিষ্কারকে অপছন্দ করে, কারণ তারা লক্ষ্য করে যে এই নতুন আবিষ্কারকে তাদের অন্যান্য ধারণার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া অত্যন্ত কঠিন ; দ্বিতীয়ত, এটা তাদের বিরক্তি উৎপাদন করে, কারণ যে ব্যবস্থাকে তারা তাদের সম্প্রদায়ের জন্য খুবই সুবিধাজনক বলে মনে করে তা ঐ আবিষ্কারের ফলে বিপর্যস্ত হয় ; শেষত, তাদের দেবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে ঐ আবিষ্কার তাদেরকে আতঙ্কিত করে। পুরোহিতকুল, যাঁদের কাজের মধ্যে একটি হচ্ছে দৈব সংকেতসমূহ ব্যাখ্যা করা, তাঁরা স্বভাবত ভয় পেয়ে যান এবং যে মতবাদ তাঁদের ক্ষমতার প্রতি হুমকি হয়ে দেখা দেয় তার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে ঐসব রক্ষণশীল প্রেরণা প্রবলভাবে সক্রিয় থেকে প্রগতিশীল গোষ্ঠীগুলির পরিবর্তনের গতিকে অবশ্যই শ্লথ করে দিয়েছিল, এবং কোনো কোনো গোষ্ঠীকে মোটেই এগোতে দেয়নি। আবার ঐতিহাসিক যুগেও তারা বরাবর কমবেশি সক্রিয় থেকে

জ্ঞান ও প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে এসেছে। আজ আমরা তাদের ক্রিয়াশীল দেখতে পাই সবচেয়ে অগ্রণী সমাজগুলিতেও, যেখানে অবশ্য উন্নয়নের গতিরোধ করার কোনো ক্ষমতা এখন আর তাদের নেই। আমরা এখনো এমন মানুষের দেখা পাই যারা যেকোন নতুন ভাবনাকে একটা উৎপাত এবং হয়তো বা একটা বিপদ বলে মনে করে। যারা সমাজতন্ত্রের প্রতি বিমুখ তাদের মধ্যে এমন কতোজন আছে যারা কখনো এর সপক্ষের ও বিপক্ষের যুক্তি-তর্কগুলো পরীক্ষা করে না দেখেই বিরক্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে নিছক এই কারণে যে, ধারণাটি তাদের মনের জগৎকে বিপর্যস্ত করে এবং সবকিছুর যে বিন্যাসের সাথে তারা পরিচিত তার কঠোর সমালোচনার ইঙ্গিত দেয়? আর এমন কতো লোক রয়েছে যারা আমাদের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাবলী পরিবর্তনের যেকোন প্রস্তাব বিবেচনায় আনতে অস্বীকার করবে, কারণ এরকম অভিপ্রায় ধর্মীয় বিধিবিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিপুল পরিমাণ কুসংস্কারকে আক্রমণ করে? তারা সঠিক হতে পারে বা তা না হতে পারে, কিন্তু যদি তারা সঠিক হয় তবে সেটা তাদের দোষ নয়। আসলে তারা সেই একই উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত যা আদিম সমাজে প্রগতির বিরুদ্ধে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাঁরা সব সময় নতুন ভাবনা চিন্তার সন্ধান করেন এবং তা আরো বেশি পরিমাণে নেই বলে দুঃখ করেন, তাদেরই পাশাপাশি স্বাধীনতার বা তাবরণে লালিত [প্রগতিবিরোধী] মনোবৃত্তির মানুষের অস্তিত্ব থেকেই আমরা অনুমান করতে সক্ষম হই যে, যখন জনমত এই সব লোকের মতামত দ্বারাই গঠিত হতো, তখন চিন্তা কতোটা শৃংখলিত ছিল এবং জ্ঞানের পথে বাধাবিঘ্ন কতো বিশাল ছিল।

যদিও কর্তৃত্ব কিংবা আশপাশের মানুষের কুসংস্কারকে অগ্রাহ্য করে যেকোনো বিষয়ের উপর নিজ মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা এখন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি, ঐ স্বাধীনতা পরিত্যাগ করার পরিবর্তে আমৃত্যু যুদ্ধ করতে যাঁরা প্রস্তুত তাঁদের মধ্যে (আমি অনুমান করি) অল্প সংখ্যকই এটিকে যুক্তি দ্বারা প্রতিরক্ষা দিতে পারবেন। বাক্‌স্বাধীনতা যে মানুষের একটি স্বাভাবিক ও অপরিত্যাজ্য জন্মগত অধিকার একথা আমরা বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে পটু, এবং সম্ভবত ভাবতে পটু যে এর বিরুদ্ধে যা কিছু বলা যেতে পারে তার সবটারই যথেষ্ট জবাব এটাই। কিন্তু একথা উপলব্ধি করা দুষ্কর যে কিভাবে এমন একটি অধিকার যুক্তি দিয়ে প্রতিপাদন করা যায়।

যদি একজন মানুষের 'স্বাভাবিক অধিকার' বলে কিছু থেকে থাকে, তাহলে স্বীয় জীবন রক্ষা করার অধিকার এবং সন্তান উৎপাদনের অধিকার অবশ্যই তার মধ্যে পড়ে। তবুও মানুষের সমাজ এই উভয় অধিকার চর্চার ব্যাপারে তার সদস্যদের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে থাকে। অভুক্ত মানুষকে বাধা দেয়া হয় সেই খাদ্য গ্রহণ করতে যা অন্য কারো জিনিস। বাছ-বিচারহীন বংশবৃদ্ধি সীমিত করা হয় নানারকম আইন ও প্রথা দ্বারা। এটা স্বীকার করে নেয়া হয়েছে যে এসব প্রাথমিক অধিকার সীমিতকরণে সমাজের ভূমিকা ন্যায্য, কারণ এরকম বাধানিষেধ ছাড়া কোনো সুশৃঙ্খল সমাজ টিকে থাকতে পারতো না। তাই, যদি আমরা মেনে নিই যে মত প্রকাশ ঐ একই ধরনের একটি অধিকার, তাহলে ঐ যুক্তিতে এটি হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকার দাবি করতে পারে, কিংবা একে নিয়ন্ত্রণ করতে যাওয়া সমাজের পক্ষে অন্যায় কাজ—এমন তর্ক তোলা অসম্ভব। কিন্তু এই বিবেচনা বড্ড বেশি বিস্তৃত। কারণ যেখানে অন্য ক্ষেত্র দুটিতে সীমিতকরণ প্রত্যেক ব্যক্তির আচরণকে প্রভাবিত করে, সেখানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর বিধি-নিষেধ আরোপ প্রভাবিত করে তুলনামূলকভাবে

অল্পসংখ্যক মানুষকে যাঁদের বিপ্লবাত্মক কিংবা প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধ কোনো মত রয়েছে প্রকাশের জন্যে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, 'স্বাভাবিক অধিকারের' ধারণার উপর ভিত্তি করে কোনো অকাট্য যুক্তি দাঁড় করানো সম্ভব নয়, কারণ তা সমাজ ও তার সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক সংক্রান্ত এমন এক তত্ত্বের সাথে সম্পৃক্ত যা যুক্তির ধোপে টেকে না।

অপরপক্ষে, যাঁদের উপর সমাজ শাসনের দায়িত্ব ন্যস্ত আছে তাঁরা যুক্তি দেখাতে পারেন যে, যে কোনো সমাজবিরোধী কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা যেমন তাঁদের কর্তব্য, তেমনি মারাত্মক ক্ষতিকর মতামতের প্রচার রোধ করাও তাঁদের দায়িত্ব। তাঁরা আরো যুক্তি দেখাতে পারেন যে, একজন মানুষ তার প্রতিবেশীর ঘোড়া চুরি করে বা প্রতিবেশীর স্ত্রীর প্রতি প্রেম নিবেদন করে যতোটা ক্ষতি করতে পারে, তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি করতে পারে সমাজবিরোধী মতামত প্রচার করে। রাষ্ট্রের মঙ্গলের দায়িত্ব তাঁদের উপর, এবং তাঁদের যদি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, যে সব রাজনৈতিক, ধর্মীয়, বা নৈতিক ধারণার উপর সমাজ প্রতিষ্ঠিত সেগুলির প্রতি হুমকি স্বরূপ হওয়ায় কোনো কোনো মত সত্যিই বিপজ্জনক, তা হলে অন্য যেকোনো বিপদের মতো ঐ মতের বিরুদ্ধেও সমাজকে প্রতিরক্ষা দেওয়া তাঁদের কর্তব্য।

চিন্তার স্বাধীনতা সীমিতকরণের পক্ষে এই তর্কের প্রকৃত জবাব যথাসময়ে স্পষ্ট হবে। এ বিষয়টি কখনো সুস্পষ্ট ছিল না। মানুষের মতামত দমন করা একটি ভুল পদক্ষেপ–এই সিদ্ধান্তে পৌছাতে দীর্ঘ সময়ের দরকার হয়েছিল এবং পৃথিবীর একটি অংশমাত্র এ পর্যন্ত কথাটা বিশ্বাস করেছে। ঐ সিদ্ধান্ত (আমার বিচারে) মানুষ এ যাবৎ যতো সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটা ছিল এমন এক বিষয় যা নিয়ে কর্তৃত্ব (authority) ও যুক্তির মধ্যে চলেছে নিরন্তর সংঘর্ষ, আর সেটিই হচ্ছে এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়। এখানে 'অথরিটি' বা 'কর্তৃত্ব' সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করা প্রয়োজন।

যদি আপনি কাউকে জিজ্ঞেস করেন যে, সে কোনো বিষয় কিভাবে জেনেছে, তখন সে বলতে পারে, "আমি উত্তম অথরিটি বা মান্য কর্তৃত্বের কাছ থেকেই এটা গ্রহণ করেছি ;" অথবা "আমি এ কথা একখানা বই–এ পড়েছি ;" অথবা "এটা সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপার," অথবা "আমি এটা স্কুলে শিখেছি।" এই জবাবগুলির যে–কোনটিরই অর্থ হচ্ছে : সে অপরের দেয়া তথ্য গ্রহণ করে নিয়েছে তাদের জ্ঞানে আস্থা রেখে, তাদের বিবৃতির সত্যতা যাচাই না করে, কিংবা নিজের স্বাধীন চিন্তার সাহায্যে বিষয়টির ফয়সালা না করে। আর অধিকাংশ মানুষের জ্ঞান ও বিশ্বাসের বৃহত্তর অংশ এই ধরনের—অর্থাৎ যাচাই ছাড়াই তাদের মাতা–পিতা, শিক্ষক, পরিচিত লোকজন, বই–পুস্তক, সংবাদপত্র প্রভৃতি থেকে গৃহীত। যখন কোনো ইংরেজ বালক ফরাসি শেখে তখন সে ধাতুরূপ ও শব্দার্থসমূহ তার শিক্ষক কিংবা ব্যাকরণ বই–এর কর্তৃত্ব বা মান্যতার ভিত্তিতে গ্রহণ করে। মানচিত্রে চিহ্নিত একটি নির্দিষ্ট জায়গায় যে কোলকাতা নামে এক জনবহুল নগরী আছে এ তথ্য অধিকাংশ মানুষের কাছে কোনো প্রামাণ্য কর্তৃত্বের বলে গৃহীত একটি সত্য। নেপোলিয়ন বা জুলিয়াস সিজারের অস্তিত্বও এমনই। যাঁরা জ্যোতির্বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্যগুলি ঐ একই উপায়ে [অর্থাৎ কোনো কর্তৃত্বের মান্যতা বলে] জানা হয়ে থাকে। এটা সুস্পষ্ট যে যদি অন্যদের প্রামাণ্য কর্তৃত্বের উপর নির্ভর করে তথ্য গ্রহণ ন্যায্য না হতো, তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তির জ্ঞান অবশ্যই হতো অতি সীমিত।

কিন্তু আমাদের ন্যায্যতা রয়েছে কেবল একটি শর্তের অধীনে। যেসব তথ্য আমরা নিরাপদে গ্রহণ করতে পারি সেগুলিকে অবশ্যই প্রমাণ প্রদর্শন বা যাচাই-এর যোগ্য হতে হবে। আমি উপরে যেসব উদাহরণ দিয়েছি সেগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ছেলেটি যখন ফরাসি দেশে যাবে বা ফরাসি বই পড়তে সক্ষম হবে তখনই সে যাচাই করে নিতে পারবে যে, যেসব তথ্য সে কর্তৃত্বের উপর নির্ভর করে গ্রহণ করেছিল সেগুলি সত্য বটে। প্রতিদিনই আমার সামনে এমন সাক্ষ্য উপস্থিত হয় যা প্রমাণ করে যে আমি যদি একটু কষ্ট করতাম তাহলে কোলকাতার অস্তিত্ব নিজেই যাচাই করে আসতে পারতাম। আমি অবশ্য এই পদ্ধতিতে নেপোলিয়নের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারব না, কিন্তু যদি এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ থাকে তবে একটি সরল যুক্তি প্রক্রিয়া আমাকে দেখিয়ে দেবে যে এমন অজস্র বাস্তব সত্য বিদ্যমান রয়েছে যাদের অস্তিত্ব থাকতেই পারতো না যদি নেপোলিয়ন কখনো না থাকতেন। পৃথিবী যে সূর্য থেকে প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে আছে এ সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নেই, কারণ সকল জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্বীকার করেন যে এ ব্যাপারটি প্রমাণিত হয়েছে, এবং এটি সত্যিই প্রমাণিত হয়েছে এমনটি ধরে নিলেই কেবল তাঁদের ঐক্যমত্যের ব্যাখ্যা মেলে। আমার আর সন্দেহ নেই যে, যদি আমি হিসাবটি করার কষ্টটুকু করতাম তবে আমিও একইরকম ফলে উপনীত হতাম।

কিন্তু আমাদের সকল মানসিক সজ্ঞা এ রকম নয়। গড়পড়তা মানুষের চিন্তা-ভাবনা কেবলমাত্র গ্রহণযোগ্য তথ্যাদি নিয়েই গড়ে ওঠে না, বরং তাতে এমন অনেক বিশ্বাস ও মত থাকে যেগুলি সে কোনো কর্তৃত্বের বরাতে গ্রহণ করেছে এবং তা সে যাচাই বা প্রমাণ করতে পারে না। ঈশ্বরে বিশ্বাস নির্ভর করছে গির্জার কর্তৃত্বের উপর এবং তা স্পষ্টতই কোলকাতার অস্তিত্বে বিশ্বাস থেকে ভিন্ন এক বর্গের অন্তর্গত। আমরা ঐ কর্তৃত্বের নেপথ্যে গিয়ে এটি যাচাই বা প্রমাণ করতে পারি না। যদি আমরা এটি গ্রহণ করি তবে তা করি এই কারণে যে, ঐ কর্তৃত্বের প্রতি আমাদের এমন সন্দেহাতীত বিশ্বাস আছে যে তার দাবিগুলি প্রমাণযোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও আমরা সেগুলিতে আস্থা স্থাপন করি।

পার্থক্যটি এতো স্পষ্ট প্রতীয়মান হতে পারে যে তার উল্লেখও নিরর্থক মনে হবে। কিন্তু এ ব্যাপারটি সম্পর্কে পুরোপুরি পরিষ্কার হওয়া অত্যন্ত জরুরি। যে আদিম মানুষটি তার গুরুজনদের কাছ থেকে জেনেছিল যে পাহাড়ে ভালুক আছে এবং অমনি ভূতও আছে, সে অচিরেই একটা ভালুক দেখে প্রথম উক্তিটির প্রমাণ পেয়ে গেল ; কিন্তু যদি সে কোনো ভূতের সাক্ষাৎ না পেয়ে থাকে তাহলে, নেহাত অতি প্রতিভাবান না হয়ে থাকলে, তার মনে হয়নি যে ঐ দুই উক্তির মধ্যে একটা পার্থক্য ছিল। বরং সে যুক্তি দেখাবে, যদি আদৌ তা সে করে থাকে, যে তার গোষ্ঠীর লোকেরা যেমন ভালুক সম্পর্কে সঠিক ছিল তেমনি ভূত সম্পর্কেও তারা অবশ্যই ছিল নির্ভুল। মধ্যযুগে যে লোক কর্তৃত্বের উপর নির্ভর করে বিশ্বাস করতো যে কনস্ট্যান্টিনোপল নামে এক নগর আছে, এবং ধূমকেতু হচ্ছে ঐশ্বরিক রোষজ্ঞাপক অশুভ সংকেত, সে ঐ দুই ক্ষেত্রে প্রমাণের প্রকৃতির মধ্যে কোনো পার্থক্য নির্ণয় করতো না। এখনো মাঝে মধ্যে আপনি হয়তো এ ধরনের যুক্তি শুনতে পাবেন : যেহেতু কর্তৃত্বের উপর নির্ভর করে আমি কোলকাতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, তাতেই কি কর্তৃত্বের ভিত্তিতে শয়তানে বিশ্বাস করার অধিকার আমার এসে যায়নি ?

সকল কালেই কেবলমাত্র কর্তৃত্ব—যেমন জনমত, গির্জা, বা পবিত্র গ্রন্থ ইত্যাকার কোনো কর্তৃত্বের ভিত্তিতে এমন সব মত গ্রহণ করতে মানুষকে আদেশ করা বা আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, কিংবা সে গ্রহণ করবে বলে আশা করা হয়েছে, যেসব মত প্রমাণিত হয়নি

বা প্রমাণযোগ্য নয়। প্রকৃতি ও মানুষ সংক্রান্ত অধিকাংশ বিশ্বাস যা বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সেগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধর্মীয় ও সামাজিক স্বার্থের সেবা করেছে। আর তাই সেগুলিকে বল প্রয়োগে রক্ষা করা হয়েছে সেইসব মানুষের সমালোচনার হাত থেকে যাদের রয়েছে যুক্তি ব্যবহার করার মতো অস্বস্তিকর অভ্যাস। নিজের প্রতিবেশী প্রমাণযোগ্য সত্যকে অবিশ্বাস করলে কেউ কিছু মনে করে না। যদি কোনো সন্দেহবাদী অস্বীকার করে যে নেপোলিয়ন ছিলেন, কিংবা জল অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন সমন্বয়ে তৈরি, তা হলে সে কেবল কৌতুক বা ব্যঙ্গেরই উদ্রেক করে। কিন্তু সে যদি এমন সব মত অস্বীকার করে যা প্রমাণ করা যায় না—যথা, একজন ব্যক্তি–ঈশ্বরের অস্তিত্ব কিংবা আত্মার অমরত্ব—তাহলে সে গুরুতর অননুমোদন সম্মুখীন হয়, এবং এমন এক সময় ছিল যখন তার মৃত্যুদণ্ডও হতে পারতো। আমাদের কোনো মধ্যযুগীয় বন্ধু যদি কনস্ট্যান্টিনোপলের অস্তিত্বে সন্দেহ করতো তাহলে তাকে শুধু নির্বোধ বলা হতো। কিন্তু যদি সে ধূমকেতুর তাৎপর্য নিয়ে প্রশ্ন তুলতো তাহলে সে অসুবিধায় পড়ে যেতে পারতো। এটাও সম্ভব যে, সে যদি জেরুজালেমের অস্তিত্ব অস্বীকার করার মতো বাতুলতা প্রদর্শন করতো তাহলে সে শুধু উপহাস পেয়েই বেঁচে যেতো না, কারণ বাইবেলে জেরুজালেমের উল্লেখ আছে।

মধ্য যুগে এক বিরাট ক্ষেত্র অধিকার করে ছিল এমন সব বিশ্বাস যেগুলিকে কোনো–না–কোনো কর্তৃপক্ষ সত্য বলে চাপিয়ে দেওয়ার দাবি করতো। আর যুক্তিকে ভয় দেখিয়েই মাঠ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। কিন্তু নিজের প্রতি অবিশ্বস্ত না হলে যুক্তি কখনো স্বেচ্ছাচারী নিষেধাজ্ঞা বা প্রতিবন্ধক মেনে নিতে পারে না। অভিজ্ঞতার জগৎই হচ্ছে তার এলাকা, আর এর সকল অংশ যেহেতু একত্রে সংযুক্ত ও পরস্পর নির্ভরশীল, তার পক্ষে এমন কোনো এলাকার অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়া অসম্ভব যেখানে সে পদাচারণ করতে পারবে না। অথবা যে কর্তৃত্বের বিশ্বাসযোগ্যতা সে পরীক্ষা ও অনুমোদন করেনি, তার কাছে নিজের অধিকার ছেড়ে দেওয়াও যুক্তির পক্ষে অসম্ভব।

যুক্তি কর্তৃক সমগ্র চিন্তারাজ্যব্যাপী তার নিরংকুশ অধিকারের আপোষহীন ঘোষণার নাম দেওয়া হয়েছে *যুক্তিবাদ*, এবং শব্দটির সাথে যে একটু কলঙ্কচিহ্ন আজও লেগে আছে তাতেই প্রতিফলিত হয় যুক্তি ও তার বিরুদ্ধে স্থাপিত শক্তিসমূহের মধ্যেকার সংগ্রামের তিক্ততা। শব্দটি সীমাবদ্ধ রয়েছে ঈশ্বরতত্ত্বের ক্ষেত্রে, কারণ ঐ ক্ষেত্রটিতেই যুক্তির নিজ অধিকার ঘোষণার বিরোধিতা করা হয়েছিল সবচেয়ে বেশি প্রচণ্ডতা ও একগুঁয়েমির সাথে। একইভাবে মুক্তচিন্তা, অর্থাৎ চিন্তা কর্তৃক নিজ কর্তৃত্ব ব্যতীত অন্য কোনো কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে অস্বীকার করা—নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরতত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত। উক্ত সংঘর্ষে বরাবরই কর্তৃত্বের ছিল প্রচুর সুযোগ–সুবিধা। যুক্তিকে সত্যিই গুরুত্ব দেয় এমন লোকেরা সবসময়ই ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু হয়ে এসেছে এবং সম্ভবত আগামীতে অনেকদিন পর্যন্ত এমনই চলবে। যুক্তির একমাত্র অস্ত্র ছিল তর্ক। অপরদিকে কর্তৃত্ববান পক্ষও নৈতিক সহিংসতা প্রয়োগ করেছে, আইনগত দমন চালিয়েছে, এবং সামাজিক অসন্তোষকে কাজে লাগিয়েছে। কখনো কখনো সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর অস্ত্র নিজে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে, আর তা করতে গিয়ে নিজেকেই আহত করেছে। বস্তুত কর্তৃত্বের কৌশলগত অবস্থানে সবচেয়ে দুর্বল জায়গাটি ছিল এই যে, তার সমর্থকেরা মানুষ বলেই যুক্তির প্রক্রিয়া ব্যবহার না করে পারেনি, ফলে তারা নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতি যুক্তিকে সুযোগ এনে দিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে শত্রুর শিবিরে প্রকাশ্যত শত্রুর সপক্ষে কাজ করতে গিয়ে যুক্তি তার নিজের বিজয়ের পথই প্রস্তুত করে নিয়েছে।

আপত্তি উঠতে পারে যে, কর্তৃত্বের একটা বৈধ এলাকা রয়েছে যা এমন সব মতবাদ নিয়ে গঠিত যেগুলি মানবীয় অভিজ্ঞতার বাইরে পড়ে বলে প্রমাণ বা যাচাই করা যায় না, কিন্তু সেই সাথে আবার সেগুলিকে ভুল প্রতিপন্ন করাও অসম্ভব। ভুল প্রমাণ করা যায় না এমন যেকোনো সংখ্যক প্রস্তাব অবশ্যই উদ্ভাবন করা যায়, এবং প্রভূত বিশ্বাসের অধিকারী যেকোনো ব্যক্তির জন্য সেগুলিতে বিশ্বাস স্থাপনের দরজা খোলা ; কিন্তু কেউই এমন মত পোষণ করবেন না যে তাদের অসত্যতা প্রদর্শিত না হওয়া পর্যন্ত সেগুলি বিশ্বাসযোগ্য। আর যদি তাদের মধ্যে কোনো কোনোটি বিশ্বাসযোগ্য হয়, তাহলে একমাত্র যুক্তি ব্যতীত আর কে ঠিক করে দেবে সেগুলি কোনগুলি? উত্তর যদি হয় 'কর্তৃত্ব' তাহলে আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হই তা হচ্ছে এই যে, কর্তৃত্ববান পক্ষ সমর্থন করে এমন অনেক বিশ্বাসই শেষ পর্যন্ত ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে ও এখন সেগুলি সার্বজনীনভাবে পরিত্যক্ত। তথাপি কিছু লোক এমনভাবে কথা বলেন যেন মিথ্যা প্রমাণ করতে পারার আগে কোনো ঈশ্বরতত্ত্বীয় মত প্রত্যাখ্যান করা আমাদের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হবে না। কিন্তু প্রমাণের দায়িত্ব প্রত্যাখ্যানকারীর উপর বর্তায় না। আমার মনে পড়ে একটি সংলাপের কথা যেখানে নরক সম্পর্কে কোনো অশ্রদ্ধ মন্তব্য করা হলে সেই অধিষ্ঠানের জনৈক অনুগত সুহৃৎ বিজয়ীর ভঙ্গীতে বললেন : "কিন্তু আজগুবি বলে প্রতিভাত হলেও, আপনি তো এটা অপ্রমাণ করতে পারেন না।" যদি আপনাকে বলা হয় যে, লুব্ধক নক্ষত্রের চারদিকে আবর্তনশীল কোনো এক গ্রহে বাস করে এক গর্দভ জাতি যারা ইংরেজি ভাষায় কথা বলে এবং সুপ্রজনন বিদ্যার আলোচনা করে সময় কাটায় আপনি ঐ বিবরণ মিথ্যা প্রমাণ করতে পারলেন না ; কিন্তু তাই বলে ঐ কারণে সেটির বিশ্বস্ততার দাবি থাকতে পারে কি? যথেষ্ট ঘন ঘন কথাটার পুনরাবৃত্তি করতে পারলে কার্যকর সংকেত–শক্তির প্রভাবে কোনো কোনো মন এটি গ্রহণের জন্য তৈরি হয়ে যাবে। প্রধানত জোরালো পুনরাবৃত্তির (লক্ষ্য করা গেছে, আধুনিক বিজ্ঞাপন রীতির তাত্ত্বিক ভিত্তি এই পুনরাবৃত্তি) দ্বারা খাটানো এই শক্তি কর্তৃত্ব–নির্দিষ্ট মতামত প্রতিষ্ঠা ও ধর্মবিশ্বাস প্রচারের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। সৌভাগ্যক্রমে যুক্তিও এই সহায়তার সুযোগ গ্রহণে সক্ষম।

পরের অধ্যায়গুলিতে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো তা পাশ্চাত্য সভ্যতায় সীমাবদ্ধ। গ্রীসের কথা দিয়ে এর শুরু এবং এতে প্রধান প্রধান পর্যায়গুলোর পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এক বিশাল ও জটিল বিষয়ের এটি সামান্য পরিচয় মাত্র। পর্যাপ্তভাবে আলোচিত হলে ধর্ম, গির্জা, বিরুদ্ধ ধর্মমত ও নির্যাতনের ইতিহাসই শুধু নয়, বরং দর্শন, প্রকৃতি–বিজ্ঞান তথা রাষ্ট্রতত্ত্বের ইতিহাসও এই বিরাট বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হতো। ষোলো শতক থেকে ফরাসি বিপ্লব পর্যন্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা কোনো–না–কোনোভাবে চিন্তার মুক্তির সংগ্রামের সাথে সম্পর্কিত। যেসব বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক শক্তি প্রাচীন সভ্যতার পতনের পর থেকে যুক্তির মুক্তিকে বাধাগ্রস্ত করেছে এবং সহায়তা দিয়েছে—সেগুলির সকল দিক ও পারস্পরিক ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়ার হিসাব–নিকাশ করতে একটি সমগ্র জীবনকালের প্রয়োজন হবে, আর সেগুলি বর্ণনা করতে লেগে যাবে অনেক খণ্ড বই। এক জনের পক্ষে যা করা সম্ভব, এমনকি এর চেয়ে বড় বই লিখলেও একজনের পক্ষে যা করা সম্ভব হতো, তা হচ্ছে ঐ সংগ্রামের সাধারণ গতিপথের পরিচয় দেয়া এবং ঘটনাক্রমে লেখক যে দিকগুলি নিয়ে বিশেষ পড়াশোনা করেছেন তার কোনো–কোনোটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীন যুক্তির যুগ : গ্রীস ও রোম

যদি গ্রীক জাতির কাছে মানব সভ্যতার ঋণ নির্দিষ্ট করে বলতে হয়, তাহলে স্বভাবত সাহিত্য ও শিল্পকলায় তাদের কৃতিত্বের কথাই সর্বপ্রথম আমাদের মনে পড়ে। কিন্তু অধিকতর সত্য জবাব হয়তো এই যে, চিন্তা ও আলোচনার স্বাধীনতার জন্মদাতা হিসেবেই তারা আমাদের গভীরতম কৃতজ্ঞতার পাত্র। কারণ, মননের এই স্বাধীনতা শুধু দর্শনে তাদের কল্পনা, বিজ্ঞানে তাদের অগ্রগতি, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে তাদের পরীক্ষা–নিরীক্ষারই শর্ত ছিল না, এটি তাদের সাহিত্যিক ও শৈল্পিক উৎকর্ষেরও একটি শর্ত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, তাদের সাহিত্য যেমনটি হয়েছে তা হতে পারতো না যদি তাদেরকে জীবনের খোলাখুলি সমালোচনা করতে দেয়া না হতো। তারা যা সত্য সত্যই অর্জন করেছিল তা ছাড়াও, মানুষের কাজকর্মের অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা যে বিস্ময়কর কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল তা যদি তারা নাও করে থাকতো, তাহলেও স্বাধীনতার নীতিটির জোরালো ঘোষণা দেওয়ার জন্যই মানব জাতির হিতকারীদের মধ্যে উচ্চতম সারিতে তাদের স্থান হতো ; কারণ এটি ছিল মানুষের অগ্রগতিতে সবচেয়ে বড় পদক্ষেপগুলির একটি।

কেমন করে গ্রীকরা জগতের প্রতি তাদের মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করলো এবং নিজেদের সমালোচনা ও কৌতূহলের এলাকার কোনো সীমা নির্দেশ করে না দেওয়ার ইচ্ছা ও সাহসের অধিকারী হলো, তা ব্যাখ্যা করার জন্য ঐ জাতির একেবারে আদিম ইতিহাসের যথেষ্ট জ্ঞান আমাদের নেই। তাদের এই বৈশিষ্ট্যকে একটি বাস্তব সত্য হিসেবে আমাদের মেনে নিতে হবে। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে, গ্রীকরা বিভক্ত ছিল বহু সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে যাদের মেজাজ, প্রথা ও আচার–আচরণে ছিল বিরাট বৈচিত্র্য, যদিও তাদের সকলেরই কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। কোনো কোনো গোষ্ঠী অন্যদের তুলনায় রক্ষণশীল বা পশ্চাৎপদ কিংবা অমননশীল ছিল। এই অধ্যায়ে 'গ্রীকরা' বলতে সকল গ্রীককে বোঝানো হয়নি শুধু তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে যারা সভ্যতার ইতিহাসে সর্বাগ্রগণ্য, বিশেষত আইওনীয় ও এথেনীয়গণ।

এশিয়া মাইনরে আইওনিয়া ছিল মুক্তচিন্তার জননক্ষেত্র। ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও ইউরোপীয় দর্শনের শুরু আইওনিয়াতে। এইখানে (খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতকে) প্রাচীন দার্শনিকেরা তাঁদের যুক্তি ব্যবহার করে জগতের উৎপত্তি ও কাঠামোর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা অবশ্য পুরাগত ধারণাসমূহ থেকে তাঁদের মনকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারেননি, কিন্তু তাঁরা গোঁড়া মত ও ধর্ম বিশ্বাসের ধ্বংস সাধনের কাজটি শুরু করেছিলেন। চিন্তার ক্ষেত্রে এই প্রথম কর্মীদের মধ্যে বিশেষ করে জেনোফানিস [খ্রি. পূ. ষষ্ঠ ও ৫ম শতক]–এর নাম উল্লেখ করা যায় (যদিও তিনিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা দক্ষ ছিলেন

এমন নয়), কারণ তাঁর শিক্ষা যে সহ্য করা হয়েছিল তাতেই স্পষ্ট হয় কেমন মুক্ত আবহাওয়ায় এই মানুষগুলি বাস করতেন। নগরী থেকে নগরীতে ঘুরে ঘুরে তিনি দেবদেবী সম্পর্কে জনসাধারণের বিশ্বাসের নৈতিক ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন, আর গ্রীকদের নরত্বারোপমূলক দেবদেবী কল্পনাকে করতেন উপহাস—"যদি ষাঁড়দের হাত থাকতো আর মানুষের মতো ক্ষমতা থাকতো তাহলে তারা দেবতাদেরকে ষাঁড়ের রূপেই তৈরি করতো।" স্বীকৃত দেবতত্ত্বের উপর এই আক্রমণ ছিল প্রাচীন কবিদের সত্যবাদিতার উপরই আক্রমণ, বিশেষত হোমারের উপর, যাঁকে পুরাণশাস্ত্রের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব বলে বিবেচনা করা হতো। যেসব কাজ মানুষে করলে তা চরম অবমাননাকর বলে বিবেচিত হতো, সেসব কাজ তিনি দেবতাদের উপর আরোপ করেছিলেন বলে জেনোফানিস হোমারকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। সনাতন বিশ্বাসের উপর এভাবে হামলা করা ও হোমারকে নীতিহীন বলে নিন্দা করা থেকে তাঁকে বিরত রাখার কোনো চেষ্টা করা হয়েছিল এমন কথা আমরা শুনি না। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে হোমারের কবিতাকে কদাপি ঈশ্বরের বাক্য বলে মনে করা হয়নি। বলা হয়েছে যে, হোমারের রচনাবলী ছিল গ্রীকদের বাইবেল। মন্তব্যটিতে ঠিক আসল সত্যটি ধরা পড়েনি। সৌভাগ্যক্রমে গ্রীকদের কোনো বাইবেল ছিল না এবং এই ঘটনা তাদের স্বাধীনতার একটি অভিব্যক্তি এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত দুই-ই ছিল। হোমারের কবিতাবলী ছিল জাগতিক, ধর্মীয় নয়, আর এও উল্লেখ করা যায় যে সেগুলি উল্লেখযোগ্য ধর্মগ্রন্থসমূহের তুলনায় নীতিহীনতা ও বর্বরতা থেকে মুক্ত। তাদের কর্তৃত্ব ছিল অপরিমেয়, কিন্তু তা পবিত্র গ্রন্থের কর্তৃত্বের মতো বাধ্যতামূলক ছিল না, আর তাই বাইবেলের সমালোচনার মতো হোমারের সমালোচনা কখনো বাধাপ্রাপ্ত হয়নি।

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যেতে পারে স্বাধীনতার আর একটি অভিব্যক্তি ও শর্ত—যাজক শাসনের অনুপস্থিতি। গ্রীসের মন্দিরগুলির পুরোহিতরা কখনই এমন ক্ষমতাধর গোষ্ঠীতে (caste) পরিণত হয়নি, যারা নিজেদের স্বার্থে সমাজের উপর নিপীড়ন চালাতে এবং ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে উচ্চারিত কণ্ঠস্বরকে থামিয়ে দিতে পারে। অযাজকীয় কর্তৃপক্ষ সর্বসাধারণের জন্য অনুষ্ঠিত পূজাপার্বণের সাধারণ নিয়ন্ত্রণভার নিজেদের হাতে রাখতো এবং যদিও কোনো কোনো যাজক পরিবারের হয়তো বড়ো রকমের প্রভাব ছিল, তবু সাধারণত পুরোহিতেরা বাস্তবে ছিল রাষ্ট্রের কর্মচারী, যাদের মতামতের গুরুত্ব অনুষ্ঠানাদির প্রয়োগিক খুঁটিনাটি ব্যতীত অন্য কিছুতে আদৌ ছিল না।

এবার প্রথম দিককার দার্শনিকদের কথায় ফিরে আসি। তাঁরা বেশিরভাগই ছিলেন বস্তুবাদী। তাঁদের কল্পনার বিবরণ যুক্তিবাদের ইতিহাসে একটি আকর্ষণীয় অধ্যায়। দুটি মহৎ নাম নির্বাচন করা যেতে পারে—হেরাক্লিটাস [আ. ৫৪০–আ. ৪৮০ খ্রি. পূ.] ও ডিমোক্রিটাস [আ. ৪৬০–৩৭০ খ্রি. পূ.]। শুধুমাত্র দৃঢ় চিন্তার দ্বারা তাঁরা বিশ্বের দিকে নতুন ভঙ্গিতে দৃষ্টিপাত করার এবং সহজ বুদ্ধির যুক্তিবিহীন ধারণাসমূহকে আঘাত করার জন্য যুক্তিকে প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজে অন্যদের তুলনায় বেশি অবদান রেখেছিলেন। জড় বস্তুসমূহ স্থিতিশীলতা ও স্থায়িত্বের যে বাহ্যিক রূপ আমাদের ইন্দ্রিয়বর্গের সামনে উপস্থাপন করে তা একটি অলীক রূপ, এবং জগৎ ও সকল বস্তু প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে—এই শিক্ষা সর্বপ্রথম হেরাক্লিতাসের কাছ থেকে পাওয়া ছিল চমকে ওঠার মতো ঘটনা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি আণবিক তত্ত্ব উদ্ভাবন করার বিস্ময়কর কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন ডিমোক্রিটাস। এই

তত্ত্ব সতরো শতকে পুনরুজ্জীবিত হয় এবং এটি দার্শনিক কল্পনার ইতিহাসে জড়বস্তু সম্পর্কে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের সর্বাধুনিক তত্ত্বসমূহের সাথে সম্পর্কিত। ধর্মীয় কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেওয়া সৃষ্টি সম্বন্ধীয় কোনো উদ্ভট গল্প এই সব শক্তিমান মস্তিষ্ককে বাধাগ্রস্ত করেনি।

এসব দার্শনিক কল্পনা 'সোফিস্ট' নামে পরিচিত শিক্ষাব্রতীদের পথ প্রস্তুত করে দিয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময়ের পরে তাঁদের দেখা মেলে। নিরন্তর ভ্রমণশীল থেকে তাঁরা গোটা গ্রীসের এখানে সেখানে কাজ করতেন, জনসেবামূলক জীবনের জন্য তরুণদের প্রশিক্ষণ দিতেন, আর তাদেরকে যুক্তি ব্যবহার করতে শেখাতেন। শিক্ষক হিসেবে তাঁদের দৃষ্টিপথে ছিল প্রায়োগিক লক্ষ্যসমূহ। জড় জগতের সমস্যাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাঁরা নজর দিলেন মানবজীবনের সমস্যাসমূহের প্রতি—নৈতিকতা ও রাজনীতির প্রতি। এইখানে তাঁরা সত্য ও ভ্রান্তির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের কঠিন কাজটির মুখোমুখি হলেন। আর তাঁদের মধ্যে যোগ্যতম যাঁরা তাঁরা অনুসন্ধান চালালেন জ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কে যুক্তির যে পদ্ধতি, সেই লজিক বা যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে এবং যুক্তির যে সাধনযন্ত্র সেই বাক্‌শক্তি সম্পর্কে। তাঁদের বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব যা-ই থাকুক না কেন, তাঁদের সাধারণ নীতি ছিল মুক্ত অনুসন্ধান ও মুক্ত আলোচনার নীতি। তাঁরা সবকিছুকেই যুক্তি দিয়ে পরীক্ষা করতে চাইতেন। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে গ্রীসে 'দীপ্তির যুগ' বলা যেতে পারে।

মন্তব্য করা চলে যে, গ্রীকরা বিদেশের যেসব জ্ঞান আহরণ করেছিল তা কর্তৃত্বের প্রতি সন্দেহবাদী মনোভাব বৃদ্ধির ব্যাপারে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। যখন কোনো লোক শুধু তার নিজ দেশের অভ্যাসাদি সম্পর্কেই পরিচিত থাকে, তখন সেগুলি তার কাছে এতোই স্বাভাবিক ব্যাপার বলে প্রতিভাত হয় যে, সে মনে করে সেগুলো প্রকৃতি থেকেই এসেছে। কিন্তু যখন সে বিদেশ ভ্রমণ করে এবং দেখে যে সেখানে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের অভ্যাস এবং আচরণের ভিন্ন মান চালু রয়েছে, তখন সে বুঝতে শুরু করে প্রচলিত রীতিনীতির শক্তি কতো ; সে এই শিক্ষাও লাভ করে যে নৈতিকতা ও ধর্ম শুধু ভৌগোলিক ব্যাপ্তির ব্যাপার মাত্র। এই আবিষ্কার কর্তৃত্বকে দুর্বল করতে সাহায্য করে, অশান্তিকর চিন্তাভাবনার উদ্ভব ঘটায়, যেমনটি হতে পারে খ্রিস্টান হিসেবে বেড়ে ওঠা কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যে উপলব্ধি করতে পারে সে যদি গঙ্গা বা ফোরাত নদীর তীরে জন্মাতো তাহলে সে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মমতে দৃঢ় আস্থাবান হতো।

অবশ্য বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার এ সব আন্দোলন একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল, যেমনটি সকল যুগেই হয়ে থাকে। সর্বত্রই জনসাধারণ অত্যধিক পরিমাণে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। তারা বিশ্বাস করতো যে তাদের নগরগুলির নিরাপত্তা নির্ভর করছে তাদের দেবতাদের প্রসন্নতার উপর। এই কুসংস্কারাত্মক মানসিকতায় যদি আঘাত পড়তো তাহলে সব সময়ই আশঙ্কা থাকতো যে দার্শনিক চিন্তাভাবনা নির্যাতনের শিকার হবে। আর এথেন্সে এটাই ঘটেছিল। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এথেন্স গ্রীসের মধ্যে যে সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল শুধু তাই নয়, বরং সাহিত্য ও শিল্প কলাতেও সবচেয়ে উঁচু স্থানটি দখল করে নিচ্ছিল। এথেন্সে ছিল একটি পূর্ণ বিকশিত গণতন্ত্র। রাজনৈতিক আলোচনা পুরোপুরি মুক্ত ছিল। এ সময়ে এথেন্সকে পরিচালনা করছিলেন রাষ্ট্রনায়ক পেরিক্লিস [রাজ. ৪৬১-৪২৯ খ্রি. পূ.] যিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে একজন

মুক্ত চিন্তাব্রতী ছিলেন, অথবা অন্ততপক্ষে তখনকার সকল বিধ্বংসী ধ্যান-ধারণার সাথে পরিচিত ছিলেন। বিশেষত তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল দার্শনিক আনাক্সাগোরাস [আ. ৫০০—আ. ৪২৮ খ্রি.পূ.]-এর সাথে, যিনি আইওনিয়া থেকে এথেন্সে এসেছিলেন শিক্ষকতা করতে। প্রচলিত দেবদেবী সম্পর্কে তিনি ছিলেন পুরোদস্তুর অবিশ্বাসী। পেরিক্লিসের রাজনৈতিক শত্রুরা তাঁকে আঘাত করতে আক্রমণ করলো তাঁর বন্ধুকে। তারা ধর্মদ্রোহিতার বিরুদ্ধে এই মর্মে এক আইনের প্রস্তাব আনলো ও তা পাশ করিয়ে নিল যে, অবিশ্বাসীদের এবং যারা স্বর্গীয় জগৎ সম্পর্কে নানা তত্ত্ব প্রচার করে তাদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগে মোকদ্দমা আনা যেতে পারে। আনাক্সাগোরাস শিক্ষা দিতেন যে, দেবতারা বিভিন্ন বিমূর্ত ভাবের প্রতীক এবং এথেনীয়রা সকাল-সন্ধ্যা যার কাছে প্রার্থনা করতো সেই সূর্য জ্বলন্ত পদার্থের একটা পিণ্ডমাত্র। এজন্য তাঁকে ধর্মদ্রোহী প্রমাণ করা সহজ ছিল। পেরিক্লিসের প্রভাব তাঁকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করলো ; কিন্তু তাঁকে বিরাট অংকের জরিমানা দিতে হয়েছিল এবং তিনি এথেন্স ছেড়ে লাম্প্সাকুস চলে যান। সেখানে তাঁকে গুরুত্ব ও সম্মানের সাথে গ্রহণ করা হয়েছিল।

আরো অনেক ঘটনার লিখিত বিবরণ রয়েছে যেখানে দেখা যায় যে, ধর্মবিরোধী চিন্তাভাবনাকে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল। প্রধানতম 'সোফিস্ট'দের একজন প্রোটাগোরাস [আ. ৪৯০ খ্রি. পূ.-৪২১ খ্রি. পূ.-র পরে] *দেবতাদের সম্বন্ধে* শীর্ষক একখানা বই প্রকাশ করেছিলেন যার উদ্দেশ্য ছিল, মনে হয়, প্রমাণ করা যে, যুক্তি দিয়ে কেউ দেবতাদের অস্তিত্বে অবগত হতে পারে না। বইটির প্রথম কথাগুলি ছিল—"দেবতাদের প্রসঙ্গে আমি বলতে পারি না যে তাঁরা আছেন, আবার এটাও বলতে পারি না যে তাঁরা নেই। কেন আমরা তাঁদের অস্তিত্বে জানতে পারি না তার একাধিক কারণ বিদ্যমান। বিষয়টির অস্পষ্টতা রয়েছে এবং আছে মানব জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব।" তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হলে তিনি এথেন্স থেকে পলায়ন করেন। কিন্তু স্বাধীন চিন্তাকে দাবিয়ে রাখার কোনো সুসম্বদ্ধ নীতি এথেন্সে ছিল না। প্রোটাগোরাসের বই-এর কপি সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল, কিন্তু যেসব মতামতের জন্য আনাক্সাগোরাস দণ্ডিত হয়েছিলেন সেগুলি যে বই-এ লেখা হয়েছিল সে বইটি এথেন্সের পুস্তক বিপণীগুলিতে লোকায়ত মূল্যে বিক্রির জন্য মজুদ ছিল।

রঙ্গমঞ্চেও ঝুঁকি নিয়ে যুক্তিবাদী ধ্যানধারণা হাজির করা হচ্ছিল, যদিও দেবতা ডাইওনিসাসের পর্বোপলক্ষে আয়োজিত সেসব নাট্যাভিনয় ছিল ধর্মীয় গাম্ভীর্যে মণ্ডিত। কবি ইউরিপিডিস [আ. ৪৮৫-৪০৭ খ্রি.পূ.] আধুনিক কল্পনায় সমৃদ্ধ ছিলেন এবং, যদিও তাঁর কয়েকটি বিয়োগান্ত নাটকের বিবিধ প্রবণতা সম্পর্কে নানা মত থাকতে পারে, তিনি প্রায়শই তাঁর চরিত্রগুলির মুখ দিয়ে অধিষ্ঠিত মতের পরিপন্থী মতামত ব্যক্ত করেছেন। অধার্মিকতার জন্য তাঁর বিচার করেছিলেন এক জনপ্রিয় শাসক। আমরা অনুমান করতে পারি যে, পঞ্চম শতকের শেষ ত্রিশ বছরে শিক্ষিত শ্রেণীসমূহের মধ্যে অধিষ্ঠিত মতের বিরোধিতা বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বাধীন চিন্তার বিরুদ্ধে যে কোনো সংগঠিত দমনব্যবস্থাকে অসম্ভব করে তোলার মতো যথেষ্ট বড়ো ও প্রভাবশালী একটি যুক্তিবাদী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল। আর ধর্মদ্রোহিতা বিরোধী আইনের প্রধান দোষ ছিল এই যে সেটি ব্যক্তিগত কিংবা দলীয় কারণে ব্যবহার করা যেতে পারতো। যেসব মামলার বিষয়ে আমাদের জানা আছে তার মধ্যে কিছু সংখ্যকের পেছনে অবশ্যই এ ধরনের উদ্দেশ্য ছিল, অন্যগুলি হয়তো উদ্ভূত

হয়েছিল খাঁটি গোঁড়ামি থেকে এবং এরূপ ভীতি থেকে যে পাছে সন্দেহবাদী চিন্তা উচ্চশিক্ষিত ও প্রচুর অবকাশভোগী শ্রেণীর বাইরে প্রসার লাভ করে। গ্রীকদের মধ্যে, এবং পরে রোমানদের মধ্যে, সাধারণভাবে গৃহীত একটি নীতি এই ছিল যে, সাধারণ মানুষের জন্য ধর্ম একটা উত্তম ও প্রয়োজনীয় জিনিস। যেসব লোক ধর্মের সত্যতায় বিশ্বাস করতেন না তাঁরাও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন, এবং সাধারণত দার্শনিকেরা উদ্বিগ্নকর 'সত্য' জনগণের মধ্যে প্রচার করার চেষ্টা করতেন না। যাঁরা প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁরা বাইরে সেগুলি মেনে চলবেন এটাই ছিল নিয়ম, এখনকার চেয়ে সে যুগে এ নিয়ম আরো অনেকবেশি করে অনুসরণ করা হতো। জনগণের জন্য উচ্চ শিক্ষা গ্রীক রাষ্ট্রনায়ক ও চিন্তাবিদদের কার্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আর সম্ভবত এও বলা যায় যে, প্রাচীন জগতের পরিবেশে তা করা দুঃসাধ্য হতো।

তবে একজন অতি বিশিষ্ট এথেনীয় ছিলেন যিনি ভিন্নভাবে চিন্তা করতেন। ইনি হচ্ছেন দার্শনিক সক্রেতিস। সক্রেতিস [৪৭০–৩৯৯ খ্রি.পূ.] শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন ; কিন্তু বিদ্যা দান করে অন্যদের মতো তিনি পারিশ্রমিক নিতেন না, শেখাতেন বিনা মূল্যে, যদিও তিনি দরিদ্র মানুষ ছিলেন। তাঁর শিক্ষকতা সব সময়ই আলোচনার রূপ নিত ; আলোচনা প্রায়ই কোনো ইতিবাচক ফল উৎপাদনে সক্ষম হতো না, কিন্তু এর ফলে দেখানো যেতো যে, কোনো গৃহীত মতবিশেষ যুক্তির ধোপে টেকে না, এবং সত্য নির্ণয় দুরূহ কাজ। জ্ঞান ও নৈতিক উৎকর্ষ সম্পর্কে তাঁর অবশ্যই কতিপয় নির্দিষ্ট মত ছিল, এবং সেগুলি দর্শনের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গুরুত্বের অধিকারী ; কিন্তু আমাদের বর্তমান অভীষ্টের প্রয়োজনে সক্রেতিসের তাৎপর্য নিহিত রয়েছে আলোচনা ও সমালোচনায় তাঁর প্রবল আগ্রহের মধ্যে। তাদেরকেই তিনি শেখাতেন যাদের সাথে তাঁর কথোপকথন হতো–আর যারাই তাঁর কথা শুনতে রাজি ছিল, কোনো তারতম্য না করে তাদের সকলের সাথেই তিনি কথা বলতেন। তাঁর এ সব কথোপকথনের উদ্দেশ্য ছিল সকল জনপ্রিয় বিশ্বাসকে যুক্তির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো, সকল অনুসন্ধানে খোলা মন নিয়ে যোগ দেয়া, এবং সংখ্যাগুরুর মত কিংবা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ দ্বারা চালিত হয়ে বিচার না করা ; সংক্ষেপে, কোনো মতের সত্যতা নির্ণয়ের জন্য মতটিতে এক বিরাট সংখ্যক লোকের বিশ্বাস আছে এই ব্যাপারটি ব্যতীত অন্যান্য পরীক্ষা করতে চাওয়া। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন সেইসব তরুণ যাঁরা পরের প্রজন্মের প্রধান দার্শনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং এমন কয়েকজন যাঁরা এথেন্সের ইতিহাসে বিশিষ্ট ভূমিকা রেখেছিলেন।

এথেনীয়দের যদি দৈনিক সংবাদপত্র থাকতো তা হলে সাংবাদিকরা সক্রেতিসকে একজন বিপজ্জনক লোক হিসেবে অভিযুক্ত করতেন। এথেনীয়দের ছিল একটি প্রহসন নাট্যশিল্প যাতে সব সময় দার্শনিক ও 'সোফিস্ট'দেরকে এবং তাদের নানা নিরর্থক মতবাদকে ব্যঙ্গ করা হতো। আমাদের হাতে একখানি নাটক (আরিস্তোফানিস [আ. ৪৫০–৩৮৮ খ্রি.পূ.]–এর *ক্লাউড্‌স্* [মেঘমালা]) রয়েছে যাতে সক্রেতিসকে অধর্মমূলক ও ধ্বংসাত্মক কল্পনার আদর্শ প্রতিনিধি বলে বিদ্রূপ করা হয়েছে। এই জাতীয় উপদ্রব বাদ দিলে, সক্রেতিস তাঁর সহনাগরিকদের শিক্ষাদানের কাজে নিযুক্ত থেকে বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়েছিলেন, কিন্তু কোনো দুর্দৈবের শিকার হননি। তারপর সত্তর বছর বয়সে একজন নিরীশ্বরবাদী এবং তরুণদের উৎপথ–প্রদর্শক হিসেবে তাঁর বিচার হয় এবং তাঁকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় (৩৯৯ খ্রি.পূ.)।

এথেনীয়রা যদি সত্যিই তাঁকে বিপজ্জনক ভাবতো তাহলে এটা আশ্চর্য যে তারা তাঁকে অতো দীর্ঘ সময় ধরে সহ্য করলো। আমার মনে হয় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের উদ্দেশ্য যে রাজনৈতিক ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই বললেই চলে।[১] সক্রেতিস যেসব কাজ করেছিলেন সেগুলি বিবেচনা করলে মনে হয় তিনি অবাধ গণতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হতে পারেননি, কিংবা অজ্ঞ সংখ্যাগুরুর ইচ্ছাই যে উত্তম পথপ্রদর্শক এই নীতি অনুমোদন করতে পারেননি। যাঁরা ভোটাধিকারের সীমা বেঁধে দিতে চাইতেন তিনি সম্ভবত তাঁদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। একাধিকবার সংবিধান বাতিলের ঘটনায় কলঙ্কিত একটি সংগ্রামের শেষে যখন গণতন্ত্র বিজয়ী হলো (৪০৩ খ্রি. পূ.), তখন যারা অতীতে গণতন্ত্রের মিত্র ছিল না তাদের বিরুদ্ধে তিক্ত ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়। আর এ সব অবাধ্য ব্যক্তিদের মধ্যে সক্রেতিসকে দণ্ড দানের নিমিত্ত বেছে নেয়া হয়। ইচ্ছে করলে তিনি সহজেই পালিয়ে যেতে পারতেন। যদি তিনি আর শিক্ষকতা করবেন না বলে অঙ্গীকার করতেন তাহলে যে নিষ্কৃতি পেতেন তা প্রায় নিশ্চিত। বস্তুত, যে ৫০১ জন সাধারণ এথেনীয় নাগরিক তাঁর বিচারক ছিলেন তাঁদের এক বড়ো সংখ্যালঘু অংশ তাঁকে খালাস দেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিল। এমন কি তখনো যদি তিনি একটু অন্য সুরে কথা বলতেন, তাঁর মৃত্যুদণ্ড হতো না।

তিনি সময়োপযোগী পদপেক্ষ নিয়ে প্রথাবহির্ভূত একটি চমৎকার ভাষণে আলোচনার স্বাধীনতার যথার্থ্য প্রতিপাদন করেন। সক্রেতিসের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র দার্শনিক প্লেটো [৪২৭—৩৪৭ খ্রি. পূ.]-র লেখা *সক্রেতিসের কৈফিয়ত*-এ আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁর বক্তব্যের সাধারণ মর্মটি ধরা আছে। এটা পরিষ্কার যে, নগরবাসীদের পূজিত দেবতাদের তিনি মানেন না এই অভিযোগের সন্তোষজনক জবাব তিনি দিতে পারেননি, এবং এ বিষয়ে তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা হচ্ছে তাঁর ভাষণের দুর্বল অংশ। কিন্তু তিনি তরুণ মনে বিকৃতি ঢুকিয়েছেন এই অভিযোগের জবাব তিনি দিয়েছিলেন মুক্ত আলোচনার সমর্থনে অতি উত্তম যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রেখে। এটিই *সক্রেতিসের কৈফিয়ত*-এর সবেচেয়ে মূল্যবান অংশ, এ অংশটি চিরকালের মতো আজও সমানভাবে মনের উপর ছাপ ফেলে। আমার মতে যে দুটি প্রধান বিষয় তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা এই—

১. তিনি মনে করেন ব্যক্তির উচিত তার নিজের মন যে পথকে ভুল বলে রায় দিয়েছে সে পথে জবরদস্তিমূলকভাবে চালিত হতে যেকোনো মূল্যে অস্বীকার করা। অর্থাৎ আমাদের ভাষায় বলতে গেলে, সক্রেতিস দৃঢ়কণ্ঠে *মানুষের রচিত আইনের উপর ব্যক্তির বিবেকের প্রাধান্য* ঘোষণা করেন। তিনি তাঁর সারা জীবনের কাজকে এক ধরনের ধর্মীয় অনুসন্ধান বলে বর্ণনা করেন। তিনি মনে করেন, এই মর্মে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে নিজেকে দার্শনিক আলোচনায় নিযুক্ত করে তিনি এক অতিমানবীয় পথনির্দেশকের আদেশ পালন করেছেন, এবং নিজ প্রত্যয়ের প্রতি অবিশ্বস্ত হওয়ার চেয়ে তিনি বরং মৃত্যুই বরণ করবেন। তিনি বলেন, "যদি আপনারা এই শর্তে আমাকে মুক্তি দিতে চান যে আমি সত্যের অনুসন্ধান পরিত্যাগ করি, তাহলে আমি বলবো : হে এথেন্সবাসিগণ, আমি আপনাদের ধন্যবাদ দিই, কিন্তু আমি মান্য করবো আপনাদেরকে নয়, বরং ঈশ্বরকে যিনি আমাকে এই কাজে নিযুক্ত করেছেন বলে আমি বিশ্বাস করি এবং যতক্ষণ আমার শ্বাস ও শক্তি আছে আমি কখনো দর্শনের সাথে আমার পেশাগত সম্পর্ক থেকে নিবৃত্ত হবো না। যার সাথেই আমার দেখা হোক তার কাছে এগিয়ে গিয়ে

তাকে ডেকে কথা বলার কাজ আমি চালিয়েই যাবো এবং তাকে বলবো, 'প্রজ্ঞা ও সত্যের প্রতি তথা নিজের আত্মাকে উন্নত করার ব্যাপারে আপনার কোনো আগ্রহই নেই, অথচ আপনি সম্পদ ও সম্মানের কাছে আপন অন্তরকে সঁপে দিয়েছেন, এতে আপনার লজ্জা করে না?' আমি জানি না মৃত্যু কি—হয়তো তা একটা ভালো জিনিসই, এবং আমি তাকে ভয় করি না। কিন্তু আমি অবশ্যই জানি যে, কারো আপন অবস্থান ত্যাগ করে যাওয়া খারাপ কাজ এবং যে কাজকে আমি খারাপ বলে জানি তার চেয়ে বেশি পছন্দ করি তাকে যা ভালো হতেও পারে।"

২. তিনি *মুক্ত আলোচনার জনগুরুত্বের* উপর জোর দেন। "আমার মধ্যে আপনারা পাচ্ছেন একজন উদ্দীপনাদায়ী সমালোচক যে যুক্তি দ্বারা বাধ্য করে এবং ভর্ৎসনার মাধ্যমে আপনাদেরকে নিরলসভাবে সামনে চালিত করছে, সতত আপনাদের মতামত পরীক্ষা করছে এবং দেখাতে চেষ্টা করছে যে আপনারা যা জানেন বলে মনে করেন তা আসলে আপনাদের জ্ঞানের আগোচর। যেসব বিষয় সম্পর্কে আমি আলাপ করি বলে আপনারা শুনে থাকেন, সেসব বিষয়ের প্রাত্যহিক আলোচনা মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর। যে জীবন এ ধরনের আলোচনা দ্বারা পরীক্ষিত না হয়, তা যাপন করার যোগ্য নয়।"

এভাবে, যাকে আমরা স্বাধীনতার সপক্ষে সর্বপ্রথম যুক্তিপ্রদর্শন বলে অভিহিত করতে পারি তাতে রয়েছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ দাবির সুদৃঢ় উচ্চারণ : ১. ব্যক্তির বিবেকের অব্যর্থ অধিকার—যে দাবির প্রতি পরবর্তীকালে মুক্ত চিন্তার জন্য সংগ্রামের লক্ষ্য নিবদ্ধ হয়েছিল, এবং ২. আলোচনা ও সমালোচনার সামাজিক গুরুত্ব। প্রথম দাবিটি যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং স্বজ্ঞামূলক ; বস্তুত এটি এক ধরনের অতিমানবীয় নৈতিক তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল এবং সক্রেতিসের অনুরূপ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অধিকারী নন এমন যাঁরা এ ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁদের কাছে তাঁর যুক্তিতর্ক মোটেই গুরুত্ব বহন করে না। দ্বিতীয় দাবিটি দুই সহস্রাধিক বছরের অভিজ্ঞতার পর আজ আরো পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা যায়, এবং তা এমন সব আঙ্গিক সহযোগে যার কথা সক্রেতিস স্বপ্নেও ভাবেননি।

সক্রেতিসের বিচারের পরিমণ্ডলটি তখন এথেন্সে যে সহনশীলতা ও অসহনশীলতার প্রাবল্য ছিল সেই উভয়েরই দৃষ্টান্তস্থল। দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁর নিরাপদে থাকা, অবশেষে রাজনৈতিক ও সম্ভবত ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য থেকেই যে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল এই সত্য, তাঁর অনুকূলে বিরাট সংখ্যালঘুর অবস্থান—এসব কিছুই দেখিয়ে দেয় যে সাধারণভাবে চিন্তার স্বাধীনতা ছিল এবং আরো প্রমাণ করে যে বিদ্যমান পুঞ্জীভূত অসহনশীলতাকে প্রয়োজন মতো জাগিয়ে তোলা হতো, এবং তা সম্ভবত প্রায়ই অন্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য। এ প্রসঙ্গে আমি দার্শনিক আরিস্ততল [৩৮৪–৩২২ খ্রি. পূ.]–এর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে পারি। সক্রেতিসের বিচারের প্রায় সত্তর বছর পর আরিস্ততলকে এথেন্স ছাড়তে হয়েছিল কারণ ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁর বিচার হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল ; কিন্তু এ অভিযোগ ছিল বিশেষ রাজনৈতিক দলের অনুসারী ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করার ছুতো মাত্র। আসলে মতামতের জন্য নির্যাতন কখনো সুসংগঠিত ছিল না।

এটা অদ্ভুত মনে হতে পারে যে, গ্রীসে নির্যাতনের মানসিকতার সন্ধান করতে গিয়ে আমাদেরকে দার্শনিকদের দিকেই নজর দিতে হবে। সক্রেতিসের সবচেয়ে মেধাবী শিষ্য

প্লেটো তাঁর শেষ জীবনে এক আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণা গড়ে তোলেন। এই রাষ্ট্রে তিনি প্রচলিত ধর্মের চেয়ে অনেকাংশে ভিন্ন এক ধর্ম প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা রাখেন এবং প্রস্তাব করেন যে মৃত্যুদণ্ড বা কারাদণ্ডের ব্যবস্থা রেখে সকল নাগরিককে তাঁর প্রবর্তিত দেবদেবীতে বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য করতে হবে। তাঁর কল্পিত ঐ ঢালাই লোহার মতো নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থায় আলোচনার সকল স্বাধীনতা নির্বাসিত ছিল। কিন্তু প্লেটোর মননভঙ্গিতে কৌতূহলের বিষয় হলো এই যে, কোনো ধর্ম সত্য কিনা তা নিয়ে তাঁর বিশেষ মাথা ব্যথা ছিল না, শুধু সেটি নৈতিকভাবে ব্যবহারযোগ্য কিনা তাই ছিল তাঁর বিবেচ্য, অলীক কাহিনী নির্মাণ করে নৈতিকতা বাড়িয়ে তুলতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন ; আর প্রচলিত পুরাণ–কথাকে তিনি নিন্দা করতেন এ জন্য নয় যে সেগুলি অলীক ছিল, এ কারণে যে সেগুলি ন্যায়পরায়ণতার জন্য কার্যকর ছিল না।

এথেন্সে যে বিরাট স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল তার ফল এই হয়েছিল যে সক্রেতিসের সংলাপ থেকে একের পর এক অনেকগুলি দার্শনিক মত বেরিয়ে আসে। প্লেটো, আরিস্ততল, স্টোইক গোষ্ঠী, এপিকিউরিয়ান গোষ্ঠী, (সন্দেহবাদী) গোষ্ঠী—এই নামগুলি যেসব মনন–প্রচেষ্টার প্রতিনিধিত্ব করে সেগুলি অন্য যেকোনো অব্যাহত বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের চেয়ে মানুষের অগ্রগতিতে গভীরতর প্রভাব রেখেছে অন্তত চিন্তার স্বাধীনতার নতুন যুগে আধুনিক বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের আগে পর্যন্ত—এমন মত পোষণ করা চলে।

এপিকিউরিয়ান, স্টোইক ও সন্দেহবাদী সকলের দর্শনেরই লক্ষ্য ছিল ব্যক্তির জন্য আত্মিক শান্তি ও পথনির্দেশ নিশ্চিত করা। এই দর্শনসমূহ খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে গ্রীক জগতের সর্বত্র প্রচারিত হতে থাকে এবং আমরা বলতে পারি যে এ সময় থেকে সুশিক্ষিত গ্রীকদের অধিকাংশই কম–বেশি যুক্তিবাদী ছিলেন। এপিকিউরাস [৩৪১—২৭০ খ্রি. পূ.]–এর উপদেশে একটা সুস্পষ্ট ধর্মবিরোধী প্রবণতা ছিল। ভয়কেই তিনি ধর্মের মৌল প্রেরণা বলে মনে করতেন এবং এই ভয় থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করা ছিল তাঁর শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষ্য। তিনি ছিলেন জড়বাদী, ডিমোক্রিটাসের আণবিক তত্ত্ব দিয়ে জগৎ ব্যাখ্যা করতেন এবং বিশ্বের কোনোরূপ ঐশ্বরিক নিয়ন্ত্রণের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিলেন।[২] তিনি অবশ্য দেবতাদের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন, কিন্তু মানুষের প্রসঙ্গে তাঁর দেবতারা এমন যে তাঁরা যেন ছিলেনই না—তাঁরা বাস করতেন সুদূর এক বাসস্থানে আর ভোগ করতেন এক "পূত ও শাশ্বত প্রশান্তি।" তাঁরা আদর্শ এপিকিউরিয়ান জীবন বাস্তবায়নের দৃষ্টান্ত হিসেবেই কাজ করতেন।

এই দর্শনে এমন কিছু ছিল যা অনন্য প্রতিভাধর এক কবিকে ছন্দের মাধ্যমে এর অর্থ প্রকাশ করার কাজে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল। রোমান জাতীয় লুক্রেশিয়াস (খ্রি. পূ. প্রথম শতক) এপিকিউরাসকে মানব জাতির মহান মুক্তিদাতা বলে মনে করতেন এবং তাঁর দর্শনের আনন্দময় বার্তাকে *অন দ্য নেচার অফ দ্য ওঅর্ল্ড* [জগতের প্রকৃতি সম্পর্কে] শীর্ষক কাব্যে বিঘোষিত করার সিদ্ধান্ত নেন।[৩] একজন ধর্মোদ্যমী যাবতীয় উৎসাহ নিয়ে তিনি ধর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ উচ্চারণ করেন। সেই নিন্দাবাদে অবাধ্যতা, বিতৃষ্ণা ও অবজ্ঞার প্রতিটি সুর ধ্বনিত হয় এবং ধর্ম অতীতে মানুষকে যেসব অপরাধ করতে প্ররোচিত করেছিল সেগুলিকে প্রজ্বলন্ত শব্দমালায় চিহ্নিত করা হয়। স্বর্গ–প্রাকারের বিরুদ্ধে নিরীশ্বরবাদের যোদ্ধদলের

নায়কের ন্যায় তিনি সামনের দিকে ছুটে চলেন। তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তিসমূহ এমনভাবে ব্যাখ্যা করেন যেন সেগুলি এক নতুন জগতের আলোকময় উদ্‌ঘাটন। আর তাঁর উদ্দীপনার পরম আনন্দের বিষয়টি হচ্ছে এই যে, এর সাথে আশ্চর্যজনকভাবে রয়েছে এমন একটি মতবাদ যার লক্ষ্য হচ্ছে পরিপূর্ণ প্রশান্তি। যদিও গ্রীক চিন্তাবিদরাই সব কাজ সেরে রেখেছিলেন, এবং লাতিন কবিতাটি হচ্ছে ভুলুণ্ঠিত দেবতাদের উপর বিজয়ের স্তবগান মাত্র, তবু এর স্পর্ধিত, অবাধ্য ভাবটির সরল অকৃতিমতার জন্য এটি অবশ্যই মুক্ত চিন্তার সাহিত্যে সব সময় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকবে। যুক্তিবাদের ইতিহাসে কবিতাটির প্রতি আগ্রহ অনেক বেশি হতে পারতো, যদি এটি কোনো গোঁড়া সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে বিস্ফোরিত হতো। কিন্তু লুক্রেশিয়াসের সময় শিক্ষিত রোমানরা ধর্মীয় ব্যাপারে ছিল সন্দেহবাদী এবং কেউ কেউ এপিকিউরিয়ান। তাই আমরা অনুমান করতে পারি যে যারা কবিতাটি পড়েছিল তাদের মধ্যে খুব বেশি সংখ্যক ধর্মহীনতায় নেতৃত্বদানকারী ঐ কবির স্পর্ধায় আহত কিংবা প্রভাবিত হয়নি।

স্টোইক দর্শন স্বাধীন চিন্তার পক্ষে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল এবং মুক্ত আলোচনার পরিবেশ না থাকলে এর বিকাশ ঘটতে পারতো না। এই দর্শন সরকারি বা জনগণের কর্তৃত্বের বিপরীতে ব্যক্তির অধিকারের দাবি ঘোষণা করে। সক্রেতিস দেখেছিলেন আইন অন্যায় হতে পারে এবং জনগণ ভুল করতে পারে, কিন্তু তিনি সমাজ পরিচালনার জন্য কোনো নীতি খুঁজে পাননি। স্টোইকরা সেই নীতি আবিষ্কার করলেন 'প্রকৃতির বিধান' (law of nature)–এর মধ্যে, যে বিধান অন্য সব প্রথা এবং বিভিন্ন জাতির লিখিত আইনের পূর্ববর্তী ও তাদের চেয়ে উচ্চতর। এই মত স্টোইক গোষ্ঠীর বাইরে বিস্তার লাভ করে রোমান জগতে ছড়িয়ে পড়ে এবং রোমান আইন প্রণয়নে প্রভাব ফেলে।

এই সব দর্শন আমাদেরকে গ্রীস থেকে রোমে নিয়ে এলো। রোমান প্রজাতন্ত্রের শেষের দিকে এবং সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে মতামতের উপর কোনো বিধিনিষেধ ছিল না, এবং এই যেসব দর্শনে ব্যক্তিকে প্রধান বিবেচ্য বিষয় করা হয়েছিল সেগুলি ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অধিকাংশই রাষ্ট্রীয় ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না, কিন্তু তাঁরা অশিক্ষিত জনগণকে শৃংখলার মধ্যে রাখার উদ্দেশ্যে ধর্মকে মূল্যবান বলে মনে করতেন। জনসাধারণের উপকারার্থে কুসংস্কার চর্চার যে রোমান নীতি ছিল, জনৈক গ্রীক ঐতিহাসিক তাকে জোরালো অনুমোদন দিয়েছেন। এ ছিল সিসরো [১০৬–৪৩ খ্রি. পূ.]–র দৃষ্টিভঙ্গি, এবং সামাজিক যন্ত্র হিসেবে একটা মিথ্যা ধর্ম যে অপরিহার্য এ ধারণা প্রাচীন অবিশ্বাসীদের মধ্যে সাধারণভাবে চালু ছিল। কোনো না কোনো রূপে ধারণাটি আজও ব্যাপক প্রচলিত ; অন্তত এটা ঠিক যে আজকাল ধর্মের সমর্থনে সব সময় উপযোগিতার যুক্তিই দেখানো হয়, সত্যের নয়। ধর্মের এরূপ সমর্থন রয়েছে নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি [১৪৬৯–১৫২৭[–র রাষ্ট্রশাসন নীতিতে। তিনি এই উপদেশ দেন যে, রাজ্যশাসনের জন্য ধর্ম প্রয়োজনীয়, এবং শাসকের কর্তব্য হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন একটা ধর্মকে সমর্থন করা যেটাকে তিনি মিথ্যা বলেই বিশ্বাস করেন।

শেষ গ্রীক বিদ্বান যাঁর লেখা প্রত্যেকের মন কাড়ে সেই লুসিয়ান (খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক) সম্পর্কে কিছু বলতেই হয়। প্রকাশ্য ব্যঙ্গ–বিদ্রূপের মাধ্যমে তিনি জনপ্রিয় পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে আক্রমণ করেছিলেন। যেসব শিক্ষিত অবিশ্বাসী তাঁর বিদ্রূপাত্মক লেখাগুলি

পড়তেন তাঁদের আনন্দ দেওয়া ছাড়া সেগুলি সমকালে আর কোনো ফল উৎপাদন করেছিল কিনা তা বলা অসম্ভব। সবচেয়ে ফলপ্রসূ প্রহসনগুলির মধ্যে একটি ছিল *জিউস ইন অ্যা ট্র্যাজেডি পার্ট* [বিয়োগান্তক ভূমিকায় জিউস]। এ নাটকে লুসিয়ান যে পরিস্থিতির কল্পনা করেছেন তার তুলনা হতে পারতো যদি কোনো আধুনিক লেখক ধর্মদ্রোহী ভঙ্গিতে খ্রিস্টীয় ত্রীশ্বরের ব্যক্তিত্রয়ের প্রতীক হিসেবে বিশিষ্ট দেবদূত ও সাধুসন্তকে ব্যবহার করতেন যাঁরা কোনো স্বর্গীয় ধুমাচ্ছন্ন কক্ষে বসে ইংল্যাণ্ডে আশংকাজনক হারে ধর্মে আস্থাহীনতা বেড়ে যাওয়ার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছেন এবং টেলিফোনের মতো একটি যন্ত্রের সাহায্যে একজন মুক্ত চিন্তাবাদী ও জনৈক ব্যক্তির মধ্যে লণ্ডনের একটি প্রকাশ্য মঞ্চে অনুষ্ঠিত বাদানুবাদ শুনছেন। ঈশ্বরে নরত্বারোপের মতো উদ্ভট ব্যাপারটা নিয়ে লুসিয়ান প্রহসনের চেয়ে বেশি চমৎকার ঠাট্টা আর কখনো করা হয়নি।

রোমান নীতির সাধারণ নিয়ম ছিল সাম্রাজ্যের সর্বত্র সকল ধর্ম ও সকল মতামত সহ্য করা। ধর্মদ্রোহিতার জন্য কোনো শাস্তি দেওয়া হতো না। এই নীতির প্রকাশ ঘটেছিল সম্রাট তিবেরিয়াস [খ্রি. ১৪–৩৭]-এর বাণীতে : "যদি কেউ দেবতাদের অসম্মান করে থাকে, তাঁরা নিজেরাই তার ব্যবস্থা দেখুন।" সহনশীলতার এই নিয়মের একটা ব্যতিক্রম করা হয়েছিল খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এবং বলা যায় এই প্রাচ্য দেশীয় ধর্মের প্রতি আচরণই ইউরোপে ধর্মীয় নির্যাতনের সূত্রপাত ঘটায়। রোমান সম্রাটেরা, যাঁরা সমর্থ ও মনুষ্যত্ববান ছিলেন এবং বিন্দুমাত্র ধর্মান্ধ ছিলেন না, তাঁরা কেন এই ব্যতিক্রমী নীতি গ্রহণ করলেন তা একটা কৌতূহলের ব্যাপার।

রোমানদের মধ্যে যারা খ্রিস্টানদের কথা শুনেছিল তাদের কাছে খ্রিস্টানেরা দীর্ঘকাল যাবৎ ইহুদিদের একটা সম্প্রদায় বলে পরিচিত ছিল। ইহুদি ধর্মই একমাত্র ধর্ম যা বর্জনকর স্বভাব ও অসহনশীলতার জন্য সহনশীল পেগানদের কাছে বিরাগ ও সন্দেহের বস্তু বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু যদিও এই ধর্মের সাথে কখনো কখনো রোমান শাসকদের সংঘর্ষ হয়েছিল এবং এর উপর কতিপয় অবিবেচনা প্রসূত আক্রমণ চলেছিল, কিন্তু সম্রাটদের অবিচলিত নীতি ছিল ঐ ধর্মকে তার নিজ গতি অনুসারে চলতে দেওয়া এবং ইহুদিদের ধর্মান্ধতার ফলে তাদের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে তাদেরকে রক্ষা করা। কিন্তু ইহুদিদের ধর্ম যতো দিন পর্যন্ত ঐ সমাজে যাদের জন্ম হতো তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ততোদিন তাকে সহ্য করা গেলেও, ঐ ধর্মের বিস্তার লাভের সম্ভাবনা এক নতুন প্রশ্নের অবতারণা করে। পৃথিবীর যেসব ধর্ম এতোদিন সৌহার্দ্যের সাথে একত্রে বাস করে আসছিল তাদের সকলের প্রতি আক্রমণাত্মকভাবে বৈরী একটি ধর্ম যা তার অনুসারীদের জন্য এই অপযশ কুড়িয়েছিল যে তারা মানব জাতির শত্রু, তাকে যদি বিস্তারলাভ করতে দেখা যায় তাহলে শাসকের মনে গভীর সন্দেহ সৃষ্টি হওয়াই সম্ভব। ইসরাইলি জাতির বাইরে এর বিস্তার পরিণামে সাম্রাজ্যের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারতো না কি? কারণ এর আত্মিক বৈশিষ্ট্য ছিল রোমান সমাজের ভিত্তি ও ঐতিহ্যের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। সম্রাট দোমিশিয়ান [খ্রি. ৮১–৯৬] মনে হয় প্রশ্নটিকে এই আলোকেই অবলোকন করেছিলেন এবং তিনি রোমান নাগরিকদের ধর্মান্তরকরণে বাধা দানের উদ্দেশ্যে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তিনি যাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন তাদের কেউ কেউ হয়তো খ্রিস্টান ছিল, কিন্তু তিনি যদি খ্রিস্টান ও ইহুদির স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে অবহিত থেকেও থাকেন, তাঁর দৃষ্টিতে ঐ দুই–এর মধ্যে আদৌ কোনো

পার্থক্য ছিল না। যুদীয় [অর্থাৎ ইহুদি] ধর্ম থেকে উদ্ভূত খ্রিস্টধর্ম অসহনশীলতা ও রোমান সমাজের প্রতি বৈরিতায় যুদীয় ধর্মের সদৃশ ছিল, কিন্তু তাদের পার্থক্য ছিল এই যে খ্রিস্টধর্ম অনেককে ধর্মান্তরিত করেছিল অথচ যুদীয় ধর্ম প্রায় কাউকেই ধর্মান্তরিত করেনি।

সম্রাট ট্রাজান [খ্রি. ৯৮–১১৭]–এর সময় আমরা দেখি, নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে যে খ্রিস্টান হওয়া একটি মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। তখন থেকে খ্রিস্টধর্ম একটি অবৈধ ধর্ম হয়ে থাকলো। কিন্তু বাস্তবে ঐ আইন কঠোরভাবে বা যুক্তিযুক্তভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। সম্রাটেরা চাইতেন সম্ভব হলে রক্তপাত ছাড়াই খ্রিস্টধর্মকে নির্মূল করতে। ট্রাজান নিয়ম করেছিলেন যে, খ্রিস্টানদের খুঁজে বের করা হবে না, অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির অভিযোগ বিবেচনা করা হবে না, এবং যে সংবাদদাতা তার অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হবে মিথ্যা অপবাদ বিরোধী আইনে তাকে শাস্তি পেতে হবে। খ্রিস্টানেরা নিজেরাই স্বীকার করতো যে এই অনুশাসন বস্তুত তাদেরকে রক্ষাই করেছিল। দ্বিতীয় শতাব্দীতে কতিপয় প্রাণদণ্ড হয়েছিল–ভালো প্রমাণ আছে এমন ঘটনার সংখ্যা বেশি নয়–এবং খ্রিস্টানেরা শাহাদতের যন্ত্রণা ও গৌরব বরণ করে নেয়। এরকম প্রমাণ আছে যে গ্রেফতারের পর তারা পালিয়ে গেলে দেখেও দেখা হতো না। সাধারণভাবে খ্রিস্টানদের উপর নির্যাতনের ব্যাপারটা যতোটা না কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায় হতো তার চেয়ে বেশি হতো জনসাধারণের প্ররোচনায়। এই রহস্যময় প্রাচ্য সম্প্রদায় যারা সকল দেবদেবীকে প্রকাশ্যে ঘৃণা করতো এবং জগৎ ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা করতো তাদের সম্পর্কে জনসাধারণ আতঙ্কজনিত গভীর বিতৃষ্ণা পোষণ করতো। যখন বন্যা দুর্ভিক্ষ ও বিশেষত অগ্নিকাণ্ড ঘটতো সেগুলিকে সহজেই খ্রিস্টানদের জাদুবিদ্যার কাজ বলে ধরে নেওয়া হতো।

কোনো লোক খ্রিস্টধর্মের অনুসারী বলে অভিযুক্ত হলে ঐ অভিযোগ পরীক্ষা করার জন্য তাকে দেবদেবীর বা দেবত্বারোপিত সম্রাটদের মূর্তির উদ্দেশ্যে ধূপধুনো দিতে বলা হতো। এই আদেশ পালন করার সাথে সাথে সে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেত। সম্রাটদের পূজা করতে খ্রিস্টানদের আপত্তি—তারা ও ইহুদিরাই কেবল আপত্তি করতো—রোমানদের দৃষ্টিতে খ্রিস্টধর্ম যে বিপজ্জনক তার সবচেয়ে মারাত্মক নিদর্শনগুলির অন্যতম বলে প্রতিভাত হতো। এই উপাসনার অভীষ্ট ছিল বিভিন্ন বিশ্বাসাশ্রয়ী ও নানা দেবদেবীর পূজারী বহুজাতি নিয়ে গঠিত রোমান সাম্রাজ্যের ঐক্য ও সংহতির প্রতীকী উপস্থাপন। এর উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক ঐক্য ও আনুগত্য বৃদ্ধি করা, আর এটা মোটেই আশ্চর্য নয় যে, যারা এই উপাসনাকে প্রকাশ্যে নিন্দা করতো তাদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহী স্বভাবের বলে সন্দেহ করা হতো। কিন্তু এও উল্লেখ্য, কোনো নাগরিকের জন্য এই পূজানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিল না। সাম্রাজ্যের যেসব বাসিন্দা সৈন্য কিংবা বেসামরিক কর্মচারী হিসেবে রাষ্ট্রের সেবায় নিযুক্ত ছিল না তেমন কাউকে ঐ পূজায় যোগদানে বাধ্য করা হতো না। এর ফল হয়েছিল এই যে খ্রিস্টানেরা সামরিক ও প্রশাসনিক চাকরি থেকে বাদ পড়েছিল।

এই সময়ে (দ্বিতীয় শতাব্দী) খ্রিস্টধর্মের সমর্থনে যেসব *অ্যাপলজি* (সমর্থনসূচক কৈফিয়ত) বেরিয়েছিল সেগুলি যদি সম্রাটেরা (কোনো কোনোটি তাঁদেরকে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছিল) পড়ে থাকতেন, তা হলে ঐ ধর্ম যে একটি রাজনৈতিক বিপত্তি ছিল এই ধারণার সমর্থন পেতেন। *অ্যাপলজি*গুলির পংক্তির ফাঁকে ফাঁকে সহজেই পড়ে নেওয়া যেতো যে যদি খ্রিস্টানেরা কখনো কর্তৃত্ব লাভ করতে পারে, তা হলে তারা রোমান রাষ্ট্রের বিবিধ ধর্মাচরণ পদ্ধতিগুলিকে রেহাই দেবে না। তাশিয়ান [খ্রি. দ্বিতীয় শতক]–এর লেখা সমসাময়িক গ্রন্থ *অ্য*

ডিসকোর্স টু দ্য গ্রীক্স [গ্রীকদের প্রতি একটি ভাষণ]–এ *অ্যাপলজি* লেখকেরা যা মোটামুটি গোপন করতে চেয়েছিলেন তা, অর্থাৎ যে সভ্যতার ভেতর তাঁরা বাস করতেন তার প্রতি তাঁদের দুর্ভেদ্য ঘৃণা, প্রকাশ করে দিয়েছে। ঐ সময়কার খ্রিস্টান সাহিত্যের কোনো পাঠকই লক্ষ্য না করে পারবেন না যে, খ্রিস্টানেরা ক্ষমতায় আছে এমন রাষ্ট্রে অন্যান্য ধর্মাচরণ একেবারেই সহ্য করা হতো না।[৪] তাই সম্রাটেরা যদি খ্রিস্টধর্মের ক্ষেত্রে তাঁদের সহনশীলতার নীতির কোনো ব্যতিক্রম ঘটিয়েই থাকেন, তবে তা করেছিলেন সহনশীলতাকে নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যেই।

খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা তখনো বলবৎ থাকলেও তৃতীয় শতকে ঐ ধর্মকে বেশ খোলাখুলিভাবেই সহ্য করা হতো ; কোনো গোপনীয়তা ছাড়াই খ্রিস্টীয় গির্জা নিজেকে সংগঠিত করেছিল ; কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই খ্রিস্টীয় যাজকদের সভা বসতো। কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত ও স্থানীয়ভাবে পরিচালিত দমনমূলক প্রচেষ্টা হয়েছিল, একবার মাত্র বড়ো ধরনের নির্যাতন চলেছিল। (২৫০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট ডেসিয়াস [২৪৯–৫১ খ্রি.] এই নির্যাতন শুরু করেন এবং সম্রাট ভালেরিয়ান [২৫৩–২৬০ খ্রি.] তা চালিয়ে যান)। প্রকৃতপক্ষে এই গোটা শতাব্দীতে খুব বেশি লোক নির্যাতনের শিকার হয়নি, যদিও পরবর্তীকালে খ্রিস্টানেরা শাহাদতের আস্ত একখানা বানোয়াট পুরাণ কথা লিখে ফেলে। অনেক নিষ্ঠুরতার কাহিনী এমন সব সম্রাটের উপর আরোপ করা হয়েছে যাদের শাসনকালে খ্রিস্টীয় গির্জা পরিপূর্ণ শান্তি ভোগ করেছিল।

দীর্ঘ সময় ধরে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ চলার ফলে মনে হয়েছিল সাম্রাজ্যের বুঝি পতন হতে চলেছে। এমন সময় সম্রাট ডায়োক্লেশিআন [খ্রি. ২৮৪–৩০৫] তার আমূল প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে আরো এক শতাব্দীর জন্য রোমান শক্তির অখণ্ডতা বজায় রাখতে সাহায্য করেন। তিনি রোমান ভাবধারার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে তাঁর রাজনৈতিক সংহতি সাধনের কাজে মদদ যোগাতে চেয়েছিলেন, এবং এ জন্য তিনি রাষ্ট্রীয় ধর্মে এক নতুন জীবন সঞ্চারের চেষ্টা করেন। এ লক্ষ্যে তিনি খ্রিস্টানদের প্রবর্ধমান প্রভাব খর্ব করার সিদ্ধান্ত নেন। সে সময়ে খ্রিস্টানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও তাদের সংখ্যা ছিল প্রচুর এবং ডায়োক্লেশিআন একটি নির্যাতন প্রক্রিয়া সংগঠিত করেন। এ নির্যাতন ছিল দীর্ঘকালব্যাপী, নির্দয় ও রক্তাক্ত। ঐ নিষিদ্ধ ধর্মবিশ্বাসকে গুঁড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে এটাই ছিল সবচেয়ে আন্তরিক, ব্যাপক এবং সুসম্বদ্ধ প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, কারণ খ্রিস্টানদের সংখ্যা এতো বেশি ছিল যে তাদেরকে গুঁড়িয়ে ফেলা সম্ভব ছিল না। ডায়োক্লেশিআনের সিংহাসন ত্যাগের পর যেসব সম্রাট সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে রাজত্ব করেছিলেন তারা তাঁর নীতির উপযোগিতা সম্পর্কে একমত হননি, এবং দুটি সহনশীলতার ফরমান [edicts of foleration] (৩১১ ও ৩১৩ খ্রিস্টাব্দ) নির্যাতনের অবসান ঘটায়। ধর্মীয় স্বাধীনতার ইতিহাসের জন্য এই দলিল দুটির গুরুত্ব আছে।

সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলিতে জারিকৃত প্রথম ফরমানটির বয়ান ছিল এরকম :

> আমরা বিভ্রান্ত খ্রিস্টানদেরকে যুক্তি ও প্রাকৃতিক সত্যের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলাম। খ্রিস্টানেরা তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম অনুষ্ঠানাদি পরিত্যাগ করেছিল, ধৃষ্টতার সঙ্গে প্রাচীন রীতি–নীতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্বক নিজেদের খামখেয়ালের নির্দেশ মোতাবেক নানা বাড়াবাড়িপূর্ণ আইন ও মতামত উদ্ভাবন করেছিল,

এবং আমাদের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের লোক নিয়ে একটা বিচিত্র সমাজ গড়ে তুলেছিল। দেবতাদের পূজার্চনা বাধ্যতামূলক করে আমরা যেসব ফরমান ইতঃপূর্বে জারি করেছি তার ফলে খ্রিস্টানদের অনেকে বিপদ ও দুর্দশার মুখে পড়েছে, অনেকে মৃত্যুবরণ করেছে, এবং আরো অনেকে যারা এখনো তাদের ঐ ধর্মহীন নির্বুদ্ধিতা চালিয়ে যাচ্ছে তারা প্রকাশ্যে ধর্ম পালনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। আমাদের চিরাচরিত ক্ষমাশীলতার সুফল ঐ অসুখী মানুষগুলিকে পৌঁছে দিতে আমরা ইচ্ছুক হয়েছি। সুতরাং আমরা তাদের নিজস্ব মতামত স্বাধীনভাবে ও প্রকাশ্যে ব্যক্ত করার, তথা নির্ভয়ে ও নিরুপদ্রবে তাদের সভা সমিতিতে যোগ দেওয়ার অনুমতি দিলাম। তবে তা সর্বদাই এই শর্তে যে তারা প্রতিষ্ঠিত আইন ও সরকারের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা বজায় রাখবে।[৫]

দ্বিতীয়টি জারি করেছিলেন সম্রাট কন্‌স্তান্‌তিন [খ্রি. ৩০৬–৩৩৭]। *ইডিক্‌ট অফ মিলান* [মিলানের ফরমান] নামে পরিচিত এই আদেশের বক্তব্যও ঐ একই ধরনের ছিল। এতে প্রজাদের সুখশান্তির ব্যাপারে সম্রাটের যত্ন এবং স্বর্গস্থ দেবতার তুষ্টিসাধনকে সহনশীলতার ভিত্তি হিসেবে দেখানো হয়।

রোমান সরকার ও খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সম্পর্ক নির্যাতন ও বিবেকের স্বাধীনতা সংক্রান্ত সাধারণ প্রশ্নটিকে সামনে নিয়ে আসে। একটি সরকারি ধর্ম থাকা সত্ত্বেও সকল ধর্মমত ও উপাসনা পদ্ধতির প্রতি সম্পূর্ণ সহনশীল একটি রাষ্ট্র দেখতে পেলো যে তার নিজের অভ্যন্তরেই এমন একটা সমাজের উদ্ভব ঘটেছে যা তার নিজেরটি ছাড়া অন্য সকল ধর্মমতের প্রতি আপোসহীনভাবে বিরূপ এবং ক্ষমতা থাকলে সে তাদের সকলকে দমন করে ফেলতো। সরকার আত্মরক্ষার্থে এসব বিধ্বংসী ধ্যানধারণার প্রসার রোধ করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ঐ ধর্মমতের প্রচার অপরাধ বলে গণ্য করে ; আর তা ঐ ধর্মের বিশেষ বিশেষ মতের জন্য নয়, বরং ঐসব মতের সামাজিক ফলাফল যা হতে পারে তার জন্য। এ দিকে ঐ সমাজের সদস্যরা নিজেদের বিবেক–বুদ্ধি উল্লংঘন না করে এবং অনন্ত নরকবাসের ঝুঁকি না নিয়ে তাদের নিজস্ব মতবাদ পরিত্যাগ করতে পারে না। বিবেকের স্বাধীনতার নীতিকে রাষ্ট্রের প্রতি সকল বাধ্যবাধকতার ঊর্ধ্বে বলে দাবি করা হয় এবং এই নতুন দাবির যুগে রাষ্ট্র তা স্বীকার করে নিতে ব্যর্থ হয়। এর পরিণতিতেই আসে নির্যাতন।

এমনকি একজন গোঁড়া ও রাজভক্ত রোমান পৌত্তলিকের দৃষ্টিতেও খ্রিস্টানদের প্রতি নিপীড়ন ছিল অযৌক্তিক, কেননা রক্ত ঝরানো হয়েছিল অকারণে। অন্য কথায়, খ্রিস্টানপীড়ন একটা মহা ভুল পদক্ষেপ ছিল, কেননা তা সফল হয়নি। নিপীড়ন হচ্ছে দুই অমঙ্গলের মধ্যে একটি বেছে নেয়া। ঐ বিকল্পদ্বয় হচ্ছে হিংসা (যা নিজেই একটা অমঙ্গল এ কথা নিপীড়নের কোনো যুক্তিপরায়ণ সমর্থক অস্বীকার করবেন না) ও বিপজ্জনক মতামতের প্রসার। প্রথমটি বেছে নেওয়া হয় স্রেফ দ্বিতীয়টি এড়ানোর জন্য এবং তা এই যুক্তিতে যে দুটোর মধ্যে দ্বিতীয়টাই বৃহত্তর অমঙ্গল। কিন্তু লক্ষ্য অর্জনের জন্য ঐ নিপীড়ন যদি যথাযথভাবে পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত না হয় তাহলে একটার পরিবর্তে আপনি দুটো অমঙ্গল পাচ্ছেন এবং এ অবস্থার সমর্থনে কোনো কিছুই বলার থাকে না। সম্রাটদের দৃষ্টিতে দেখলে খ্রিষ্টধর্মকে বিপজ্জনক ও সমাজ–বিরোধী মনে করার উপযুক্ত কারণ ছিল। কিন্তু তাঁদের উচিত ছিল হয় ঐ ধর্মকে আদৌ না ঘাঁটানো, অথবা তাকে ধ্বংস করার জন্য সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। যদি তাঁরা প্রথম অবস্থায় এর বিরুদ্ধে একটা কঠোর ও সুশৃংখল বিচার ব্যবস্থা কায়েম

করতেন তাহলে হয়তো একে নির্মূল করতে পারতেন। সেটি অন্তত রাষ্ট্রনায়কোচিত কাজ হতো। কিন্তু চরম ব্যবস্থার কোনো ধারণাই তাঁদের ছিল না ; এবং কি ধরনের সমস্যা তাঁদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে তা তারা বুঝতেই পারেননি, কারণ এমন কোনো অভিজ্ঞতা তাঁদের ছিল না যা থেকে তাঁরা পথনির্দেশ পেতে পারেন। তাঁরা আশা করেছিলেন, ভীতি প্রদর্শনের দ্বারাই তাঁরা সফলকাম হবেন। তাঁদের দমনমূলক পদক্ষেপগুলি ছিল দ্বিধাগ্রস্ত, আকস্মিক এবং হাস্যকরভাবে অকার্যকর। শেষের দিকে (খ্রিস্টীয় ২৫০ থেকে ৩০৩ এর মধ্যে) যেসব নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল সেগুলির সফল হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই ছিল না। এ কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, খ্রিস্টীয় সাহিত্যের প্রকাশ–প্রচার বন্ধের কোনো চেষ্টাই করা হয়নি।

আরো উচ্চস্তরীয় প্রশ্ন—নিপীড়ন যদি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়ও তবু তার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা যায় কিনা তা বিবেচনা করা হয়নি। এ লড়াইয়ের ভরকেন্দ্র ছিল একদিকে ব্যক্তির বিবেক এবং অপর দিকে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব তথা কল্পিত স্বার্থের মধ্যেকার বিরোধ। এ ছিল সেই প্রশ্ন যা একদা সক্রেতিস তুলেছিলেন এবং এখন তোলা হলো এক বিস্তৃততর মঞ্চে আরো জরুরি ও জবরদস্ত ভঙ্গিতে : যখন আইনের প্রতি আনুগত্য কোনো অদৃশ্য প্রভুর প্রতি আনুগত্যের পাল্টাপন্থী হয় তখন কি হবে? ব্যক্তির বিবেকের মর্যাদা রক্ষা কি রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক? এবং তা কি যেকোন মূল্যে? অথবা কোনো সীমার মধ্যে? খ্রিস্টানরা কোনো সমাধান বের করার চেষ্টা করেনি, ঐ সাধারণ সমস্যায় তাদের আগ্রহ ছিল না। তারা একটা অখ্রিস্টীয় সরকারের কাছ থেকে কেমবলমাত্র নিজেদের জন্য স্বাধীনতার অধিকার দাবি করেছিল এবং এমন সন্দেহ করা বাড়াবাড়ি হবে না যে, সরকার যদি নস্টিক (Gnostic) [রহস্যবাদী] সম্প্রদায়গুলিকে দমন করতো তাহলে তারা সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতো, কারণ তারা নস্টিকদের ঘৃণা করতো ও তাদের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা রটিয়েছিল। যা–ই হোক, যখন একটি খ্রিস্টান রাষ্ট্র স্থাপিত হলো তখন তারা বেমালুম ভুলে গেল সেই নীতিটিকে যার সুযোগ একদা তারা চঞ্চা করেছিল। খ্রিস্টীয় শহীদেরা বিবেকের জন্য প্রাণ দিয়েছে কিন্তু স্বাধীনতার জন্য নয়। আজ সবচেয়ে বৃহত্তম গির্জা সেইসব আধুনিক রাষ্ট্রের কাছে বিবেকের স্বাধীনতা দাবি করছে যেসব রাষ্ট্র তার নিয়ন্ত্রণে নেই, কিন্তু সে এ কথা স্বীকার করতে রাজী নয় যে, যেখানে সে ক্ষমতায় ছিল সেখানে ঐ নীতি মেনে নেওয়া তার দায়িত্ব ছিল।

যদি আমরা প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ইতিহাস সামগ্রিকভাবে পুনরীক্ষণ করি, তাহলে এক রকম বলতেই পারি যে, মানুষ যেমন বাতাসে শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়, চিন্তার স্বাধীনতা সেই বাতাসের মতোই ছিল। এটা সকলেই স্বীকার করে নিয়েছিল এবং কেউ এ নিয়ে ভাবতোও না। যদিও এথেন্সে সাত কিংবা আটজন চিন্তাবিদকে প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, এগুলির মধ্যে কয়েকটি এবং সম্ভবত অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ অভিযোগ ছিল একটা অজুহাত মাত্র [আসলে রাজনৈতিক বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য এসব ঘটনার নেপথ্যে ক্রিয়াশীল থাকতো]। এ সব ঘটনা এই সাধারণ সত্যকে নস্যাৎ করে না যে, জ্ঞানের অগ্রগতি কুসংস্কার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়নি, কিংবা অবৈজ্ঞানিক কর্তৃত্বের ভারে বিজ্ঞান হয়নি প্রপীড়িত। শিক্ষিত গ্রীকরা সহনশীল ছিল, কারণ তারা ছিল যুক্তির মিত্র এবং যুক্তিকে বাতিল করতে পারে এমন কোনো কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠাও তারা করেনি। যুক্তিতর্ক ব্যতীত কোনো

মতামত চাপিয়ে দেয়া হতো না, ছোট্ট শিশুর মতো আপনি কোনো "স্বর্গরাজ্যের" অস্তিত্বে বিশ্বাস করবেন, কিংবা অভ্রান্ততার দাবিদার কোনো কর্তৃত্বের কাছে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে অবনত করবেন এমন আশা করা হতো না।

কিন্তু এই স্বাধীনতা কোনো সচেতন নীতি বা সুচিন্তিত প্রত্যয় থেকে উদ্ভূত হয়নি, আর তাই তা ছিল অত্যন্ত অনিশ্চিত। চিন্তার মুক্তি, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহনশীলতার প্রশ্নগুলি সমাজের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি এবং এগুলি কখনো গুরুত্বসহকারে বিবেচনাও করা হয়নি। যখন খ্রিস্টধর্ম রোমান সরকারের মুখোমুখি হয় তখন কেউই ধারণা করেনি যে, একটা ক্ষুদ্র, অখ্যাত, ও পেগান বিবেচনায় নীরস বা বিতৃষ্ণাজনক ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি সরকারের আচরণে সুগভীর সামাজিক গুরুত্বসম্পন্ন একটি নীতি জড়িত থাকবে। চিন্তার স্বাধীনতার তত্ত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজন ছিল উৎপীড়নের নীতি ও তা অনুশীলনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। খ্রিস্টীয় গির্জা যে বীভৎস দমননীতি অনুসরণ করেছিল এবং তার যেসব ফল ফলেছিল, তা-ই অবশেষে যুক্তিকে বাধ্য করলো ঐ সমস্যার মোকাবেলা করে বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার যৌক্তিকতা খুঁজে বের করতে। গ্রীক ও রোমানদের যে আত্মিক শক্তি তাদের রচনা ও কর্মের মধ্যে বেঁচে ছিল তা-ই সুদীর্ঘ কাল অন্তরালে থাকার পর পৃথিবীকে আবার আলোকিত করেছিল এবং যুক্তির আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছিল, যে যুক্তির রাজ্য তারা এক কালে ভোগ করেছিল অসতর্কভাবে এবং তার ভিত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত না করেই।

তথ্যনির্দেশ

১. *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার* গত [অর্থাৎ ১৯১৪-র অব্যবহিত পূর্ববর্তী] সংস্করণে 'সক্রেতিস' শীর্ষক নিবন্ধে প্রফেসর জ্যাকসন এ বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার করে দেখিয়েছেন।

২. পাপের উৎস সম্পর্কে ঈশ্বরতত্ত্বীয় সমস্যাকে তিনি এই ভঙ্গিতে বিবৃত করেছেন : হয় ঈশ্বর পাপ বিলুপ্ত করতে চান কিন্তু পারেন না, নয় পারেন অথচ করবেন না, কিংবা পারেনও না করবেনও না, অথবা পারেন এবং করবেন। প্রথম তিনটি ধারণা অচিন্ত্যনীয়, যদি তিনি ঈশ্বর নামের যোগ্য হন ; সুতরাং শেষ বিকল্পটিকে সত্য হতেই হবে। তাহলে পাপ আছে কেন ? সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, বিশ্বের নিয়ন্তা হিসেবে কোনো ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই।

৩. এই কবিতার একটি মনোজ্ঞ মূল্যায়ন পাওয়া যাবে আর, ওআই. টিরেল-এর *লেকচার্স অন ল্যাটিন পোএট্রি* [ল্যাতিন কবিতা বিষয়ক বক্তৃতামালা] বইএ।

৪. *অ্যাপলজি* লেখকদের সাক্ষ্যের জন্য দেখুন এ. বুশে-ল্যাকল্যার্ক, *রিলিজিআস ইন্টলারেন্স অ্যান্ড পলিটিক্স* [ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও রাজনীতি,] (ফরাসি ভাষায় লিখিত, ১৯১১)। এটি গোটা বিষয়টির একটি মূল্যবান পুনরীক্ষণ।

৫. এটি গিবনের ইংরেজি অনুবাদের বঙ্গানুবাদ। [বিউরি গিবনকৃত ইংরেজি অনুবাদ দিয়েছেন। তা থেকে বাংলা ভাষান্তর বর্তমান অনুবাদকের।]

তৃতীয় অধ্যায়

যুক্তির বন্দিদশা (মধ্যযুগ)

'ইডিক্ট অফ টলারেশন' বা ধর্মীয় সহনশীলতার ফরমান জারির প্রায় দশ বছর পরে কনস্তান্তিন দ্য গ্রেট [৩০৬–৩৭] খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেন। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সূচনা করলো সহস্রবর্ষব্যাপী এক যুগের যখন যুক্তি ছিল শৃখংলিত, চিন্তা ছিল দাসত্বদশায় এবং জ্ঞানের হয়নি কোনো অগ্রগতি।

যে দুই শতাব্দী যাবৎ খ্রিস্টানরা একটি নিষিদ্ধ সম্প্রদায় ছিল, তখন তারা সহনশীলতা দাবি করেছিল এই যুক্তিতে যে, ধর্মবিশ্বাস স্বেচ্ছামূলক এবং এটি জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু যখন তাদের ধর্ম প্রাধান্য লাভ করলো এবং তার পেছনে রাষ্ট্রীয় শক্তির সমর্থন মিললো, তখন তারা এই মত পরিত্যাগ করলো। তারা বিশ্বরহস্য সম্পর্কে মানুষের মতামতের বিভিন্নতা দূর করে এক পরিপূর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠার আশায় অভিযানে নেমে পড়লো, এবং মানুষের চিন্তাকে জোর করে বশে আনার নীতি কম–বেশি সুনির্দিষ্টভাবে অনুসরণ করতে শুরু করলো। সম্রাটেরা ও সরকারগুলি এই নীতি গ্রহণ করেছিল অংশত রাজনৈতিক কারণে। কেননা ধর্মীয় বিভেদ, যা সর্বদাই ছিল তিক্ততাপূর্ণ, রাষ্ট্রের ঐক্যের প্রতি বিপজ্জনক হয়ে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু মূল তত্ত্বটি নিহিত ছিল এই মতের মধ্যে যে একমাত্র খ্রিস্টীয় গির্জার মাধ্যমেই আত্মার মুক্তি লাভ ঘটতে পারে। খ্রিস্টীয় মতবাদে যারা বিশ্বাস করে না তারা অনন্তকালের জন্য নরকে যাবে এবং ঈশ্বর ধর্মসংক্রান্ত ভুল–ভ্রান্তিকে জঘন্যতম অপরাধ হিসাবে গণ্য করে শাস্তি দেন—এই প্রগাঢ় প্রত্যয় স্বাভাবিকভাবে উৎপীড়নের পথ খুলে দেয়।

নিজেদের চিরাগত স্বার্থ বিপন্ন দেখে 'একমাত্র সত্য' মতবাদকে মানুষের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া এবং ভুলের বিস্তার রোধ করা শাসকদের একটা কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ধর্ম বিষয়ে ভিন্নমতালম্বীরা সাধারণ অপরাধীদের চেয়ে মারাত্মক, আর মানুষ তাদেরকে যে যন্ত্রণা দিতে পারে তা নরকে তাদের জন্য যে যন্ত্রণা অপেক্ষা করছে তার তুলনায় কিছুই না—এই ছিল দৃঢ় ধারণা। ধর্মীয় ভুলের মাধ্যমে যেসব লোক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল তারা যতো গুণের অধিকারীই হোক না কেন, পৃথিবীকে তাদের অস্তিত্ব থেকে মুক্ত রাখা একটি সরল কর্তব্য। তাদের গুণগ্রাম তাদের অব্যাহতির পক্ষে কোনো যুক্তি হিসাবে বিবেচিত হতো না। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, খ্রিস্টানদের মানবিক মতবাদ অনুসারে পেগ্যান, অর্থাৎ নিতান্ত মানবীয়, গুণাবলী অধার্মিকতা ছাড়া আর কিছু নয় ; এবং খ্রিস্টধর্মে অদীক্ষিত অবস্থায় মৃত শিশুরা অনাগত সব কালটা নরকের মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে কাটাবে। এই ধরনের মতবাদ থেকে উৎসারিত অসহনশীলতা রকম ও প্রচণ্ডতায় পৃথিবী অতীতে যা কিছু প্রত্যক্ষ করেছে তার চেয়ে ভিন্ন হতে বাধ্য ছিল।

খ্রিস্টীয় গির্জার অসহনশীল নীতিমালার জন্য এর তত্ত্বসংক্রান্ত যুক্তি ছাড়াও এর পবিত্র গ্রন্থ *বাইবেলের* প্রকৃতিকেও অংশত দায়ী বলে অবশ্যই ধরতে হবে। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, খ্রিস্টানেরা তাদের ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে ইহুদি রচনাবলীকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। ঐসব রচনায় সভ্যতার এক নিম্নতর স্তরের ধ্যানধারণার প্রতিফলন ঘটেছে এবং সেগুলি বর্বরতায় পরিপূর্ণ। এটা বলা মুশকিল যে, *বাইবেলের* পুরাতন নিয়ম বা *ওল্ড টেস্টামেন্টের* ভক্তিমান পাঠক ঐ গ্রন্থ ঈশ্বর-প্রেরিত এ কথায় পূর্ণ আস্থা রেখে যে অমানবিকতা, হিংস্রতা ও ধর্মান্ধতা সমর্থন করতে বাধ্য, তার অনুশাসন ও উদাহরণ মানুষের নৈতিক চরিত্র কলুষিত করে কতোটা ক্ষতি সাধন করেছে। ঐ গ্রন্থ পীড়নতত্ত্বের জন্য এক অস্ত্রাগারস্বরূপ। সত্য হচ্ছে এই যে, [যুদীয়] পবিত্র গ্রন্থগুলি [মানুষের] নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ, কারণ তারা একটা বিশেষ সময়ের ধ্যান-ধারণা ও রীতিনীতিকে ঈশ্বর-নির্দিষ্ট বলে পবিত্রতার ঘোষণা দেয়। এক সুদূর অতীত যুগের পুস্তকসমূহ গ্রহণ করে খ্রিস্টধর্ম মানুষের উন্নতির পথে এক কদর্য প্রতিবন্ধক স্থাপন করেছিল। কারো কল্পনা করতে ইচ্ছে হতে পারে যে, ইতিহাস কি রকম ভিন্ন হতে পারতো—ভিন্ন অবশ্যই তা হতো—যদি খ্রিস্টানেরা তাদের কার্যক্রম থেকে জিহোবাহ্ [ইহুদিদের ঈশ্বর]-কে ছেটে ফেলতে এবং *নিউ টেস্টামেন্ট* বা নতুন নিয়ম নিয়েই সন্তুষ্ট থেকে *ওল্ড টেস্টামেন্টের* শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করতো।

কনস্তান্তিন দ্য গ্রেট ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের আমলে পুরাতন পৌত্তলিক দেবদেবীর পূজার বিরুদ্ধে এবং ভিন্নমতবলম্বী খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়গুলির বিরুদ্ধে ফরমানের পর ফরমান edict] সদম্ভে জারি হতে থাকে। সম্রাট জুলিয়ান দ্য অ্যাপস্টেট [ধর্মত্যাগী জুলিয়ান] তাঁর সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালে (৩৬১-৩৬৩ খ্রি.) পুরাতন ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন চেয়েছিলেন, ঘোষণা দিয়েছিলেন সার্বিক সহনশীলতার, কিন্তু স্কুলে শিক্ষকতা খ্রিস্টানদের জন্য নিষিদ্ধ করে তিনি তাদেরকে অসুবিধাজনক অবস্থায় রেখেছিলেন। এ ছিল একটি ক্ষণিক প্রতিরোধ মাত্র। পেগ্যান মতবাদ চূড়ান্তভাবে বিধ্বস্ত হলো চতুর্থ শতকের শেষে সম্রাট প্রথম থিওডোসিয়াস [৩৭৯-৯৫]-এর কঠোর আইনের বলে। ঐ মতবাদ আরো এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে এখানে-সেখানে, বিশেষত রোম ও এথেন্সে, টিকে থাকে তবে তার প্রভাব ছিল সামান্য। ধরাশায়ী প্রাচীনকালের জীবনবোধকে ধ্বংস করার চেয়ে খ্রিস্টানেরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করতেই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে। স্পেনে ধর্মদ্রোহী প্রিসিলিয়ান [আ. ৩৪০-৮৫]-এর প্রাণদণ্ড থেকে ধর্মদ্রোহিতার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেয়া শুরু হলো। এটা একটা চমকপ্রদ দৃশ্য যে, এ যুগের একজন অখ্রিস্টান খ্রিস্টান সম্প্রদায়গুলিকে শেখাচ্ছিলেন যে তাদের উচিত একে অপরকে সহ্য করা। পূর্ব রোমান] সম্রাট ভালেন্স [৩৬৪-৭৮]-এর উদ্দেশ্যে দেয়া একটি ভাষণে থেমিস্তিয়াস, যে খ্রিস্টানদের সাথে সম্রাটের মতের মিল ছিল না, তাদের বিরুদ্ধে জারিকৃত ফরমানসমূহ বাতিল করার জন্য তাঁকে বিশেষ অনুরোধ করেন এবং সহনশীলতার একটি তত্ত্ব উপস্থাপন করেন :

> ব্যক্তির ধর্মীয় বিশ্বাস এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে সরকারের কর্তৃত্ব কার্যকর হতে পারে না ; হুকুম মেনে চলতে বাধ্য হলে তা কেবল কপট চর্চাতেই পর্যবসিত হয়। প্রত্যেক ধর্মবিশ্বাসকেই অনুমোদন দেয়া উচিত : অযাজকীয় সরকারের উচিত নৈষ্ঠিক খ্রিস্টান ও বিরুদ্ধ মতাবলম্বী খ্রিস্টানদেরকে উভয়ের সাধারণ মঙ্গলের লক্ষ্যে শাসন করা। ঈশ্বর নিজেই স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়েছেন যে তিনি নানা ধরনের উপাসনায় আগ্রহী ; তাঁর

খ্রিস্টীয় গির্জার নেতৃস্থানীয় যাজকদের মধ্যে কেউ সন্ত অগাস্তিন (মৃ. ৪১০ খ্রি.)–এর চেয়ে অধিক সম্মান পাননি কিংবা উচ্চতর প্রামাণ্যতার অধিকারী হননি। তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহের জন্য পীড়নের নীতি প্রণয়ন করেন এবং ঐ নীতিকে তিনি ধর্মগ্রন্থের শক্ত ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। যীশু খ্রিস্ট–কথিত রূপক কাহিনীগুলির একটিতে ব্যবহৃত তাঁর "বাধ্য করো তাদেরকে ভেতরে আসতে"—এই শব্দাবলীই ছিল সেই ভিত্তি। দ্বাদশ শতকের শেষ অবধি গির্জা বিরুদ্ধ ধর্মমতসমূহ (heterodoxies) দমন করার জন্য কঠোরভাবে কাজ করে। অনেক উৎপীড়ন হয়েছিল, কিন্তু তা নিয়মতান্ত্রিক ছিল না। এ কথা মনে করার কারণ রয়েছে যে, বিরুদ্ধ মতের পশ্চাদ্ধাবনে গির্জা প্রধানত স্বীয় বৈষয়িক স্বার্থের বিবেচনা দ্বারা পরিচালিত হতো এবং যখন ভ্রান্ত মতের বিস্তার গির্জার আয় হ্রাসের আশংকা সৃষ্টি করতো কিংবা সমাজের জন্য মারাত্মক বিপদরূপে প্রতিভাত হতো, কেবল তখনই সে কঠোর ব্যবস্থা নিতে উদ্যত হতো। দ্বাদশ শতকের শেষে তৃতীয় ইনোসেন্ট [১১৯৮–১২১৬] পোপ হলেন এবং তাঁর আমলে পশ্চিম ইউরোপের গির্জা ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করে। তিনি ও তাঁর সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারীরা বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদেরকে খ্রিস্টীয় জগৎ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার জন্য সংগঠিত আন্দোলনের পরিকল্পনা করার ও তা শুরু করে দেওয়ার জন্য দায়ী।

দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সে লাংগুদোক (Languedoc) নামক স্থানে আল্‌বিজোয়া (Albigeois) বলে পরিচিত বিরুদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাধিক্য ছিল। এদের মতামত বিশেষভাবে বিরক্তিকর বলে মনে করা হতো। তারা ছিল তুলুজের কাউন্টের (Count of Toulouse) প্রজা এবং একটি পরিশ্রমী ও শ্রদ্ধার যোগ্য জনগোষ্ঠী। কিন্তু এই যাজকবিরোধী জনতার কাছ থেকে খ্রিস্টীয় গির্জা খুব সামান্য অর্থ পাচ্ছিল। তাই ইনোসেন্ট কাউন্টের প্রতি তাঁর শাসনাধীন এলাকা থেকে বিরুদ্ধ মত নির্মূল করার আহ্বান জানালেন। যখন কাউন্ট এই আবেদন অগ্রাহ্য করলেন তখন পোপ আল্‌বিজোয়াদের বিরুদ্ধে জেহাদ [Crusade] ঘোষণা করলেন, এবং যারা এতে সাহায্য করবে তাদের সকলকে সব মার্জনা করাসহ প্রথাগতভাবে ক্রুজেডার [ধর্মযোদ্ধা] দেরকে প্রদেয় পুরস্কারসমূহ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ফলে একের পর এক অনেকগুলি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হলো যাতে ইংরেজ সাইমন ডি মন্টফোর্ট [মৃ. ১২১৮] অংশ নিয়েছিলেন। পুরুষ, নারী ও শিশুদের পাইকারিভাবে আগুনে পুড়িয়ে ও ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা হয়েছিল। জনতার প্রতিরোধ ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। তবে তাতে বিরুদ্ধ মতের একেবারে উচ্ছেদ হয়নি। ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে তুলুজের কাউন্টের চূড়ান্ত অবমাননার মধ্যে দিয়ে ঐ যুদ্ধের অবসান হয়। এই ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এই যে, ইউরোপের সরকারি আইনের মধ্যে খ্রিস্টীয় গির্জা এই নতুন নীতির প্রবর্তন করলো যে, শাসক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন এই শর্তে যে তিনি বিরুদ্ধ ধর্মমত উচ্ছেদ করবেন। যদি পোপের আদেশে নিপীড়ন চালাতে তিনি ইতস্তত করেন তাহলে তাঁকে অবশ্যই বাধ্য করা হবে। এ রকম শাসকের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হতো ; এবং তাঁর রাজ্য গির্জা কর্তৃক প্ররোচিত যে–কোনো আক্রমণকারীর জবর দখলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এইভাবে পোপেরা কায়েম করলেন এক দেবতান্ত্রিক (theocratic) ব্যবস্থা যেখানে অন্য সকল স্বার্থকে ধর্মের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার মহাকর্তব্যের অধীনে রাখা হলো।

কিন্তু বিরুদ্ধ মতকে উন্মূলিত করার জন্য প্রয়োজন ছিল এ সব মতের সবচেয়ে গোপন আস্তানাগুলি আবিষ্কার করা। আলবিজোয়াদেরকে বিধ্বস্ত করা হলো, কিন্তু তাদের ধর্মমতের

বিষ কখনো বিনষ্ট হয়নি। ১২৩৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে পোপ নবম গ্রেগোরি [১২২৭–১২৪১] বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের খুঁজে বের করার জন্য 'ইনকুইজিশন' [ধর্মীয় বিচারসভা]নামে পরিচিত একটি সংগঠিত ব্যবস্থা চালু করেন এবং সেটি পূর্ণ প্রতিষ্ঠা পায় চতুর্থ ইনোসেন্ট [১২৪৩–৫৪]–এর এক অধ্যাদেশ [Bull] বলে (১২৫২ খ্রি.)। এই ইনকুইজিশন "প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রতিটি নগরীতে সমাজদেহের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে" উৎপীড়ন যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতো। মানুষের ধর্মীয় মতামতের স্বাধীনতাকে দাবিয়ে রাখার এই শক্তিশালী যন্ত্রটি ইতিহাসের এক অনন্য ঘটনা।

গির্জা যে নতুন কাজ হাতে নিলো তা সম্পাদনের ভার বহনের যোগ্যতা বিশপদের ছিল না। তাই প্রত্যেক যাজকীয় প্রদেশে মনোনীত খ্রিস্টীয় সন্ন্যাসীদের হাতে বিরুদ্ধধর্মীদেরকে খুঁজে বের করার জন্য পোপের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। এই ইনকুইজিটররা ছিল অপরিমিত ক্ষমতার অধিকারী, তাদের কোনো তত্ত্বাবধায়ক ছিল না ; কোনো মানুষের কাছে তাদের জবাবদিহিও করতে হতো না। এই রকম একটা ব্যবস্থা কায়েম করা মোটেই সহজ হতো না, যদি সমসাময়িক জাগতিক শাসকেরা নিজেদের উদ্যোগে বিরুদ্ধ ধর্মমতের বিরুদ্ধে এক নির্দয় আইন জারি না করতেন। ['পবিত্র রোমান'] সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক [১২২০–৫০] যিনি নিজে নিঃসন্দেহে একজন মুক্তচিন্তা চর্চাকারী ছিলেন, তিনি জার্মানি ও ইতালিতে তাঁর শাসনাধীন বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে (১২২০ থেকে ১২৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে) এই মর্মে আইন জারি করেছিলেন যে, সকল বিরুদ্ধধর্মীকে আইন বহির্ভূত বলে ঘোষণা করতে হবে। যারা তাদের ধর্মমত প্রত্যাহার না করবে তাদেরকে পুড়িয়ে মারতে হবে, যারা প্রত্যাহার করেছে তাদের জেলে রাখতে হবে, কিন্তু যদি তারা আবার পূর্ব মতে ফিরে যায় তাহলে তাদের প্রাণনাশ করতে হবে. তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে, তাদের বাড়িঘর ধ্বংস করতে হবে এবং দুই প্রজন্ম পর্যন্ত তাদের সন্তানরা বেতনভাতাযুক্ত পদের অযোগ্য থাকবে, যদি না তারা তাদের পিতা বা অন্য কোনো বিরুদ্ধধর্মীকে ধরিয়ে দিয়ে থাকে।

ফ্রেডারিকের আইন আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করাকে বিরুদ্ধ ধর্মাবলম্বনের সঠিক শাস্তি হিসাবে নির্দিষ্ট করে দেয়। ঐ অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের এই নৃশংস ধরনটি প্রথম একজন ফরাসি রাজা [দ্বিতীয় রবার্ট দ্য পায়াস (৯৯৬–১০৩১)] কর্তৃক বিরুদ্ধধর্মীদের উপর প্রয়োগ করা হয়েছিল (১০১৭ খ্রি.) বলে অনুমান করা হয়। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, মধ্যযুগে এবং তার অনেক পরেও সব রকম অপরাধের জন্যই শাস্তি দেয়া হতো চরম নিষ্ঠুরতার সাথেই। ইংল্যান্ডে অষ্টম হেনরির রাজত্বকালে [১৫০৯–৪৭] কতিপয় বিষপ্রয়োগ–কারীকে ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করে মারার একটা ঘটনা রয়েছে। বিরুদ্ধধর্ম অনুসরণ ছিল সবচেয়ে জঘন্যতম অপরাধ ; এবং এর বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার অর্থই ছিল নারকীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করা। বিরুদ্ধধর্মীদের বিরুদ্ধে যেসব নিষ্ঠুর আইন পাশ করা হয়েছিল তার প্রতি ব্যাপক জনমতের জোরালো সমর্থন ছিল।

ইনকুইজিশন যখন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হলো তখন তা খ্রিস্টীয় জগতের পশ্চিমাংশকে এমন এক জালে আবৃত করলো যার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা যেকোনো বিরুদ্ধধর্মীর পক্ষেই কঠিন ছিল। বিভিন্ন রাজ্যে তৎপর ইনকুইজিটররা পরস্পর সহযোগিতা ও তথ্য বিনিময় করতো, "গোটা মহাদেশীয় ইউরোপ জুড়ে শিকলের মতো বিছানো ছিল অসংখ্য বিচার

সভা।" ইল্যান্ড এই ব্যবস্থার বাইরে ছিল, কিন্তু চতুর্থ হেনরি [১৩৯৯–১৪১৩] ও পঞ্চম হেনরির [১৪১৩–১৪২২] আমল থেকে সরকার একটা বিশেষ আইনের (১৪০০ খ্রি. জারিকৃত, ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে বাতিলকৃত ; রাণী ম্যারি [১৫৫৩–৫৮]–র সময় পুনরুজ্জীবিত ; শেষবারের মতো ১৬৭৬ সালে বাতিলকৃত) অধীনে জীবন্ত দগ্ধ করার মাধ্যমে বিরুদ্ধ ধর্মাচার দমন করতো।

বিশ্বাসের ঐক্য চাপিয়ে দেয়ার কাজে ইনকুইজিশন সবচেয়ে সফল হয়েছিল স্পেনে। এখানে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এমন একটা ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল যার ছিল নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য এবং যেটি রোমান [অর্থাৎ পোপের] হস্তক্ষেপের প্রতি আত্যন্তিক ঈর্ষা পোষণ করতো। স্পেনীয় ইকুইজিশন (যা উনিশ শতক পর্যন্ত বাতিল করা হয়নি)–এর কৃতিত্বের মধ্যে একটি ছিল মরিস্কো বা ধর্মান্তরিত মুরদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা, কারণ তারা তাদের পুরোনো ইসলামি মত ও প্রথার অনেকগুলিই বজায় রেখেছিল। বলা হয়ে থাকে যে, এই ইনকুইজিশন স্পেন থেকে ইহুদি ধর্ম নির্মূল করেছিল এবং দেশটিকে প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারিদের প্রচারাভিযান থেকে সংরক্ষণ করেছিল। কিন্তু স্পেনকে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদের বিস্তার থেকে রক্ষা করার কৃতিত্ব ঐ ইনকুইজিশনের এ কথা প্রমাণ করা যায় না। কারণ, এটা খুবই সম্ভব যে, প্রোটেস্ট্যান্ট মতের বীজ যদি স্পেনে বোনাও হতো তা হলে তা এক অনুপযোগী মাটিতে পড়ে অনঙ্কুরিত থেকে যেত। যা হোক, চিন্তার স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে দমিত রাখা হয়েছিল।

বিরুদ্ধধর্মীদের খুঁজে বের করার কাজে সবচেয়ে ফলপ্রদ উপায়গুলির একটা ছিল 'ইডিক্ট্ অফ ফেইথ' [ইমানের ফরমান], যার বলে লোকদেরকে ইনকুইজিশনের কাজে তালিকাভুক্ত করা হতো এবং তাদের প্রত্যেককেই গোপন সংবাদদাতার কাজ করতে হতো। মাঝে মাঝে কোনো একটি জেলায় ইনকুইজিশনের লোক গিয়ে এই মর্মে ফরমান জারি করতো যে, যারা বিরুদ্ধধর্ম সম্পর্কে কোনো কিছু জানে তারা যেন এগিয়ে এসে তা প্রকাশ করে দেয়, অন্যথায় তাদের জন্য অপেক্ষা করবে ভয়াবহ জাগতিক ও আধ্যাত্মিক শাস্তি। ফলে কেউই তার প্রতিবেশীদের, কিংবা এমন কি তার নিজ পরিবারের লোকদের সন্দেহ থেকে মুক্ত ছিল না। "একটা দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে পদানত করার, তাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে পঙ্গু করার, এবং তাদেরকে অন্ধ আনুগত্যে বাধ্য করার জন্য এর চেয়ে অধিকতর সুদক্ষ কৌশল আর কখনো উদ্ভাবিত হয়নি। এর দ্বারা অভিযোগ আনয়ন করাকে উচ্চ ধর্মীয় কর্তব্যের মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছিল।"

বিরুদ্ধধর্ম চর্চার অভিযোগে অভিযুক্তদের বিচারের যে পদ্ধতি স্পেনে অনুসরণ করা হতো তা সত্য নির্ণয়ের প্রতিটি যৌক্তিক উপায়কে প্রত্যাখ্যান করেছিল। বন্দীকে অপরাধী বলেই ধরে নেওয়া হতো, তার নির্দোষত্ব প্রমাণের ভার তার উপরেই ন্যস্ত ছিল, বস্তুত তার বিচারকই ছিল তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়নকারী। তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানকারী যতো কুখ্যাতই হোক না কেন, তাদের সকলের সাক্ষ্যই সত্য বলে গ্রহণ করা হতো। অভিযোগের সপক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণের নিয়মাবলী ছিল শিথিল, আর বিবাদীর জবাবের সমর্থনে দেয়া সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যানের নিয়মগুলি ছিল কঠোর। ইহুদি, মরিস্কো, এবং ভৃত্যরা বন্দীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারতো, কিন্তু তার সপক্ষে দিতে পারতো না এবং ঐ একই নিয়ম প্রযোজ্য ছিল চতুর্থ পর্যায় পর্যন্ত আত্মীয়দের ক্ষেত্রে। ইনকুইজিশন যে নীতি অনুসরণ করে চলতো তা

ছিল এই : একজন অপরাধীর পার পেয়ে যাওয়ার চেয়ে একশত নিরপরাধ লোকের দণ্ডভোগ বরং ভালো। বিরুদ্ধধর্মীদেরকে পুড়িয়ে মারার চিতায় যে কেউ কাঠ সরবরাহ করলে তাকে ইন্‌ডাল্‌জেন্স অর্থাৎ [ধর্মীয় প্রয়োজনে নানা অপরাধ করার অধিকার] দেওয়া হতো। কিন্তু ইনকুইজিশনের বিচারকমণ্ডলী নিজেরা কখনো দহনদণ্ড দিতো না, কারণ গির্জা কখনো রক্তপাতের অপরাধে অপরাধী হতে পারে না। ধর্মীয় বিচারক এই মর্মে ঘোষণা দিতেন যে, আটক ব্যক্তি একজন বিরুদ্ধধর্মী যার সত্য ধর্মে ফিরে আসার আর কোনো আশাই নেই। তারপর তিনি তাকে জাগতিক কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পণ করতেন ('আলগা করে দিতেন' [relaxed]–এটাই ছিল অফিশিয়াল শব্দ) এবং "তার প্রতি সদয় ও ক্ষমাশীল ব্যবহার" করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ ও দায়িত্ব দিতেন। কিন্তু বেসামরিক কর্তৃপক্ষ ক্ষমার জন্য এই আনুষ্ঠানিক আবেদনে সাড়া দিতে পারতেন না, মৃত্যুদণ্ড দেওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো পছন্দ থাকতো না, যদি তাঁরা ভিন্ন কিছু করতেন তাহলে তাঁরা বিরুদ্ধধর্মের প্রশ্রয়দাতা বলে গণ্য হতেন। যাজকীয় আইন অনুসারে সকল রাজন্য ও কর্মকর্তা ইন্‌কুইজিশন কর্তৃক তাঁদের কাছে হস্তান্তরিত বিরুদ্ধধর্মীদের যথাযথভাবে ও দ্রুত শাস্তি দিতে বাধ্য ছিলেন, অন্যথায় তাদের খ্রিস্টমণ্ডলী থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার ভয় ছিল। উল্লেখ্য, আগুনে পুড়িয়ে মারা লোকের সংখ্যা জনগণের কল্পনায় অনেক বাড়িয়ে হিসাব করা হয়েছে ; কিন্তু ঐ ব্যবস্থায় অনুসৃত পদ্ধতির কারণে, এবং মৃত্যুদণ্ড ছাড়া আর যেসব শাস্তি দেওয়া হতো সেগুলির ফলে, সাজাপ্রাপ্তদের যে যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো তার মোট পরিমাণ বাড়িয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

এসব উৎপীড়নের কাজে গির্জা যে আইনগত পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল তা ইউরোপের মহাদেশীয় ফৌজদারি আইনের উপর এক কলুষকর প্রভাব ফেলেছিল। ইন্‌কুইজিশনের ইতিহাসবেত্তা ঐতিহাসিক হেনরি চার্লস লী [১৮২৫–১৯০৯] পর্যবেক্ষণ করেন :

> ইন্‌কুইজিশন যেসব অভিশাপ সাথে করে এনেছিল তার মধ্যে এটিই বোধ হয় সবচেয়ে বড়ো : বিরুদ্ধধর্ম বিনাশের জন্য ইনকুইজিশনের যে প্রক্রিয়া গড়ে উঠেছিল তা আঠারো শতকের শেষ বছরগুলি পর্যন্ত ইউরোপের বৃহত্তর অংশের সর্বত্র যেকোনো অভিযোগে অভিযুক্তদের প্রতি আচরণের প্রথাগত পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছিল।

ইন্‌কুইজিটররা, যারা গিবনের ভাষায় "নিষ্ঠুরতা দ্বারা নিরর্থক জিনিস রক্ষা করতো", প্রায়ই দানব বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। তাদের এবং যেসব রাজা তাদের ইচ্ছা বাস্তবায়িত করতো তাদের সপক্ষে এটুকু বলা যায় যে, তারা আদিম যুগের যেসব যাজক ও শাসক তাদের দেবতাদের উদ্দেশ্যে নরবলি দিত তাদের চেয়ে একটুও নিকৃষ্ট ছিল না। প্রাচীন গ্রিক রাজা আগামেম্‌নন [হোমারীয় মহাকাব্যে উল্লিখিত মাইসিনির রাজা] যিনি দেবতাদের কাছ থেকে অনুকূল সংকেত পাবার জন্য তার কন্যা ইফিজিনিয়াকে বলি দিয়েছিলেন, তিনি সম্ভবত একজন অতীব স্নেহশীল পিতা ছিলেন এবং যে ধর্মগুরু তাঁকে এ কাজ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন তিনি হয়তো অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা কাজ করেছিলনে তাঁদের বিশ্বাস অনুসারে। তেমনি মধ্যযুগে এবং তার পরে কোমল মনের লোকেরা এবং নৈতিকতার বিশুদ্ধতম প্রবক্তারাও একেবারে নির্দয় হয়ে পড়তেন তখন, যখন বিরুদ্ধধর্মের অস্তিত্ব সন্দেহ করা হতো। বিরুদ্ধধর্মের প্রতি ঘৃণা ছিল এক ধরনের সংক্রামক জীবাণু যার

উৎপত্তি হয়েছিল একমাত্র খ্রিস্টান ছাড়া আর কারো পরলোকে মুক্তি হবে না—এই মতবাদ থেকে।

এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, এই অন্ধ বিশ্বাস সত্যের ধারণাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। যেহেতু মানুষের অনন্তকালীন ভাগ্যের প্রশ্ন জড়িত ছিল, 'তাই সত্য বিশ্বাস' প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মিথ্যাচার ও প্রতারণাসহ যেকোনো উপায় অবলম্বন করাটা সরাসরি বৈধ কিংবা বাধ্যতামূলক বলে প্রতীয়মান হতো। ধর্মভাব বৃদ্ধির সহায়ক অলৌকিক ঘটনার বিবরণ দেওয়া অথবা কোনো অলীক কাহিনী বানিয়ে বলার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সংকোচ ছিল না। সতরো শতক পর্যন্ত সত্যের নিঃস্বার্থ গুণানুধাবন প্রাধান্য লাভ করতে শুরুই করেনি।

এই নীতি এবং পাপ, নরক, ও শেষ বিচার সংক্রান্ত তার সহযোগী নানা মত–বিশ্বাস যেমন উপরি উক্ত সব মারাত্মক ফল উৎপন্ন করেছিল, তেমনি খ্রিস্টধর্মের অন্যান্য মত–বিশ্বাস এবং বিবিধ ইঙ্গিত জ্ঞানের অগ্রগতির বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রাচীর তুলে মধ্যযুগে বিজ্ঞানের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল এবং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত বিজ্ঞানের প্রগতি ব্যাহত করেছিল। বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গনে মাঠ দখল করে বসেছিল নানা ভ্রান্ত মত যেগুলিকে খ্রিস্টীয় গির্জা সত্য বলে ঘোষণা করেছিল বাইবেলের অব্যর্থ মান্যতার দোহাই দিয়ে। বিশ্বসৃষ্টি ও স্বর্গ থেকে মানুষের পতন সম্বন্ধীয় হুবহু বিবরণ, যা খ্রিস্টীয় মুক্তিতত্ত্বের সাথে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পৃক্ত, তা ভূবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানকে অনুসন্ধানের আওতা থেকে বাইরে রেখেছিল। বাইবেলের আক্ষরিক ব্যাখ্যায় এই সত্যই তুলে ধরা হতো যে সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। গির্জা প্রতিপাদপৃষ্ঠ [পৃথিবীর যে কোন স্থানের ঠিক বিপরীতে অবস্থিত ভূপৃষ্ঠস্থ বিন্দু] তত্ত্ব বাতিল করে দিয়েছিল। সেরভেতুস [১৫১১–৫৩] (যাঁকে ষোড়শ শতকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল ; পৃ. ৩৬ দ্রষ্টব্য–এর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির একটি ছিল এই যে, বাইবেলে যুদীআকে দুগ্ধমধুপ্রবাহী ভূখণ্ড বলে বর্ণনা করা সত্ত্বেও তিনি বিশ্বাস করেছিলেন জনৈক গ্রীক ভূগোলবেত্তার দেওয়া বর্ণনা যে, দেশটা একটা নিকৃষ্ট ঊষর ভূমি মাত্র। গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রেটিস [৪০০ খ্রি. পূ.] ওষুধ ও রোগ সংক্রান্ত বিদ্যাকে স্থাপন করেছিলেন অভিজ্ঞতা ও প্রণালীবদ্ধ গবেষণার ভিত্তির উপর। [কিন্তু] মধ্যযুগে মানুষ আবার বর্বর যুগের আদিম ধ্যান–ধারণায় প্রত্যাবর্তন করে। শারীরিক রোগবালাইকে অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাবজাত, অর্থাৎ শয়তানের বিদ্বেষ কিংবা ঈশ্বরের ক্রোধের ফল বলে মনে করা হতো। সন্ত অগাস্তিন [খ্রি. ৩৫৪–৪৩০] বলতেন যে, খ্রিস্টানদের অসুখ–বিসুখের মূলে থাকে দৈত্য–দানবের কারসাজি ; এবং ঐ একই কায়দায় মার্টিন লুথার [১৪৮৩–১৫৪৬] সেগুলিকে শয়তানের কাজ বলে উল্লেখ করেছেন। অতিপ্রাকৃত কারণ থেকে উদ্ভূত ফলের প্রতিবিধানের জন্য অতিপ্রাকৃত প্রতিষেধক খোঁজা হবে এটাই যৌক্তিক। অলৌকিক গুণসম্পন্ন নানা পবিত্র বস্তুর বিরাট ব্যবসা গড়ে উঠেছিল এবং এর সুবিধা ছিল এই যে, এতে গির্জার বিপুল উপার্জন হতো। চিকিৎসকদের প্রায়ই ডাকিনীবিদ্যা চর্চা ও ধর্মে অবিশ্বাসের সন্দেহের সম্মুখীন হতে হতো। অঙ্গব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ ছিল, এবং তা সম্ভবত দেহের পুনরুত্থান সংক্রান্ত বিশ্বাসের কারণে কিছুটা। আঠারো শতকে যাজক সম্প্রদায় যে টিকাদানের বিরোধিতা করেছিলেন তা ছিল রোগ সম্পর্কে মধ্যযুগীয় ধারণার অবশেষ। রসায়ন (অর্থাৎ অ্যালকেমি বা অপরসায়ন)–কে একটি শয়তান–সংশ্লিষ্ট বিদ্যা বলে মনে করা হতো এবং ১৩১৭ সালে তা পোপ [দ্বাবিংশ জন (১৩১৬–১৩৩৪)] কর্তৃক নিন্দিত হয়েছিল। রজার বেকন [১২২০–১২৯২] গোঁড়া

খ্রিস্টধর্মের প্রবক্তা হলেও তাঁর ভেতর ছিল বৈজ্ঞানিক গবেষণার এক অস্বস্তিকর প্রবৃত্তি, যে জন্য তাঁকে দীর্ঘ কারাবাস ভোগ করতে হয়েছিল। এই ঘটনা বিজ্ঞানের প্রতি মধ্যযুগীয় অনাস্থার দৃষ্টান্তস্থল।

এটা সম্ভব যে, ধর্মীয় কারণে বিজ্ঞানের প্রতি এই অবিশ্বাস যদি ব্যাপক নাও হতো, তবু প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানের অগ্রগতি হয়তো সামান্যই হতো। কেননা, খ্রিস্টধর্ম শক্তিশালী হওয়ার পাঁচশো বছর আগেই গ্রীক বিজ্ঞানের অগ্রগতি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দের পরে আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হয়নি। এই অবক্ষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া সহজ নয়। তবে আমরা নিশ্চিত বলতে পারি যে, গ্রীক ও রোমান জগতের সামাজিক অবস্থার মধ্যেই খুঁজতে হবে ঐ ব্যাখ্যা। আমরা আরো সন্দেহ করতে পারি যে, মধ্যযুগের সামাজিক পরিবেশ বিজ্ঞান চেতনার—অর্থাৎ সত্যের নিঃস্বার্থ সন্ধানের প্রতিকূল প্রমাণিত হতে পারতো, এমন কি যদি নিয়ন্ত্রক বিশ্বাসসমূহ বিরুদ্ধভাবাপন্ন নাও হতো। আমরা সন্দেহ করতে পারি যে, তেরো শতকে (পরবর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য) যে নতুন সমাজ পরিবেশের সূচনা হয়েছিল তা একটা বিশেষ পরিপক্বতায় উপনীত না হওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞানের পুনর্জন্ম বিলম্বিত হতো। ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কিত বদ্ধমূল সংস্কার মধ্যযুগ অতীত হওয়ার পরেও টিকে থাকার মাধ্যমেই প্রধানত জ্ঞানের ক্ষতিসাধন করেছিল। অন্য কথায়, এক্ষেত্রে খ্রিস্টধর্মের মত ও বিশ্বাস প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতার মধ্যবর্তী অন্ধকার যুগে জ্ঞানবিরোধিতা দ্বারা যে অনিষ্ট সাধন করেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি করেছিল যখন তাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও বিজ্ঞান পুনরুজ্জীবিত হলো এবং তাকে ধ্বংস করা অসম্ভব হয়ে পড়লো, তখন তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

মধ্যযুগে ডাকিনীবিদ্যা, জাদুবিদ্যা ও দৈত্যদানবে দৃঢ় বিশ্বাস প্রাচীন যুগের উত্তরাধিকার হিসাবেই এসেছিল ; কিন্তু এ সময় তা আরো বেশি বীভৎস আকার ধারণ করে এবং পৃথিবীকে ভয়ঙ্কর করে তোলে। মানুষ বিশ্বাস করতো যে, তাদেরকে ঘিরে রয়েছে দানবের দল যারা তাদের ক্ষতি করার প্রতিটি সুযোগ নেওয়ার অপেক্ষায় আছে এবং মহামারী, ঝড়, চন্দ্রসূর্যের গ্রহণ ও দুর্ভিক্ষ হলো শয়তানের কাজ ; কিন্তু তারা অনুরূপ দৃঢ়তার সাথেই বিশ্বাস করতো যে, যাজকীয় অনুষ্ঠানাদি এসব শত্রুর সাথে এঁটে উঠতে সক্ষম। প্রথম দিককার খ্রিস্টান সম্রাটদের কেউ কেউ জাদু বিদ্যার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করেছিলেন, কিন্তু চৌদ্দ শতক পর্যন্ত ডাকিনীবিদ্যা উচ্ছেদ করার কোনো সুসম্বদ্ধ প্রচেষ্টা নেওয়া হয়নি। ঐ শতকে "ব্ল্যাক ডেথ" [কৃষ্ণ মারী] নামে যে মহামারী ইউরোপকে বিধ্বস্ত করেছিল, তার ফলে দৈত্যদানবের অদৃশ্য জগতের ভুতুড়ে ভয় যেন আরো বেড়ে গেলো। ডাইনিগিরির জন্য বিচারানুষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে চললো, এবং পরবর্তী তিনশো বছর ধরে ডাইনিগিরির ঘটনা খুঁজে বের করা ও যারা—প্রধানত মহিলা—তা চর্চার অভিযোগে অভিযুক্ত হতো তাদের ধ্বংস সাধন ছিল ইউরোপীয় সভ্যতার এক প্রতিষ্ঠিত বৈশিষ্ট্য। তত্ত্ব ও নির্যাতন দুই-ই পবিত্র ধর্মগ্রন্থ [বাইবেল] কর্তৃক সমর্থিত ছিল। ঐ উচ্চতম কর্তৃত্বের পরিষ্কার আদেশ ছিল, "তোমরা কোনো ডাইনির জীবিত থাকা বরদাশ্‌ত করবে না।" পোপ অষ্টম ইনোসেন্ট [১৪৮৪–৯২] এ ব্যাপারে এক অধ্যাদেশ [Bull] জারি করেছিলেন (১৪৮৪) যাতে তিনি দাবি করেন যে, প্লেগ ও ঝড় ডাইনিদের কাজ। সবচেয়ে সমর্থ মনের মানুষেরাও ডাইনিদের শয়তানি শক্তির বাস্তবতায় বিশ্বাস করতেন।

[কথিত] ডাইনিদের যেভাবে নির্যাতন করা হতো তার চেয়ে বেদনাদায়ক কাহিনী আর নেই, এবং এই নির্যাতন ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের চেয়ে কোথাও নৃশংসতর ছিল না। আমি এটা উল্লেখ করছি কারণ, ১. এ ছিল ঈশ্বরতত্ত্বীয় মতবাদের প্রত্যক্ষ ফল এবং ২. যুক্তিবাদই, আমরা দেখবো, আতঙ্কের ঐ দীর্ঘ অধ্যায়ের অবসান ঘটিয়েছিল।

অতএব, যে কাল পর্বে খ্রিস্টীয় গির্জার প্রতিপত্তি সবচেয়ে বেশি ছিল তখন যুক্তি ছিল শৃঙ্খলিত সেই কারাগারে, যা খ্রিস্টধর্ম গড়ে তুলেছিল মানব মনের চতুর্দিক ঘিরে। যুক্তি অবশ্য একেবারে নিষ্ক্রিয় থাকেনি, কিন্তু এর কাজ–কর্ম ধর্মীয় বিরুদ্ধ মতের রূপ নিয়েছিল। অথবা একই রূপক অনুসরণ করে বলা যায়, যারা শিকল ছিঁড়েছিল তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কারা–প্রাচীর অতিক্রম করে বাইরে আসতে পারেনি ; তাদের স্বাধীনতা এইটুকু মাত্র প্রসারিত হয়েছিল যে, তারা কতিপয় বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিল যেসব বিশ্বাস অধিষ্ঠিত তন্ত্রের মতোই খ্রিস্টীয় পুরাণ কথার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এই নিয়মের কিছু কিছু ব্যতিক্রমও ছিল। বারো শতকের শেষ নাগাদ অন্য এক জগৎ থেকে আসা একটি প্রেরণা অনুভূত হতে শুরু করলো। পশ্চিম খ্রিস্টীয় জগতের বিদ্বান লোকেরা আরিস্ততল [৩৮৪–৩২২ খ্রি. পূ.]–এর দর্শন সম্পর্কে অবগত হলেন ; তাঁদের শিক্ষকেরা ছিলেন ইহুদি ও মুসলমান। মুসলমানদের মধ্যে কিছু পরিমাণ মুক্ত চিন্তার চর্চা ছিল, যার প্রবর্তনা এসেছিল প্রাচীন গ্রীক কল্পদর্শন [Speculation] এ তাঁদের জ্ঞান থেকে। আরিস্ততলের দর্শনের উপর ভিত্তি করে রচিত আবু রুশদ (Averroes) [১১২৬–৯৮] এর গ্রন্থাবলী খ্রিস্টান দেশগুলিতে যুক্তিবাদের একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলেছিল। আবু রুশদ জড় পদার্থকে শাশ্বত বলে মনে করতেন এবং আত্মার অমরত্ব অস্বীকার করেছিলেন ; তাঁর সাধারণ মতকে সর্বেশ্বরবাদ বলা যায়। কিন্তু গোঁড়া ইসলামি কর্তৃপক্ষের সাথে সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য তিনি উপস্থাপন করেন 'দ্বৈত সত্য' তত্ত্ব, অর্থাৎ একই সাথে দুই স্বতন্ত্র ও পরস্পর বিরোধী সত্যের অস্তিত্ব—একটি দার্শনিক সত্য ও অপরটি ধর্মীয় সত্য। এতে কিন্তু তিনি স্পেনীয় খলিফার দরবার থেকে নির্বাসিত হওয়া থেকে বাঁচতে পারেননি। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষকতার ফলে মুক্ত চিন্তাবিদদের একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে যাঁরা মনে করতেন যে সৃষ্টি, দেহের পুনরুত্থান এবং অন্যান্য অপরিহার্য বিশ্বাস ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সত্য হতে পারে, কিন্তু যুক্তির দিক থেকে সেগুলি অলীক। সরলমনা মানুষের কাছে তত্ত্বটি এভাবে প্রতিভাত হয় : যেন কেউ বলেছে যে, [আত্মার] অমরত্বের তত্ত্ব রবিবারে সত্য কিন্তু সপ্তাহের অন্য দিনগুলিতে নয়, কিংবা পয়গম্বরের ধর্ম বসার ঘরে মিথ্যা এবং রান্নাঘরে সত্য। পোপ একবিংশ জন [১২৭৬–৭৭] এই বিপজ্জনক আন্দোলন চূর্ণ করে দেন এবং দুকুল রক্ষাকারী 'দ্বৈত সত্য' নীতিকে বাতিল বলে ঘোষণা করেন। আবু রুশদীয় কল্পনা তথা অনুরূপ অন্যান্য ধ্যান–ধারণার প্রসারের ফলে দক্ষিণ ইতালির আকিনো [Aquino] নামক স্থানের অধিবাসী থমাস (মৃ. ১২৭৪)–এর ধর্মতত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। তিনি ছিলেন একজন অতি সূক্ষ্ম চিন্তাবিদ যাঁর মনের একটা স্বাভাবিক টান ছিল সন্দেহবাদের প্রতি। যে আরিস্ততল এতো দিন অবিশ্বাসের পথপ্রদর্শক ছিলেন তাঁকে তিনি অধিষ্ঠিত ধর্মের পক্ষের তালিকায় স্থান দিলেন এবং নির্মাণ করলেন এক অভিনব খ্রিস্টীয় দর্শন যা এখনো রোমান [ক্যাথলিক] গির্জায় প্রামাণিক বলে স্বীকৃত। কিন্তু আরিস্ততল ও যুক্তি দুই–ই ধর্মবিশ্বাসের জন্য বিপজ্জনক মিত্র, এবং থমাসের বইখানি সম্ভবত তার সমাধানগুলি দ্বারা সন্দেহীর দ্বিধাদ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলার চেয়ে বরং শক্তিশালী ভাষায় উপস্থাপিত বিবিধ সন্দেহের দ্বারা বিশ্বাসপরায়ণ মনকে বিচলিত করার উদ্দেশ্যেই বিরচিত।

সব সময়ই এখানে–ওখানে কিছু কিছু ব্যক্তিগত ও গোপন অবিশ্বাস অবশ্যই ছিল, যা কোনো মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনেনি। পৃথিবী মুসা, যীশু ও মুহম্মদ এই তিন ভন্ড ব্যক্তি

দ্বারা প্রতারিত হয়েছে–এই অধার্মিকতাপূর্ণ উক্তি তেরো শতকে চালু ছিল। উক্তিটি মুক্ত চিন্তা সমর্থক [পবিত্র রোমান] সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের [রাজ. ১২২০–১২৫০] বলে বলা হতো এবং ঐ সম্রাট "প্রথম আধুনিক মানুষ" বলে বর্ণিত হয়েছেন। একই ধারণা একটু কোমলতর ভঙ্গিতে ব্যক্ত করা হয়েছে তিন আংটির গল্পে, যার প্রাচীনতা কম করে হলেও ঐ একই রকম। এক মুসলমান শাসক কোনো ধনী ইহুদির কাছ থেকে চাপ দিয়ে টাকা পয়সা আদায় করার মানসে তাকে নিজ দরবারে ডেকে এনে ফাঁদে আটকানোর চেষ্টা করলেন : "বন্ধুবর", তিনি বললেন, "আমি মানুষের মুখে প্রায়ই শুনে থাকি যে আপনি একজন অত্যন্ত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। তাহলে বলুন ইহুদি, মুসলমান ও খ্রিস্টানদের অনুসৃত তিনটি ধর্মের মধ্যে কোন্‌টিকে আপনি সবচেয়ে সত্য বলে বিশ্বাস করেন"। ইহুদি লোকটি বুঝলেন তাঁকে আটকানোর জন্য একটা ফাঁদ পাতা হয়েছে, এবং তিনি এভাবে প্রশ্নটির জবাব দিলেন :

> জাঁহাপনা, একদা এক বিত্তবান ব্যক্তির ধন–সম্পদের মধ্যে এমন মহামূল্যবান একটি আংটি ছিল যে তিনি সেটিকে তাঁর উত্তরাধিকারীদের জন্য এক চিরস্থায়ী পুরুষানুক্রমিক উত্তরাধিকার হিসাবে রেখে যেতে মনস্থ করলেন। তিনি এই মর্মে উইল সম্পাদন করলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেদের মধ্যে যার কাছে এই আংটিটি পাওয়া যাবে তাকেই তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। যে ছেলেকে তিনি ঐ আংটি দিলেন সেও তার বাবার মতোই ব্যবস্থা করলো এবং এভাবে আংটিটি বংশানুক্রমে হাত বদল হতে লাগলো। অবশেষে সেটি এমন এক ব্যক্তির অধিকারে আসলো যিনি তাঁর তিন ছেলেকে সমানভাবে ভালোবাসতেন। আংটিটি কাকে দিয়ে যাবেন সে ব্যাপারে মনস্থির করতে না পেরে তিনি প্রত্যেককেই গোপনে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে আংটিটি তাকেই দেবেন। তারপর তাদের সকলকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে জনৈক স্বর্ণকারকে দিয়ে আরো দুটি আংটি তৈরি করালেন। আসল আংটিটির সাথে এই আংটি দুটির সাদৃশ্য এতোই বেশি ছিল যে তিনি নিজেও সেটিকে আলাদা করে চিনতে পারলেন না। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তিনি প্রত্যেক ছেলেকেই একটা করে আংটি দিলেন ; ফলে প্রত্যেকেই নিজেকে তাঁর উত্তরাধিকারী বলে দাবি করলো, কিন্তু কেউই তার স্বত্ব প্রমাণ পারলো না, কারণ আংটিগুলির পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব ছিল না। তাই আদালতে সেই মামলা আজ অবধি চলছে। জাঁহাপনা, ঐ তিন জাতিকে ঈশ্বর যে তিনটি ধর্ম দিয়েছেন সেগুলি সম্পর্কেও ঐ একই কথা খাটে। তারা প্রত্যেকেই মনে করে যে তাদের ধর্মটিই সত্য, কিন্তু কার কাছে যে সেটি আছে সেই প্রশ্ন ঐ তিন আংটির প্রশ্নের মতোই আজও অমীমাংসিত।"

এই সন্দেহধর্মী কাহিনীটি আঠারো শতকে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে, যখন জার্মান কবি লেসিং [১৭২৯–৮১] অসহিষ্ণুতার অযৌক্তিকতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তার *নাথান দ্য সেজ* [মহাবিজ্ঞ নাথান] নাটকটি এই কাহিনীর উপর ভিত্তি করে রচনা করলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

পুনরুদ্ধারের প্রত্যাশা

রেনেসাঁস ও রিফর্মেশন [বা ধর্মসংস্কার]

যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক আন্দোলন মধ্যযুগের অন্ধকার দূর করে পথ প্রস্তুত করে দিয়েছিল তাঁদের জন্য যাঁরা পরিণামে যুক্তিকে কারাকক্ষ থেকে উদ্ধার করবেন, সেই আন্দোলন শুরু হয়েছিল ইতালিতে ত্রয়োদশ শতকে। অবোধ বিশ্বাস আর নাবালকের সরলতা দিয়ে গড়া যে কুহেলি মানুষের চেতনার উপর ঝুলে থেকে তাদের নিজেদেরকে বুঝতে দিচ্ছিলো না এবং বুঝতে দিচ্ছিলো না তাদের সাথে জগতের সম্পর্কটিকে, সেই যবনিকা এবার উঠতে শুরু করলো। ব্যক্তি তার পৃথক ব্যক্তিত্বকে অনুভব করতে শুরু করলো, শুরু করলো নিজ জাতি বা দেশ থেকে আলাদাভাবে একজন লোক হিসেবে তার স্বকীয় মূল্য সম্পর্কে সচেতন হতে (যেমনটা হয়েছিল গ্রীসে ও রোমে ঐ দুই সভ্যতার ইতিহাসের শেষের যুগগুলোতে) ; এবং তার চারপাশের জগৎটা মধ্যযুগীয় স্বপ্নের কুয়াশা ভেদ করে বেরিয়ে আসতে শুরু করলো। এই পরিবর্তনের মূলে ছিল ইতালির ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা। ঐ রাষ্ট্রগুলোর কোনো-কোনোটি ছিল প্রজাতন্ত্র এবং বাকিগুলো শাসিত হতো যদৃচ্ছাচারী শাসকদের [tyrants] দ্বারা।

এইভাবে মানুষের যে জগৎটা নিজেকে উন্মোচিত করছিল তাকে স্বীয় প্রয়োজন মেটানোর কাজে লাগাতে উৎসুক ছিল ব্যক্তি। এই উদ্দেশ্যে ঐ জগতে প্রবেশের জন্য তার দরকার ছিল পথপ্রদর্শকের ; আর সেই পথপ্রদর্শক পাওয়া গেল গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে। তাই ইতালি থেকে উত্তর ইউরোপ পর্যন্ত ত্বরিত গতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল যে সামগ্রিক রূপান্তর তা *রেনেসাঁস* বা গ্রীস ও রোমের ধ্রুপদী প্রাচীন যুগের পুনরাবির্ভাব বলে পরিচিত। কিন্তু ধ্রুপদী সাহিত্যে জাগ্রত কৌতূহল যদিও নতুন আদর্শ ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান দিয়ে ঐ আন্দোলনের চরিত্রে বিশেষত্ব এনেছিল এবং আন্দোলনকে বেড়ে উঠতে প্রেরণা যুগিয়েছিল, তবু এটা ছিল চেতনার ঐ পরিবর্তন চৌদ্দ শতকে নিজেকে যেভাবে প্রকাশ করতে শুরু করেছিল তার অবয়ব মাত্র। কল্পনা করা অসম্ভব নয় যে উক্ত পরিবর্তন অন্য কোনো আকারও নিতে পারতো। এর প্রকৃত নাম মানববাদ।

ঐ সময়ে মানুষ অনুভব করেনি যে তারা সভ্যতার এক নতুন যুগে প্রবেশ করছে। রেনেসাঁসের কৃষ্টিও তক্ষুণি অধিষ্ঠিত বিশ্বাসাদির বিরুদ্ধে কোনো প্রকাশ্য বা সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিক বিদ্রোহ সৃষ্টি করেনি। পৃথিবী ধীরে ধীরে এমন একটা আকার ধারণ করছিল যা ছিল মধ্যযুগীয় অধিষ্ঠানের দেওয়া শিক্ষার প্রতি নিশ্চিতভাবে অমিত্রভাবাপন্ন ; কিন্তু বৈরিতার কোনো বিস্ফোরণ ঘটেনি ; সতেরো শতকের আগে ধর্ম ও কর্তৃত্বের মধ্যে যুদ্ধ কোনো সুসম্বদ্ধ রূপ ধারণ করেনি। মানববাদীরা ঈশ্বরতত্ত্বধারী কর্তৃত্বের প্রতি কিংবা ধর্মীয়

বিশ্বাসের প্রতি বৈরিভাবাপন্ন ছিলেন না ; কিন্তু তাঁরা ইহজগৎ সম্পর্কে একটি বিশুদ্ধ মানবীয় কৌতূহল খুঁজে বের করেছিলেন এবং সেটি তাঁদের মনোযোগ পুরোপুরি অধিকার করেছিল। তাঁরা পৌত্তলিক সাহিত্যকে পরম আদরণীয় বস্তুতে পরিণত করেন এবং [খ্রিস্ট ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে] ঐ সাহিত্য ছিল প্রচুর বিষাক্ত জীবাণুতে পূর্ণ ; শিক্ষার জাগতিক দিকটি সার্বিক গুরুত্বের অধিকারী হলো, ধর্ম ও ঈশ্বরতত্ত্বকে রাখা হলো একটি পৃথক কক্ষে। ঐ অসঙ্গতির প্রতি সচেতন কোনো-কোনো কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তি হয়তো চাইতেন নতুন ধ্যান-ধারণার সাথে পুরোনো ধর্মের সমন্বয় সাধন করতে ; কিন্তু রেনেসাঁস যুগের চিন্তাবিদদের সাধারণ প্রবণতা ছিল ঐ দুই জগৎকে পৃথক রাখা এবং সত্যিকারের বুদ্ধিবৃত্তিক আত্মসমর্পণ না করে ধর্মবিশ্বাসের প্রতি বাইরে থেকে আনুগত্য চর্চা করে যাওয়া।

আমি রেনেসাঁসের এই দুমুখো বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ মিশেল মঁতেইন [Montoigne] [১৫৩৩-৯২]-এর কথা উল্লেখ করতে পারি। তাঁর *এসেইজ* [প্রবন্ধাবলী] বই-এ অধিষ্ঠিত ক্যাথলিক ধর্মের সমর্থনে অনেক উক্তি রয়েছে, আর এ ব্যাপারে লেখক সম্পূর্ণ অকপট। ঐ দুই দৃষ্টিকোণের মধ্যে সামঞ্জস্য আনার কোনো চেষ্টা নেই ; আসলে তিনি এই সন্দেহবাদী অবস্থান গ্রহণ করেছেন যে, যুক্তি ও ধর্মের মধ্যে কোনো সেতু নেই। ঈশ্বরতত্ত্বের এলাকায় মানববুদ্ধির কার্যকারিতা নেই, এবং ধর্মকে অবশ্যই রাখতে হবে উর্ধ্বে, যুক্তির নাগালের বাইরে ও তার হস্তক্ষেপের আওতা ছাড়িয়ে ; এবং তাকে [অর্থাৎ ধর্মকে] মেনে নিতে হবে সবিনয়ে। কিন্তু যদিও মঁতেইন সবিনয়ে [ক্যাথলিক] ধর্ম মেনে নিয়েছিলেন, এবং তা করেছিলেন এমন সব সংশয়ান্বিত যুক্তিতে যা তাঁকে ইসলাম ধর্ম মেনে নিতেও উৎসাহিত করতো যদি তাঁর জন্ম হয়ে থাকতো কায়রোতে ; অথচ তাঁর অন্তরাত্মা ছিল না ধর্মের শাসনাধীনে। তাঁর মনের গড়ন দিয়েছিলেন সিস্‌রো [১০৬-৪৩ খ্রি. পূ.] সেনেকা [৪ খ্রি. পূ.-৬৫ খ্রি.], প্লুটার্ক [আ. খ্রি. ৪৬-১১৯+] প্রমুখ প্রাচীন যুগের দার্শনিক ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা এবং তাঁরাই তা অধিকার করে রেখেছিলেন। মৃত্যুর সমস্যা আলোচনা করতে গিয়ে মঁতেইন এঁদের দিকেই মুখ ফিরিয়েছেন, খ্রিস্ট ধর্মের দেওয়া সান্ত্বনার দিকে নয়। তাঁর দেখা ফ্রান্সের ধর্মযুদ্ধসমূহ এবং সন্ত বার্থোলোমিউ দিবসের হত্যাকাণ্ড[১] (১৫৭২) তাঁকে তাঁর সংশয়বাদে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে নির্দিষ্ট অবদান রেখেছিল। ধর্মীয় নির্যাতনের প্রতি তাঁর মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে এই মন্তব্যে : "কাউকে তাঁর মতামতের জন্য অগ্নিদগ্ধ করা মানে ঐ মতামতের উচ্চ মূল্য নির্ধারণ করা"।

মঁতেইনের সন্দেহবাদের যৌক্তিক ফল প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল তাঁর বন্ধু পিয়ের শারোঁ [Charron] [১৫৪১-১৬০৩]-র রচনায় যিনি *অন উইজ্‌ডম* [বিজ্ঞতার বিষয়ে] শীর্ষক বই প্রকাশ করেন ১৬০১ খ্রিস্টাব্দে। এতে শেখানো হয় যে, প্রকৃত নৈতিকতা ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এবং লেখক সংক্ষেপে খ্রিস্টধর্মের ইতিহাস জরিপ করে অতীতে ঐ ধর্ম যেসব অমঙ্গলের জন্ম দিয়েছিল তা প্রদর্শন করেন। আত্মার অমরত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এটি সবচেয়ে ব্যাপকভাবে গৃহীত মত যা সবচেয়ে উপযোগিতার সাথে বিশ্বাস করা হয়, কিন্তু মানবীয় যুক্তি দ্বারা এর প্রতিপাদন একেবারেই দুর্বল। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি এটিসহ অন্য কয়েকটি অনুচ্ছেদে কিছুটা রদবদল করেন। সমকালের জনৈক জেসুইট[২] শারোঁকে সবচেয়ে বিপজ্জনক ও দুষ্ট-প্রকৃতির নাস্তিকদের তালিকাভুক্ত করেছিলেন। আসলে

তিনি ছিলেন একজন ডিইস্ট্ বা ঈশবাদী[৩] [স্রস্টার অস্তিত্বে মাত্র বিশ্বাসী ব্যক্তি] কিন্তু তখনকার দিনে এবং অনেক পরবর্তীকালেও একজন অখ্রিস্টীয় ঈশবাদীকে নাস্তিক বলতে কেউ দ্বিধাবোধ করতো না। তাঁর এই বই নিঃসন্দেহে বাজেয়াপ্ত করা হতো এবং তাকে শাস্তিও ভোগ করতে হতো, যদি তিনি ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ হেনরি (রাজ. ১৫৮৯–১৬১০)–র সমর্থন না পেতেন। এর একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে, কারণ এই ঘটনা মঁতেইন যার প্রতিনিধিত্ব করতেন সেই রেনেসাঁসের বাতাবরণ থেকে আমাদেরকে সরাসরি কম–বেশি আক্রমণাত্মক যুক্তিবাদের নতুন যুগে নিয়ে আসে।

চৌদ্দ, পনেরো ও ষোলো শতকে মানববাদ প্রথমে ইতালিতে ও পরে (ইউরোপের) অন্যান্য দেশে যা করেছিল তা হচ্ছে এমন একটি বুদ্ধিবৃত্তিক আবহাওয়া সৃষ্টি যেখানে যুক্তির বন্ধনমুক্তির কাজটি শুরু হতে পারে এবং জ্ঞানের অগ্রগতি পুনরায় আরম্ভ করা যায়। এই কালপর্বেই ঘটে মুদ্রণযন্ত্রের উদ্ভাবন এবং পৃথিবীর নতুন নতুন অংশের আবিষ্কার। আর এসব ঘটনা ভবিষ্যতে পুরোনো কর্তৃত্বের পরাজয়ে প্রচণ্ডভাবে সাহায্য করেছিল।

কিন্তু [চিন্তার] স্বাধীনতার বিজয় অন্যান্য কারণের উপরও নির্ভরশীল ছিল ; শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারাই এটি সাধিত হয়নি। ঐ সময়ের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ঘটনা ছিল : ইউরোপে পোপের ক্ষমতা হ্রাস, পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অবনতি, এবং শক্তিশালী রাজতান্ত্রিক রাজ্যসমূহের উত্থান। এসব রাজ্যে যাজকীয় নীতি নির্ধারিত ও নির্দেশিত হতো জাগতিক স্বার্থ দ্বারা এবং এসব রাজ্য থেকেই পরে আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল। এই সমুদয় অবস্থাই সম্ভব করেছিল রিফর্মেশন বা ধর্মসংস্কারের সাফল্য। উত্তর জার্মানিতে রিফর্মেশনের বিজয়ের কারণ ছিল শাসকদের জাগতিক স্বার্থ ; তাঁরা গির্জার জমিজমা বাজেয়াপ্ত করে লাভবান হয়েছিলেন। ইংল্যান্ডে কোনো গণ–আন্দোলন হয়নি ; নিজ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সরকারই ঐ পরিবর্তন সাধন করে নিয়েছিল।

রিফর্মেশনের প্রধান কারণ ছিল গির্জার ব্যাপক দূষণ এবং গির্জা কর্তৃক পরিচালিত নিদারুণ নিপীড়ন। দীর্ঘকাল যাবৎ পোপতন্ত্র পুরোপুরি জাগতিক স্বার্থদ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল এবং ঐ স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে স্বীয় আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব ব্যবহার করে একটি সেক্যুলার বা জাগতিক শক্তি হয়ে ওঠার চেয়ে উচ্চতর কোনো লক্ষ্য পোপতন্ত্রের ছিল না। ইউরোপের সকল রাষ্ট্রই এই ধারণার উপর তাদের কূটনীতির ভিত্তি স্থাপন করেছিল। চৌদ্দ শতক থেকে প্রত্যেকেই খ্রিস্টীয় গির্জার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতো, সংস্কারের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরিস্থিতি মন্দ থেকে আরো মন্দ হতে লাগলো এবং বিদ্রোহ ছাড়া আর কোনো উপায় রইলো না। মার্টিন লুথার [১৪৮৩–১৫৪৬] যে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তা অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তির বিদ্রোহের ফল ছিল না, বরং ছিল ঐ সময়ের সবচেয়ে প্রকট অপকার্য 'ইন্‌ডালজেন্স' [অসংযমের অনুমতি পত্র] বিক্রিসহ অর্থ আদায়ের নানা যাজকীয় কৌশলের প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভূত ব্যাপক যাজকবিরোধী মনোভাবের ফল। পোপ কর্তৃক প্রদত্ত ইন্‌ডালজেন্স সংক্রান্ত তত্ত্ব নিয়ে গবেষণাই লুথারকে ধর্মতত্ত্বে বিরুদ্ধমত অবলম্বনের পথে এগিয়ে নেয়।

রিফর্মেশন ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা করেছিল—এটি একটি প্রাথমিক ভ্রম। কিন্তু যাঁদের ইতিহাস জ্ঞান ভাসা–ভাসা তাঁদের অনেকেই এখনো এটি ধরে

আছেন। রিফর্মেশন যা করেছিল তা হচ্ছে, ১. নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি, যার অধীনে পরিণামে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা গিয়েছিল এবং ২. আন্দোলনের কতিপয় সহজাত অসঙ্গিতর কারণে পরিশেষে এমন ফলাফল উৎপাদন, যা দেখলে এর নেতারাও কেঁপে উঠতেন। কিন্তু নিজেদের মত থেকে ভিন্ন কিছু সহ্য করার চেয়ে নেতৃস্থানীয় রিফর্মারদের মন থেকে দূরের বস্তু আর কিছু ছিল না। তাঁরা এক কর্তৃত্বের জায়গায় আর এক কর্তৃত্ব নিয়ে এলেন। তাঁরা গির্জার পরিবর্তে বাইবেলের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন, কিন্তু তা ছিল লুথারের মতবর্তী বাইবেল, অথবা জন ক্যাল্‌ভিন [১৫০৯–৬৪]–এর মতের অনুকূল বাইবেল। অসহিষ্ণুতার উদ্দীপনার কথা যদি ধরা যায়, তাহলে নতুন ও পুরোনো গির্জার মাঝখানে পছন্দ করার মতো কিছু ছিল না। ধর্মযুদ্ধগুলো স্বাধীনতার জন্য হয়নি, হয়েছিল বিশেষ বিশেষ মতগুচ্ছ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ফ্রান্সে যদি প্রটেস্ট্যান্টরা জয়লাভ করতো তাহলে নিশ্চিত বলা যায় যে তারা ক্যাথলিকদেরকে যে শর্তাবলী দিত, তা ক্যাথলিকরা তাদেরকে যা দিয়েছিল তার চেয়ে উদারতর হতো না।

লুথার বিবেকের স্বাধীনতা ও উপাসনার স্বাধীনতার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, কারণ ধর্মগ্রন্থকে তিনি যেভাবে পাঠ করতেন তার সাথে ঐ নীতি সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। তিনি ধর্মীয় দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারতেন, বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের পুড়িয়ে মারার বিরুদ্ধে কঠোর নিন্দা জ্ঞাপন করতে পারতেন, তবে তা তখন, যখন তাঁর নিজের ও তাঁর দলের ঐসব নির্যাতনের শিকার হওয়ার ভয় ছিল। কিন্তু যখন তিনি নিরাপদ ও ক্ষমতাসীন হলেন তখন তিনি তাঁর আসল মত জারি করলেন—রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে সত্য ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করা এবং বিরুদ্ধ মত, যা অতি ঘৃণার বস্তু, তার উচ্ছেদ সাধন ; প্রজাদের দায়িত্ব হচ্ছে ধর্মীয় ও অন্যান্য ব্যাপারে রাজার প্রতি নিঃসীম আনুগত্য প্রদর্শন ; এবং রাষ্ট্রের লক্ষ্য হচ্ছে ধর্মকে প্রতিরক্ষা দেওয়া। তিনি মনে করতেন, অ্যানাব্যাপ্টিস্ট[৪] সম্প্রদায়ের লোকদের শিরশ্ছেদ হওয়া উচিত। নির্দিষ্ট একটা সম্প্রদায়ের লোক ছাড়া আর কারো আধ্যাত্মিক মুক্তি হবে না—এই বিশ্বাস প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক উভয়ের ক্ষেত্রে একই পরিণতি ডেকে এনেছিল।

অসহিষ্ণুতার জন্য ক্যাল্‌ভিনের অখ্যাতি সবচেয়ে বেশি। লুথারের মতো তিনি অযাজকীয় শাসকের সর্বময় ক্ষমতার পক্ষে ওকালতি করেননি ; তিনি গির্জা কর্তৃক রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী ছিলেন—যে শাসন ব্যবস্থাকে সাধারণত থিওক্রেসি বা দেবতন্ত্র বলা হয়ে থাকে এ ছিল তাই ; এবং তিনি [সুইজারল্যাণ্ডের] জিনিভাতে এক দেবতান্ত্রিক রাষ্ট্রই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে স্বাধীনতাকে একেবারে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছিল ; কারাবাস, নির্বাসন, ও মৃত্যুদণ্ডের দ্বারা সকল 'ভ্রান্ত' মত দমন করা হয়েছিল। বিরুদ্ধ ধর্মমতের বিরুদ্ধে ক্যালভিন যে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন তার সবচেয়ে বিখ্যাত ঘটনা ছিল সেরভেতুসের দণ্ড। স্প্যানিশ জাতীয় সেরভেতুস [১৫১১–১৫৫৩] ত্রিত্ববাদের বিরুদ্ধে লিখে লিয়ন্সে [Lyons] (অংশত ক্যাল্‌ভিনের ষড়যন্ত্রের কারণে) কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। তারপর সেখান থেকে পালিয়ে তিনি ভাল করে না ভেবে–চিন্তে তাড়াতাড়ি জিনিভাতে এসে পৌছলেন। বিরুদ্ধ মতাবলম্বনের অভিযোগে বিচার করে তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হলো (১৫৫৩), অথচ তাঁর উপর জিনিভা কর্তৃপক্ষের কোনো আইনগত এখতিয়ার ছিল না। নির্যাতনের নীতিমালা যিনি প্রণয়ন করেছিলেন সেই মেলাঙ্কথন [১৪৯৭–১৫৬০] এই কাজকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য এক স্মরণীয় দৃষ্টান্ত বলে প্রশংসা করেছিলেন। ভবিষ্যৎ বংশধরদের অবশ্য একদা ঐ

দৃষ্টান্তের জন্য লজ্জিত হতে হয়েছিল। ১৯০৩ সালে জিনিভার ক্যালভিনপন্থীরা একটি প্রায়শ্চিত্তসূচক সৌধ নির্মাণের তাগিদ অনুভব করেন। তাতে "আমাদের মহান সংস্কারক" ক্যালভিনকে একটা ভুল কাজের জন্য অপরাধী হিসেবে ক্ষমা করা হয় এই বলে যে "সেটি ছিল তাঁর শতাব্দীর [অর্থাৎ যুগের] ভুল।"

এইভাবে রিফর্মাররা যে গির্জা থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন তার মতোই, স্বাধীনতার তোয়াক্কা করতেন না, তাঁরা তোয়াক্কা করতেন শুধু 'সত্যে'র। মধ্যযুগীয় আদর্শ যদি হয়ে থাকে পৃথিবীকে বিরুদ্ধধর্মী মুক্ত করা, তাহলে প্রটেস্ট্যান্টদের লক্ষ্য ছিল তাদের ভূখণ্ডে কোনো ভিন্নমতাবলম্বীকে থাকতে না দেওয়া। জনসাধারণকে তাড়িয়ে নিয়ে একটা সম্প্রদায়ে ভর্তি করা হতো এবং তাদেরকে তাদের শাসকের আদেশ মতো ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করতে হতো। এ ছিল সেই নীতি যা লিপিবদ্ধ হয়েছিল ক্যাথলিক [হোলি রোমান] সম্রাট ও প্রটেস্ট্যান্ট জার্মান রাজন্যবর্গের মধ্যেকার লড়াই প্রশমিত হয়েছিল যে সন্ধিদ্বারা [পীস অব অগ্‌স্‌বুর্গ] (১৫৫৫) সেই সন্ধিতে। ক্যাথ্‌রিন দ্য মেদিচি [ক্ষমতায় ১৫৬০–১৫৭৪] যখন ফরাসি প্রটেস্ট্যান্টদেরকে নির্বিচারে হত্যা [১৫৭২] করে ইংল্যান্ডের রাণী [প্রথম] এলিজাবেথ [রাজ. ১৫৫৮–১৬০৩]–কে এই সংকেত দিলেন যে তিনিও ইংরেজ ক্যাথলিকদের প্রতি অনুরূপ আচরণ করতে পারেন, তখন ক্যাথারিন ঐ নীতি মেনেই কাজ করেছিলেন।

প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মমতসমূহ জ্ঞানবিজ্ঞান বিস্তারের প্রতিনিধিত্বও করতো না। মহাদেশীয় ইউরোপে রিফর্মেশন স্বাধীনতার প্রতি যেমন, জ্ঞানের আলো প্রসারের প্রতিও তেমনি শত্রুভাবাপন্ন ছিল এবং বিজ্ঞান যদি বাইবেলের বিরুদ্ধে যাচ্ছে বলে মনে হতো তাহলে লুথারের কাছে তার সম্ভাবনা সেই রকমই শূন্য ছিল যেমনটা ছিল পোপের কাছে। প্রটেস্ট্যান্টদের বা রোমান গির্জার বিখ্যাত বাইবেল সমভাবেই ডাইনিদের প্রাণনাশের ব্যবস্থা রেখেছিল। বস্তুত জার্মানিতে দীর্ঘকাল যাবৎ বিদ্যাচর্চার অগ্রগতি হয়নি।

তবুও রিফর্মেশন অনিচ্ছাকৃতভাবে স্বাধীনতার পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। [রিফর্মেশনের] ফলাফল হয়েছিল এর নেতাদের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী এবং হয়েছিল পরোক্ষ ও দীর্ঘ বিলম্বিত। প্রথমত, পাশ্চাত্য খ্রিস্টধর্মে যে বিরাট ফাটল সৃষ্টি হলো যার ফলে একের পরিবর্তে অনেকগুলি ধর্মীয় কর্তৃত্ব—বলা যেতে পারে, এক ঈশ্বরের জায়গায় কতিপয় দেবতা—প্রতিষ্ঠিত হলো, সেই ফাটল সাধারণভাবে যাজকীয় কর্তৃত্বকে দুর্বল করে ফেলে। ধর্মের ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, প্রটেস্ট্যান্ট রাজ্যগুলোতে যাজকীয় ক্ষমতা রাজার হাতে ন্যস্ত ছিল, গির্জার স্বার্থ ছাড়াও আরো অনেক বিষয়ে রাজাকে মনোযোগ দিতে হতো এবং রাজনৈতিক কারণে আজ হোক কাল হোক তাঁকে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার নীতি পরিবর্তনে বাধ্য হতে হয়েছিল। ক্যাথলিক রাজ্যগুলোও ঐ একই প্রক্রিয়ায় বাধ্য হয়েছিল বিরুদ্ধধর্মীদেরকে সহ্য না করার কর্তব্য থেকে সরে আসতো। ফ্রান্সে ধর্মীয় যুদ্ধবিগ্রহের পরিণতিতে প্রটেস্ট্যান্টদের প্রতি সীমিত সহিষ্ণুতার ব্যবস্থা হয়েছিল। কার্ডিনাল রিশ্‌ল্যু [১৫৮৫–১৬৪২] জার্মানিতে প্রটেস্ট্যান্টদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন ; তাঁর এই নীতি স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয় কিভাবে জাগতিক স্বার্থ ধর্মের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তা ছাড়া [রোমান ক্যাথলিক] গির্জার বিরুদ্ধে প্রটেস্ট্যান্ট বিদ্রোহের বুদ্ধিবৃত্তিক যৌক্তিকতা ছিল ব্যক্তির বিচারবুদ্ধির অধিকার, অর্থাৎ ধর্মীয় স্বাধীনতার নীতি। কিন্তু রিফর্মাররা এটি দাবি করতেন শুধুমাত্র নিজেদের জন্যই এবং যখনই তাঁরা নিজেদের ধর্মীয়

বিধিমালা প্রণয়ন করলেন, তখনই কার্যত এ নীতি তাঁরা পরিত্যাগ করেন। প্রটেস্ট্যান্ট অবস্থানে এটাই ছিল সবচেয়ে জ্বলন্ত অসঙ্গতি। আর যে দাবিকে তাঁরা এক পাশে ঠেলে রেখেছিলেন তাকে কিন্তু স্থায়ীভাবে চেপে রাখা যায়নি। এখানেও প্রটেস্ট্যান্ট মতবাদ দাঁড়িয়ে ছিল এক নড়বড়ে ভিত্তির উপর, যা কোনো যুক্তি দিয়ে রক্ষা করা সম্ভব ছিল না ; এবং তা অপরিহার্যভাবে এক অসমর্থনযোগ্য অবস্থান থেকে আর এক অসমর্থনযোগ্য অবস্থানের দিকে ধাবিত হতে লাগলো। যদি আমাদের কোনো কর্তৃত্বে আস্থাবান হতেই হয়, তাহলে রোমান গির্জার পুরাতন সম্মানিত কর্তৃত্বের চেয়ে অগস্‌বুর্গের 'লুথ্‌রান কনফেশন' [লুথারীয় স্বীকারোক্তি][৫] অথবা 'ইংলিশ থার্টি-নাইন আর্টিকল্‌স' [ইংল্যান্ডের উনচল্লিশ দফা][৬]-এর ভুঁইফোঁড় নির্দেশ অধিক পছন্দ করতে যাবো কেন? আমরা যদি রোমের বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত নিই, তা অবশ্যই নিতে হবে যুক্তির মাধ্যমে ; কিন্তু যদি আমরা এ ব্যাপারে একবার যুক্তি ব্যবহার করি, তাহলে লুথার বা ক্যালভিন কিংবা অন্য বিদ্রোহীরা যেখানে থেমে গেছেন আমরা সেখানে থামবো কেন, যদি না আমরা ধরে নিই যে তাঁদের একজন প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ছিলেন? তাঁরা যেসব কুসংস্কার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, আমরাও যদি সেগুলো প্রত্যাখ্যান করি তাহলে একমাত্র তাঁদের কর্তৃত্ব ছাড়া এমন কিছুই নেই যা আমাদেরকে তাঁরা যেসব কুসংস্কার বজায় রেখেছিলেন তার সবগুলো বা কিছু সংখ্যককে প্রত্যাখ্যান করা থেকে বিরত রাখতে পারে।

তদুপরি, তাদের বাইবেল-পূজা এমন সব ফল উৎপাদন করেছিল যা তাঁরা কল্পনা করেননি।[৭] উক্ত ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহ যে প্রত্যাদিষ্ট দলিলের উপর নির্ভর করতো তা হয়ে গেল একখানা খোলা বই। এর দিকে জনসাধরণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো, যেমনটি আগে কখনো হয়নি, যদিও এটা বলা যাবে না যে উনিশ শতকের আগে গ্রন্থটি সবাই পড়েছিল। অধ্যয়ন নিয়ে এলো সমালোচনা ; প্রত্যাদেশের প্রতিবদ্ধ বিশ্বাসের অসুবিধাগুলোর মর্ম উপলব্ধি করা গেল ; আর বাইবেলকে অবশেষে নির্মম ব্যবচ্ছেদের আওতায় আনতে হলো, যার ফলে বুদ্ধিমান বিশ্বাসীদের চোখে অন্তত ঐ গ্রন্থের কর্তৃত্বের মান বদলে গেছে। বাইবেল-সমালোচনার প্রক্রিয়া প্রধানত প্রটেস্ট্যান্ট আবহাওয়াতে চালানো হয়েছিল এবং এর আংশিক দায়িত্ব অবশ্যই বর্তায় রিফর্মেশন বাইবেলকে যে নতুন অবস্থানে স্থাপন করেছিল তার উপর। এই পন্থায় প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম যুক্তিবাদের একটি সোপানে পরিণত হয় এবং এভাবেই বিবেকের স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করে।

তবে ঐ আদর্শকে জোরের সাথে ও সরাসরি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল রিফর্মারদের একটা সম্প্রদায়, যারা অন্য সকলের চোখে ছিল ঈশ্বরনিন্দুক এবং যাদের কথা রিফর্মেশন সম্পর্কে কথা বলার সময় বেশির ভাগ লোক কখনো ভাবেও না। আমি সোশিনিয়ানদের [Sociniams] কথাই বলছি। তাদের সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে পরের অধ্যায়ে কিছু বলা হবে।

রিফর্মেশনের আর একটা ফলের কথা এখনো বলতে বাকি আছে। তা হচ্ছে রোমান গির্জার উপর এর নবজীবনদায়ী প্রভাব। রোমান গির্জাকে তখন অস্তিত্বের জন্য লড়াই করতে হচ্ছিল। ধর্মের ব্যাপারে সত্যিকার আন্তরিক এমন পোপদের একটি নতুন পর্যায় শুরু হলো তৃতীয় পল [১৫৩৪-১৫৪৯] থেকে। তাঁরা পোপতন্ত্র ও তার সম্পদ পুনর্গঠিত করলেন কয়েক শতক ব্যাপী এক সংগ্রামের জন্য।[৮] জেসুইট সংঘের প্রতিষ্ঠা (১৫৪০), রোমে ইনকুইজিশনের

স্থাপনা (১৫৪২)[৯] ট্রেন্টের কাউন্সিল,[১০] প্রকাশনার উপর খবরদারি (নিষিদ্ধ পুস্তকসমূহের তালিকা Index of Forbidden Books)[১১] প্রভৃতি ছিল এই নতুন উদ্যমের বহিঃপ্রকাশ এবং নতুন পরিস্থিতির সাথে এঁটে ওঠার পন্থা। রোমান গির্জার বিশ্বাসী সন্তানদের জন্য পুনর্গঠিত পোপতন্ত্র ছিল সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু এখানে যে জিনিসটির সাথে আমাদের সম্পর্ক তা হচ্ছে এই যে, নবগঠিত পোপতন্ত্রের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যের মধ্যে একটা ছিল আরো কার্যকরভাবে স্বাধীন চিন্তাকে দমন করা। ন্যায়সম্মত জীবন যাপনের পক্ষে ফ্লোরেন্সে প্রচার করতে গিয়ে জিরোলামো সাভোনারোলা [১৪৫২–১৪৯৮]–র প্রাণদণ্ড হয়েছিল (১৪৯৮) কুখ্যাত লম্পট পোপ ষষ্ঠ আলেকজান্ডার [১৪৯২–১৫০৩]–এর সময়ে। স্যাভোনারোলা যদি এই নতুন যুগের লোক হতেন তাহলে তাঁকে হয়ত মহাত্মার সম্মান দেওয়া হতো ; কিন্তু [তা হয়েও] জিঅরদানো ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

জিঅরদানো ব্রুনো [১৫৪৮–১৬০০] একটা ধর্মীয় দর্শন নির্মাণ করেছিলেন যা অংশত এপিকিউরাস (৩৪১–২৭০ খ্রি. পূ.)–এর দর্শনের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। এপিকিউরাসের কাছ থেকে তিনি নিয়েছিলেন ব্রহ্মাণ্ডের অসীমত্বের তত্ত্ব। কিন্তু ঈশ্বর বস্তুর আত্মা এই তত্ত্বের সাহায্যে এপিকিউরীয় বস্তুবাদকে একটি সবেশ্বরবাদী মরমিয়া তত্ত্বে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে কোপার্নিকাস [১৪৭৩–১৫৪৩]–এর এই সাম্প্রতিক আবিষ্কার, যা ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টরা সমভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তা মেনে নিয়ে ব্রুনো আর এক ধাপ এগিয়ে স্থির তারকাগুলোকে প্রত্যেকের অদৃশ্য গ্রহদলসহ একেকটি সূর্য বলে বিবেচনা করেন। বাইবেল (ব্রুনো মনে করতেন) অশিক্ষিত জনগণের উদ্দেশ্যে রচিত বলে তাকে তাদের নানা কুসংস্কারের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছিল। তাই তিনি বাইবেলের সাথে সমঝোতায় পৌঁছতে চেয়েছিলেন। বিরুদ্ধ মত পোষণের জন্য সন্দেহভাজন হলে তিনি ইতালি ছেড়ে ক্রমান্বয়ে সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ও জার্মানিতে বাস করার পর ১৫৯২ সালে জনৈক কপট বন্ধুর প্ররোচণায় ভিনিসে প্রত্যাবর্তন করলে ইনকুইজিশনের আদেশে তাঁকে ধরা হয়। অবশেষে রোমে দণ্ডাজ্ঞা দেয়ার পর তাঁকে 'কাম্পো দ্য ফিওরি' (Campo de' Fiori) নামক দহনস্থলীতে পুড়িয়ে মারা হয় (১৬০০)। এখন ঐ জায়গায় তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে আছে একটি স্মৃতিসৌধ যা কয়েক বছর আগে রোমান গির্জার চরম বিরক্তির মুখে নির্মাণ করা হয়েছিল।

ব্রুনো পৃথিবীর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি বলে তাঁর দুর্ভাগ্য নিয়ে অনেকই বলা ও লেখা হয়। ইতালির মতো আর কোনো দেশে ঐ যুগের বলি হিসেবে স্মরণ করার মতো এমন অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি নেই। কিন্তু প্রচলিত ধর্মের বিরোধী মত পোষণ করার জন্য সেসব দেশেও ঠিক একই রকম নির্দোষ মানুষের রক্তপাত ঘটানো হয়েছিল। চতুর্থ হেনরির [রাজ. ১৫৮৯–১৬১০] এবং কার্ডিনাল রিশল্যু [১৫৮৫–১৬৪২] ও মাজারিন[১২] [১৬০২–১৬৬১]–এর অপেক্ষাকৃত সহনশীল সরকারের শাসনাধীন ফ্রান্সে মোটামুটি ১৬৬০ সাল পর্যন্ত অন্য দেশের চেয়ে বরং বেশি স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু ১৬১৯ খ্রিস্টাব্দে তুলুজে লুচিলিও ভানিনি নামক জনৈক ইতালীয় বিদ্বান, যিনি ব্রুনোর মতো ইউরোপের নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতেন, তিনি নাস্তিক ও ঈশ্বরনিন্দুক হিসেবে দোষী সাব্যস্ত হন ; তাঁর জিহ্বা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল এবং তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। [প্রথম] এলিজাবেথ ও প্রথম জেম্‌স [রাজ. ১৬০৩–১৬২৫]–এর শাসনাধীন প্রটেস্ট্যান্ট ইংল্যান্ড রোমান ইনকুইজিশনের চেয়ে পিছিয়ে ছিল না, কিন্তু সেখানে যাঁরা বলি হয়েছিলেন তাঁরা অখ্যাত লোক ছিলেন বলে ধর্মের জন্য ঐ দেশের অতিমাত্রিক উদ্দীপনার

কথা অসঙ্গতভাবে ভুলে যাওয়া হয়েছে। তথাপি একটা বিশেষ দুর্ঘটনা না ঘটলে দেশটি এমন একজন বিরুদ্ধধর্মীকে বধ করার গৌরবে নিজেকে মণ্ডিত করতে পারতো যিনি জিঅরদানো ব্রুনোর চেয়ে কম খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন না। কবি মার্লো [১৫৬৪–১৫৯৩] নাস্তিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর বিচার চলতে থাকাকালে এক শুঁড়িখানায় একটা নোংরা কলহে তিনি নিহত হন (১৫৯৩)। আরেকজন নাট্যকার (টমাস কিড [১৫৫৮–১৫৯৪])–কে একই অভিযোগে জড়িয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য নিদারুণ যন্ত্রণা দেয়া হয়েছিল। একই সময়ে ধর্মে আস্থাহীনতার অভিযোগে স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে [আ. ১৫৫৪–১৬১৮]–এর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল কিন্তু তিনি দোষী সাব্যস্ত হননি। অন্যেরা এতো সৌভাগ্যবান ছিলেন না। এলিজাবেথের রাজত্বকালে অখ্রিস্টীয় মতামতের জন্য নরউইচে তিন বা চারজনকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ফ্রান্সিস কেট যিনি কেম্ব্রিজে করপাস ক্রিস্টির ফেলো ছিলেন।

প্রথম জেম্‌স এসব ব্যাপারে স্বয়ং ব্যক্তিগতভাবে উৎসাহী ছিলেন। তাঁর সময়ে কতিপয় মারাত্মক মত পোষণের জন্য বার্থোলোমিউ লিগেট [আ. ১৫৭৫–১৬১১]–কে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। রাজা তাঁকে নিজের সামনে ডাকিয়ে এনে জিজ্ঞেস করলেন তিনি প্রতিদিন যিশু খ্রিস্টের কাছে প্রার্থনা করেন না একথা সত্য কিনা। লিগেট জবাব দিলেন, যখন তিনি অজ্ঞ ছিলেন তখন খ্রিস্টের কাছে প্রার্থনা করতেন, কিন্তু গত সাত বছর যাবৎ করেননি। "দূর হও, নরাধম", জেম্‌স তাঁকে পদাঘাত করে বললেন, "এ কথা কখনো মুখে আনা যাবে না যে, আমার প্রাসাদে এমন এক ব্যক্তি থাকে যে এক নাগাড়ে সাত বছর ধরে কখনো আমাদের ত্রাণকর্তার কাছে প্রার্থনা করেনি"। লিগেটকে কিছুদিন নিউগেটে কারারুদ্ধ রেখে ঘোষণা করা হলো যে তিনি এমন একজন বিরুদ্ধধর্মী যিনি সংশোধনের অতীত। তারপর তাঁকে স্মিথফিল্ডে পুড়িয়ে মারা হলো (১৬১১)। মাত্র এক মাস পরে জনৈক ওআইট্‌ম্যানকে ধর্মবিরোধী মতামতের জন্য কভেন্ট্রির বিশপ লিচ্‌ফিল্ডে পুড়িয়ে মারেন। সম্ভবত এই দুটো পুড়িয়ে মারার ঘটনা জনচিত্তে আঘাত করেছিল। এ দুটোই ছিল ইংল্যান্ডে ধর্মে অনাস্থার কারণে মৃত্যুদণ্ডের সর্বশেষ ঘটনা। অবশ্য অসহিষ্ণু পিউরিট্যানরা ১৬৪৮ সালে এক অধ্যাদেশ জারি করেছিল যার বলে যারা ত্রিত্ববাদ, যিশু খ্রিস্টের দেবত্ব, বাইবেলের প্রত্যাদিষ্টতা, কিংবা মৃত্যুর পরবর্তী অস্তিত্বকে অস্বীকার করবে তারা সকলে মৃত্যুদণ্ডের এবং অন্যান্য ধরনের ধর্মবিরোধিতার জন্য অপরাধী লোকেরা কারাদণ্ডের যোগ্য বলে নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু এর ফলে কারো প্রাণদণ্ড হয়নি।

রেনেসাঁসের যুগেই আধুনিক বিজ্ঞানের আবির্ভাবের চিহ্নসমূহ দেখা গিয়েছিল ; কিন্তু প্রাকৃতিক জগৎ নিয়ে অনুসন্ধানের বিরুদ্ধে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার সতোরো শতক পর্যন্ত, এবং ইতালিতে আরো অনেক পরবর্তীকাল পর্যন্ত দূর হয়নি। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাস শুরু হয় ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে, পৃথিবীর গতি সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য উদঘাটন করে লেখা কোপার্নিকাসের বইটি [De revolutionibus orbium] প্রকাশের সাথে সাথে। স্বাধীন চিন্তার ইতিহাসে এই বইটির প্রকাশনা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই ঘটনা বিজ্ঞান ও বাইবেলের মধ্যে বিতর্কের একটা স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বিষয় উত্থাপন করেছিল, এবং বইটির সম্পাদনা যিনি করেছিলেন (কোপার্নিকাস তখন মৃত্যুশয্যায়) সেই ওসিআন্ডার [১৪৯৮–১৫৫২] এটি প্রকাশিত হলে কি ধরনের হৈ চৈ পড়ে যাবে তা অনুমান করতে পেরে মুখবন্ধে মিথ্যে করে

লিখেছিলেন যে, পৃথিবীর গতির কথাটা একটা হাইপোথিসিস বা পূর্বকল্প হিসেবে পেশ করা হয়েছে। ক্যাথলিক ও রিফর্মার উভয়েই তত্ত্বটির নিন্দা করে এবং এটি ধর্মীয় কুসংস্কার দ্বারা প্রভাবিত নন এমন কিছু লোকেরও (যেমন, ফ্রান্সিস বেকন [১৫৬১–১৬২৬]) প্রত্যয় উৎপাদন করতে পারেনি।

ইতালীয় জ্যোতির্বিদ গালিলিও দ্য গালিলি [১৫৬৪–১৬৪২]–র পর্যবেক্ষণ কোপার্নিকাসের তত্ত্বটিকে প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণ করে দেয়। দূরবীণের সাহায্যে তিনি বৃহস্পতির উপগ্রহগুলি আবিষ্কার করেন এবং সূর্যের কলঙ্কগুলি সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ পৃথিবীর আবর্তনতত্ত্বের সমর্থন করে। গালিলিও ফ্লোরেন্সে সেখানকার গ্রাণ্ড ডিউকের রক্ষণাবেক্ষণে বাস করছিলেন। ঐ শহরের যাজকীয় প্রচারমঞ্চগুলিতে তাঁর রোমাঞ্চকর আবিষ্কারসমূহ নিন্দিত হয়। "হে গালিলির মানবকুল, কেন তোমরা আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছো?" তারপর দুজন ডোমিনিক্যান সন্ন্যাসী ইন্‌কুইজিশনের 'পবিত্র দফতরে' তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। রোমে তাঁর গবেষণা নিয়ে বিচার–বিবেচনা হচ্ছে জানতে পেরে গালিলিও সেখানে যান। তাঁর বিশ্বাস ছিল কোপার্নিকাস তত্ত্বের সুস্পষ্ট সত্যতা সম্পর্কে তিনি যাজকীয় কর্তৃপক্ষের প্রত্যয় উৎপাদন করতে সক্ষম হবেন। তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি যে, ধর্মবিদ্যা কি করতে পারঙ্গম। ১৬১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'পবিত্র দফতর' সিদ্ধান্ত নিলো যে কোপার্নিকাসের সৌরতন্ত্র একটা অসম্ভব বস্তু এবং বাইবেলের সাথে তুলনায় তা বিরুদ্ধধর্মমূলক। পোপ [পঞ্চম পল ১৬০৫–১৬২১]–এর নির্দেশে কার্ডিনাল বেলার্মিন [১৫৪২–১৬২১] গালিলিওকে ডাকিয়ে এনে আনুষ্ঠানিকভাবে ভর্ৎসনা করে বললেন তিনি যেন তাঁর মত ত্যাগ করেন এবং তা অন্যকে শেখানো থেকে বিরত থাকেন, অন্যথায় ইন্‌কুইজিশন তাঁর বিরুদ্ধে মামলা শুরু করবে। গালিলিও কথা দিলেন যে তিনি এ নির্দেশ মেনে চলবেন। কোপার্নিকাসের গ্রন্থ নিষিদ্ধ তালিকাভুক্ত হলো। মন্তব্য করা হয়েছে যে, *সোলার স্পট্‌স* [সৌর কলঙ্ক] নিয়ে লেখা গালিলিওর বই–এ বাইবেলের কোনো উল্লেখ নেই ; আর তাই বলা যায় যে 'পবিত্র দফতর' উক্ত রায়ে (যার সাথে এ বইটির সম্পর্ক ছিল) ধর্মতত্ত্বীয় নয়, বরং একটি বৈজ্ঞানিক প্রশ্নে সিদ্ধান্ত দিয়েছিল।

গালিলিওকে কিছুদিনের জন্য নীরব রাখা গেলেও চিরকালের জন্য তাঁর পক্ষে বোবা হয়ে থাকা সম্ভব ছিল না। নতুন পোপ (অষ্টম আরব্যান [১৬২৩–১৬৪৪])–এর সময়ে তিনি অধিকতর উদারতার আশা করেছিলেন, এবং পোপের পরিমণ্ডলে অনেকে তার প্রতি অনুকূল ধারণা পোষণ করতেন। পুরোনো যুক্তিতর্ক এবং নতুন তত্ত্বসমূহ পাশাপাশি স্থাপন করা এবং ঐ দুই–এর মধ্যে কোনো বিচার না করার ভান করা—এই কৌশল অবলম্বন করে অসুবিধা এড়ানোর আশা করেছিলেন গালিলিও। তিনি (টলেমীয়[১৩] ও কোপার্নিকাস–প্রদত্ত) ঐ দুই তন্ত্রের উপর *ডায়ালগ্‌স* [কথোপকথন]–এর ভঙ্গিতে একখানা বই লিখলেন যার মুখবন্ধে ঘোষণা করা হলো যে ঐ দুই মতের পক্ষের ও বিপক্ষের যুক্তিসমূহ ব্যাখ্যা করাই ঐ রচনার উদ্দেশ্য। কিন্তু বইটির মূল ভাব ছিল কোপার্নিকাসপন্থী। যেমন তিনি নিশ্চিত ভেবেছিলেন তেমনটিই হলো—ফাদার রিচ্চার্ডি ('পবিত্র প্রাসাদ'–এর অধ্যক্ষ) পুস্তকখানি ছাপানোর অনুমতি দিলেন এবং তা প্রকাশিত হলো ১৬৩২ সালে। কিন্তু পোপ এটি অনুমোদন করলেন না, একটা কমিশন বইখানা পরীক্ষা করলো, এবং গালিলিওকে ইন্‌কুইজিশনের আদালতে তলব করা হলো। তিনি ছিলেন বৃদ্ধ ও অসুস্থ এবং তাঁকে যেসব অবমাননা সহ্য করতে

হয়েছিল তা এক বেদনাময় কাহিনী। তাঁর প্রতি ব্যবহার হয়তো আরো কঠোর হতো, যদি না ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের মধ্যে একজন (মাকোলানো, যিনি ছিলেন একজন ডোমিনিকান) বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোক হতেন, যিনি গালিলিওর সামর্থ্যের মূল্য বুঝতেন। জেরার মুখে গালিলিও অস্বীকার করলেন যে তিনি *ডায়ালগ্‌স* পুস্তকে পৃথিবীর গতির তত্ত্ব সমর্থন করেছিলেন, এবং দাবি করলেন যে কোপার্নিকাসের যুক্তিসমূহ কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয় এটাই তিনি দেখিয়েছিলেন। বইটির মুখবন্ধে দেওয়া বিবৃতি অনুসারেই দেওয়া হয়েছিল এই কৈফিয়ত, কিন্তু তা তাঁর গভীরতম প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। ঐ রকম একটা ট্রাইব্যুনালের সাথে লড়তে গিয়ে এটাই ছিল একমাত্র পথ যা একজন মানুষ, যিনি কোনো বীর ছিলেন না, অনুসরণ করতে পারতেন। ট্রাইব্যুনালের পরবর্তী এক অধিবেশনে কলঙ্কজনকভাবে গালিলিও স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, কোপার্নিকাসের পক্ষের কিছু কিছু যুক্তিকে তিনি অত্যন্ত জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছেন এবং ঘোষণা করলেন যে তিনি ঐ তত্ত্বটিকে ভুল প্রমাণ করতে প্রস্তুত আছেন। চূড়ান্ত পর্যায়ের জেরার সময় তাঁকে নিদারুণ যন্ত্রণা দেয়ার ভয় দেখানো হলো। তিনি বললেন যে ১৬১৬ সালের অনুশাসনের আগে তিনি কোপার্নিকাসের মতবাদকে যুক্তিসহ বলে মনে করতেন, কিন্তু তার পর থেকে তিনি টলেমীয় মতকেই সত্য বলে মনে করে আসছেন। পরদিন তিনি যে বৈজ্ঞানিক সত্যের যাথার্থ্য একদা প্রদর্শন করেছিলেন, তা প্রকাশ্যে শপথপূর্বক পরিত্যাগ করলেন। তাঁকে তাঁর দেশে ফিরে যেতে দেয়া হলো এই শর্তে যে তিনি কারো সাথে দেখা করবেন না। জীবনের শেষ মাসগুলোতে গালিলিও তাঁর এক বন্ধুকে যা লিখেছিলেন তার সারমর্ম এই :

> কোপার্নিকাস–তত্ত্ব যে মিথ্যা তাতে সন্দেহ করা চলে না, বিশেষত আমরা ক্যাথলিকরা তা করতে পারি না। বাইবেলের অলঙ্ঘনীয় কর্তৃত্ব তাকে খণ্ডন করেছে। কোপার্নিকাস ও তাঁর শিষ্যদের অনুমানসমূহের সবগুলিই প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেছে একটি মাত্র নিরেট যুক্তি দ্বারা : ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা অসংখ্য বিভিন্ন পথে কাজ করতে পারে। আমাদের নজরে যদি কোনো কিছুকে এক বিশেষ ভঙ্গিতে সংঘটিত হতে দেখা যায়, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের হাতকে খাটো করবো না, এবং এমন কিছুকে সমর্থন করবো না যাতে আমরা প্রতারিত হতে পারি।

শ্লেষটি স্পষ্ট প্রতীয়মান।

আঠারো শতকের মাঝামাঝির পর পর্যন্ত রোম সৌরজগৎ সংক্রান্ত প্রকৃত সত্য শিক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেয়নি, এবং গালিলিওর বইগুলি ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত 'ইনডেক্স' বা নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকায় ছিল। ইতালিতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অধ্যয়নে এই নিষেধাজ্ঞার ফল মারাত্মক হয়েছিল।

রোমান গির্জার তৈরি নিষিদ্ধ বই–এর তালিকা আমাদেরকে চিন্তার স্বাধীনতার সংগ্রামে মুদ্রণযন্ত্র উদ্ভাবনের[১৪] তাৎপর্য স্মরণ করিয়ে দেয়। ঐ যন্ত্র নতুন ধ্যান–ধারণাকে দূরদূরান্তে ছড়িয়ে দেয়ার কাজটা সহজ করে দিয়েছিল। কর্তৃপক্ষ দ্রুত বিপদ উপলব্ধি করলেন এবং যুক্তির শক্তিশালী মিত্র হিসেবে আবির্ভূত হওয়ায় সম্ভাবনাময় নতুন যন্ত্রটির উপরে গির্জার জোয়াল চাপানোর ব্যবস্থা নিলেন। পোপ ষষ্ঠ আলেকজাণ্ডার অননুমোদিত মুদ্রণের বিরুদ্ধে এক অধ্যাদেশ (Bull)–এর মাধ্যমে মুদ্রণযন্ত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের সূত্রপাত করলেন

(১৫০১)। ফ্রান্সে রাজা দ্বিতীয় হেনরি [রাজ. ১৫৪৭–১৫৫৯] সরকারি অনুমতি ছাড়া কোনো কিছু ছাপানো মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করলেন। জার্মানিতে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় ১৫২৯ সালে। [প্রথম] এলিজাবেথের শাসনকালে লাইসেন্স ছাড়া ইংল্যান্ডে বই ছাপানো যেত না এবং লন্ডন, অক্সফোর্ড, ও কেমব্রিজ ছাড়া আর কোথাও ছাপাখানা স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়নি। মুদ্রণযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ ছিল 'স্টার চেম্বার' [তারকা গৃহ] নামক রাজকীয় স্বার্থরক্ষাকারী বিচারসভার এখ্তিয়ারে। উনিশ শতকের আগে কোথাও মুদ্রণযন্ত্রের প্রকৃত স্বাধীনতা আসেনি।

যদিও রিফর্মেশন এবং পুনরুজ্জীবিত রোমান গির্জার অর্থ ছিল রেনেসাঁসের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া, কিন্তু রেনেসাঁস অতীব গুরুত্বপূর্ণ যেসব পরিবর্তনের সূচনা করেছিল—ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, জগতের প্রতি একটা নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানের চর্চা—সেগুলো স্থায়ী হয়েছিল। ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট শক্তিসমূহ পাল্লা দিয়ে যেসব অসহিষ্ণু আচরণ করছিল, তার মধ্য দিয়েই স্বাধীনতার লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য রেনেসাঁসজাত ঐ পরিবর্তনগুলো নির্ধারিত সহায়ক হিসেবে কাজ করেছিল। আমরা দেখবো কিভাবে যুক্তি এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বের ভিত্তি দুর্বল করে দিয়েছিল। দার্শনিক অনুমান, ঐতিহাসিক সমালোচনা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সব কিছুই এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিল এবং এর প্রতিটি ধাপে যুক্তি ও বিশ্বাসের মধ্যকার বিরোধিতা গভীর হচ্ছিল ; স্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট সন্দেহ বাড়ছিল ; এবং [ইতালীয় রেনেসাঁসের] মানববাদীদের কাছ থেকে আহৃত জাগতিকতা, যার ভেতর সর্বদা নিহিত ছিল প্রচ্ছন্ন কিংবা সচেতন সন্দেহবাদ, তা মৃত্যুর পরবর্তী জগতের প্রতি কৌতূহলের পরিবর্তে পৃথিবীপৃষ্ঠে মানব জাতির ভাগ্য বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। আর এই অবিচলিত বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রযাত্রার পাশাপাশি সহনশীলতাও এগিয়ে যায় এবং [চিন্তার] স্বাধীনতার পক্ষে আরো সমর্থক মেলে। ইতোমধ্যে রাজনৈতিক বাতাবরণের চাপ সরকারগুলোকে একটিমাত্র ধর্মবিশ্বাস প্রতিপালন করার নীতির তীব্রতা হ্রাস করে অন্যান্য খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের অসুবিধা কমিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য করছিল ; এবং জাগতিক সুবিধার কারণে ভেঙে পড়েছিল [ধর্মের] খাপ–না–খাওয়ানোর নীতি। ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল মতপোষণের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার অভিমুখে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

তথ্যনির্দেশ

১. **সেন্ট বার্থেলেমিউজ ডে (St. Bartholomew's Day) (২৪ অগাস্ট ১৫৭২) :** ফ্রান্সের স্বৈরাচারী রানীমাতা ক্যাথরিন দ্য মেদিচি (Catherine de' Medici) (১৫১৯–১৫৮৯)-র প্ররোচনায় তাঁর পুত্র রাজা নবম চার্লস (রাজ. ১৫৬০–৭৪) প্রটেস্ট্যান্ট মতাবলম্বী 'হুগেনো' খ্রিস্টানদের গণহত্যার আদেশ দেন। এ ছিল ক্যাথরিনের একটি জঘন্য রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন। ২৪ অগাস্ট ভোর হওয়ার আগেই প্যারিসে বহুসংখ্যক হুগেনোকে যথেচ্ছ হত্যা করা হয়। এরপর পাঁচ সপ্তাহ জুড়ে গোটা ফ্রান্স ধরে হাজার হাজার হুগেনো নিহত হয়। তাদের বাড়িঘর ও দোকানপাট লুঠ করা হয়।

২. **জেসুইট (Jesuits) :** প্রটেস্ট্যান্ট রিফর্মেশনের প্রতিক্রিয়ায় রোমান ক্যাথলিক শিবিরে যে Counter-Reformation বা 'প্রতিসংস্কার' আন্দোলন হয়েছিল তারই জেরে ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট ইগ্নাশিয়াস অফ লয়োলা (St. Ignatius of Loyola) (১৪৯১–১৫৫৬) 'সোসাইটি অব যিযস' (Society of Jesus) ['যিশুর সমাজ'] নামে রোমান ক্যাথলিক যাজকদের এক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এর সদস্যরা পরে 'জেসুইট' নামে পরিচিত হয়েছিলেন। এঁদের কাজ ছিল রোমান ক্যাথলিক গির্জার বিশুদ্ধিকরণ।

এই কাজ করতে গিয়ে তাঁরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রটেস্ট্যান্ট বিরোধী ধর্মান্ধতা এবং নানা নিষ্ঠুর তৎপরতা প্রদর্শন করেছিলেন।

৩. **ডিইস্ট (Deist) বা ঈশ্বরবাদী :** আনুষ্ঠানিক ধর্মের বিকল্প হিসাবে মুক্তচিন্তাবিদদের মাঝে ডিইজম (Deism) বা ঈশ্বরবাদের উদ্ভব হয়েছিল মূলত সতেরো শতকের ইংল্যান্ডে। পরে তা ফ্রান্সে বিস্তার লাভ করে। ঐ শতকের অনেক ইংরেজ লেখক এবং আঠারো শতকের ফরাসি 'ফিলোসোফাদের (Philosphes)' অনেকে ডিইস্ট ছিলেন। ডিইজমে বিশ্বস্রষ্টা ও বৈশ্বিক নিয়ম-প্রণেতা হিসেবে একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, কিন্তু তাঁর কাছে প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকৃত। কারণ, ঈশ্বরের নিয়মাবলী সম্পূর্ণ ও অমোঘ। এখানে বিউরি মতেইনকে একজন অগ্রিম ঈশ্বরবাদী হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন বলে মনে হয়।

৪. **অ্যানাব্যাপ্‌টিস্ট (Anabaptists) :** প্রটেস্ট্যান্ট রিফর্মেশন থেকে উদ্ভূত আমূল সংস্কারবাদী খ্রিস্টীয় ধর্মমত বিশেষের অনুসারিদল। ষোড়শ শতকেই প্রথম দিকে সুইজারল্যান্ডে জুরিখ ও জার্মানির কিছু এলাকায় শুরু হয়ে অ্যানাব্যাপ্‌টিস্ট আন্দোলন ঐ শতকেই জার্মানিতে শক্তিশালী হয়। ক্রমে তা পূর্ব ইউরোপের কোনো কোনো অংশে এবং ইতালি ও ইংল্যান্ডে প্রসার লাভ করে।

৫. **লুথ্‌রান কনফেশন অব অগ্‌স্‌বুর্গ (Lutheran Confession of Augsburg) :** ১৫৩০ সালের ২৫ জুন জার্মানির অগ্‌স্‌বুর্গে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় সম্মেলনে (Diet) সাত জন লুথারপন্থী রাজা ও দুটি স্বাধীন নগরী (Free Cities) 'পবিত্র রোমান সম্রাট' পঞ্চম চার্লস (রাজ. ১৫১৯-১৫৫৬)-এর কাছে লুথ্‌রান রিফর্মেশনের মূল ধর্মমত (Creed) পেশ করেন। ২৮টি ধারা সম্বলিত এই দলিল লুথারপন্থীদের নিকট প্রামাণ্য সংহিতা বলে বিবেচিত।

৬. **থার্টি-নাইট আর্টিকল্‌স অফ রিলিজিয়ন (Thirtynine Articles of Religion) বা ধর্মীয় 'উনচল্লিশ ধারা' :** বুক অফ কমন প্রেয়ার *(Book of Common Prayer)* বা 'সাধারণ প্রার্থনা পুস্তক-এর সাথে সাধারণত পরিশিষ্ট হিসেবে সংযোজিত উনচল্লিশটি ধারা উক্ত পুস্তকসহ একত্রে 'চার্চ অব ইংল্যান্ড'-এর ধর্মমত সংক্রান্ত বিধিমালার (doctrinal formularies) আধার। ১৫৩৮ থেকে ১৫৭১ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে বিরচিত এই ধারাগুলির অধিকাংশই অগ্‌স্‌বুর্গ (১৫৩০) ও ভুরটেমবার্গে (Wiirttemberg) (১৫৫১-৫২) অনুষ্ঠিত লুথ্‌রান কনফেশন দুটি থেকে আহৃত।

৭. তবে জার্মানিতেই বিপদটা উপলব্ধি করা গিয়েছিল এবং সতেরো শতকে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাইবেল অধ্যয়ন উৎসাহিত করা হতো না।

৮. দ্র. উইলিয়াম ব্যারি, *পাপাসি অ্যান্ড টাইমস (১৩০৩—১৮৭০)* [পোপতন্ত্র ও আধুনিক কাল (১৩০৩-১৮৭০) বর্তমান গ্রন্থমালার অন্তর্গত), পৃ. ১১৩

৯. **রোমান ইনক্যুইজিশনের প্রতিষ্ঠা (Establishment of Inquisition at Rome 1542) :** বিরুদ্ধধর্ম (heresy), ডাকিনীবিদ্যা (witchraft), শয়তান-আরাধনা (Devil worship) ইত্যাকার গুরুতর ধর্মীয় 'অপরাধ' দমনের লক্ষ্যে নির্মিত পোপের বিশেষ বিচার সভার নাম 'ইনকুইজিশন'। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের প্রথম দিকে এর বিরাট প্রতিপত্তি ছিল। দ্বাদশ শতকের শেষ দিকে পোপ তৃতীয় লুসিয়াস (Lucicus III. ১১৮১-১১৮৫) ইন্‌ক্যুইজিশনকে পুনর্গঠিত করে নতুন উদ্যমে তৎপরতা শুরু করেন। পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট (১১৯৮-১২১৬) এবং নবম গ্রেগোরি (১২২৭-১২৪১) আরো উৎসাহিত করেন। ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে প্রটেস্ট্যান্ট মতবাদের উত্থান ঘটলে তা দমনের উদ্দেশ্যে পোপ তৃতীয় পল (১৫৩৪-১৫৪৯) ১৫৪২ সালে রোমে ইনক্যুইজিশন প্রতিষ্ঠা করেন। চতুর্থ পল (১৫৫৫-৫৯) ও পঞ্চম পায়াস (১৫৬৬-৭২) প্রমুখ পোপের অধীনে রোমান ইন্‌ক্যুইশিনের চূড়ান্ত অপব্যবহার হয়। জিয়রদানো ব্রুনো (১৫৪৮-১৬০০) এবং গালিলিও গালিলি (১৫৬৪-১৬৪২) তার দুই প্রখ্যাত শিকার। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে পোপ দশম পায়াস (১৯০৩-১৯১৪) রোমান ইনক্যুইজিশন বাতিল করেন।

১০. **ট্রেন্টের কাউন্সিল (Council of Trent. ১৫৪৫-১৫৬৩) :** প্রটেস্ট্যান্ট রিফর্মেশনের ফলে সৃষ্ট ধর্মীয় বিভেদ জার্মানিতে গভীর রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করলে পবিত্র রোমান সম্রাট পঞ্চম চার্লস

(১৫১৯–১৫৫৬) চাইলেন জার্মানর মাটিতে একটি ধর্মীয় কাউন্সিল বসিয়ে লুথারপন্থী শাসকদের সাথে রোমান ক্যাথলিক গির্জার একটি সমঝোতা তৈরি করে জার্মানিতে ধর্মীয় ঐক্য ফিরিয়ে আনতে। স্প্যানিশ ও ফরাসি যাজকেরা তাঁর পক্ষে থাকলেও পোপ তৃতীয় পল (১৫৩৪–৪৯) কোনো প্রকার ছাড় দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। যা হোক শেষ পর্যন্ত জার্মান ভূখণ্ডের ট্রেন্ট শহরে কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হলো এবং দীর্ঘ তর্কবিতর্কের পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে মূলত পোপের অবস্থানই টিকে থাকলো, রোমান গির্জার অধিকার প্রায় পুরোই অটুট রইলো। প্রটেস্ট্যান্টদের ও সংস্কারপন্থী ক্যাথলিকদের প্রস্তাবগুলো সামান্যই গৃহীত হলো।

১১. **ইন্‌ডেক্স অব ফর্‌বিড্‌ন বুক্‌স (Index of Forbidden Books. নিষিদ্ধ পুস্তকসমূহের তালিকা)** : প্রটেস্ট্যান্ট রিফর্মেশন তথা মুক্তচিন্তার বিরুদ্ধে অন্যমত পদক্ষেপ হিসেবে রোমান যাজকীয় কর্তৃপক্ষ এই তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। বহুসংখ্যক পুস্তক রোমান ক্যাথলিকদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। সেগুলোর একটি তালিকা ১৫৫৯ সালে প্রকাশ করে 'স্যাক্রেড কংগ্রিগেশন অব দা রোমান ইন্‌ক্যুইজিশন' [রোমান ইন্‌ক্যুইজিশনের পবিত্র সমাবেশ]। এটিই ইন্‌ডেক্সের প্রথম সংস্করণ। তখন থেকে ১৫৯ সাল পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান এ তালিকার আরো অনেকগুলি সংস্করণ বেরিয়েছিল। অবশেষে পোপ ষষ্ঠ পল (১৯৬৩–১৯৭৮) ১৯৬৬ সালে ইন্‌ডেক্সের প্রকাশনা বন্ধ করে দেন।

১২. **কার্ডিনাল রিশল্যু (ক্ষমতায় ১৬২৪–১৬৪২) ও কার্ডিনাল মাজারিন (ক্ষমতায় ১৬৪৩–১৬৬১)**: ফরাসি ইতিহাসের দুই অতি বিশিষ্ট রাষ্ট্রনায়ক। রাজা ত্রয়োদশ লুই (রাজ. ১৬১০–৪৩) উদ্যমবিহীন এবং চতুর্দশ লুই (রাজ. ১৬৪৩–১৭১৫) নাবালক থাকার সুবাদে ঐ দুই রাজনীতিক টানা প্রায় সাড়ে তিন দশক ধরে প্রধান মন্ত্রী হিসেবে বিচক্ষণতার সাথে রাষ্ট্রপরিচালনা করে ফ্রান্সকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী দেশ হিসেবে গড়ে তোলেন।

১৩. **টলেমীয় তন্ত্র (The Ptolemaic System)** : কোপার্নিকাসের পূর্বে ইউরোপে প্রচলিত সূর্য–চন্দ্র–গ্রহগণের গতি সংক্রান্ত তত্ত্ব। প্রাচীন মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর বাসিন্দা জ্যোতির্বিদ, ভূগোলবেত্তা ও গণিতজ্ঞ টলেমি আনুমানিক ১৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তাঁর *আল্‌মাজেস্ট [Almagest]* গ্রন্থে এই ভূ–কেন্দ্রিক তন্ত্র উপস্থাপন করেছিলেন। এতে বলা হয়েছিল যে পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের স্থির কেন্দ্র, এবং সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহবর্গ পৃথিবীর চার দিকে ঘুরছে। প্রাচীন গ্রীকদের গ্রহগতি সংক্রান্ত সেরা তত্ত্বগুলি সমন্বিত করে টলেমি এই তন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন। দীর্ঘ ১৩০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে টলেমির তন্ত্রই পাশ্চাত্যে একমাত্র প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত ছিল।

১৪. **মুদ্রণযন্ত্র উদ্ভাবন (Invention of Printing Press)** : এটি পনেরো শতকের প্রথমার্ধে সম্পন্ন হয়েছিল। জোহান গুটেমবার্গ (Johan Gutemberg ১৩৯৮–১৪৬৮) ১৪৩৯ সালে ইউরোপে প্রথম মুদ্রণযন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন বলে জানা যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ভারতীয় সম্রাট অশোক [২৭২–২৩২ খ্রি. পূ.], যিনি ধর্মোৎসাহী হলেও সহনশীল স্বভাবের মানুষ ছিলেন, তিনি দুই পরস্পর বৈরী ধর্মের (ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম) মুখোমুখি হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তাঁর সাম্রাজ্যে উভয়কেই সমান সুযোগ–সুবিধা ও সম্মান দেয়া উচিত। এ বিষয়ে তাঁর অধ্যাদেশগুলি সহনশীলতার বিদ্যমান অনুশাসনসমূহের (Edicts) মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন বলে স্মরণীয়। আমরা আগে যেমনটা দেখেছি, খ্রিস্টানদের উপর উৎপীড়ন বন্ধের আদেশ দিয়ে রোমান সম্রাটরা যেসব অনুশাসন জারি করেছিলেন সেগুলিতেই ইউরোপে সর্বপ্রথম সহনশীলতার নীতির সুনির্দিষ্ট প্রকাশ ঘটেছিল।

ষোলো শতকের ধর্মীয় বিসম্বাদ প্রশ্নটিকে আধুনিক রূপে পুনরায় উত্থাপন করে, এবং অনেক প্রজন্ম ধরে এটি রাষ্ট্রনায়কদের একটি প্রধান সমস্যা তথা অসংখ্য বিতর্ক–পুস্তিকার বিষয়বস্তু হয়ে ছিল। সহনশীলতার অর্থ অসম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা, এবং এর বিবিধ মাত্রা আছে। এটি বিশেষ বিশেষ খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে দেওয়া যেতে পারে ; এটি দেওয়া যেতে পারে সকল খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে, কিন্তু শুধু তাদেরকেই ; এটি সকল ধর্মকে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু মুক্তচিন্তা চর্চাকারীদেরকে নয় ; অথবা দেওয়া যেতে পারে ঈশবাদীদেরকে, কিন্তু নিরীশ্বরবাদীদেরকে নয়। এর অর্থ হতে পারে কতিপয় নাগরিক অধিকার দান, কিন্তু সবগুলি নয় ; এর অর্থ হতে পারে যাদেরকে সহ্য করা হলো তাদেরকে সরকারি চাকরি থেকে কিংবা বিশেষ পেশা থেকে বাদ রাখা। এখন পশ্চিমের দেশগুলিতে মানুষ যে ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করছে তা লাভ করতে সহনশীলতার বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে আসতে হয়েছে।

ইতালির একদল সংস্কারক যাঁরা (ঈশ্বরের) ত্রিত্ব অস্বীকার করে একত্ববাদের (Unitarianism) জন্ম দিয়েছিলেন, তাঁদের কাছেই আমরা সহনশীলতার আধুনিক তত্ত্বের জন্য ঋণী। রিফর্মেশন [ধর্মসংস্কার] আন্দোলন ইতালিতেও বিস্তার লাভ করেছিল, কিন্তু রোমের ধর্মাধিষ্ঠান সে আন্দোলনকে দমন করতে সক্ষম হয়েছিল, ফলে অনেক বিরুদ্ধধর্মী সুইজারল্যান্ডে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ক্যালভিনের অসহিষ্ণুতার ফলে ত্রিত্ববিরোধী দলটি ট্রানসিল্‌ভ্যানিয়া ও পোল্যান্ডে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল এবং সেখানে তারা তাদের ধর্মমত প্রচার করেছিল। একত্ববাদী মতের নির্দিষ্ট আকার দান করেছিলেন ফাউস্তো সোৎসিনি [Fausto Sozzini ১৫৩৯–১৬০৪]। তিনি সাধারণত সোশিনাস নামে পরিচিত, এবং তাঁর সম্প্রদায়ের শিক্ষাবিধিতে [Catechism] (১৫৭৪) উৎপীড়নকে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। ধর্মের স্বার্থে শক্তির ব্যবহারের এই অস্বীকৃতি সোশিনীয় মতবাদেরই একটি ফল। সোশিনীয়রা লুথার ও ক্যালভিনের মতো ছিলেন না ; ধর্মগ্রন্থ ব্যাখ্যার ব্যাপারে তাঁরা ব্যক্তিকে এতো প্রশস্ত সুযোগ দিয়েছিলেন যে, কারো উপর সোশিনীয় মতবাদ চাপিয়ে দেয়া এর নীতির সাথেই অসঙ্গতিপূর্ণ হতো। অন্য কথায়, [সোশিনীয় মতবাদে] ছিল একটি জোরালো যুক্তিবাদী উপাদান যা ত্রিত্ববাদী ধর্মমতসমূহে অনুপস্থিত।

সোশিনীয় চেতনার প্রভাবেই স্যাভয়ের ক্যাস্টেলিয়ন [Castellion of Savoy) সহনশীলতার তূর্যধ্বনি তুলেছিলেন একখানি পুস্তিকায় সেরভেতূস [১৫১১–১৫৫৩]–কে পুড়িয়ে মারার কঠোর নিন্দা করে, যার ফলে তিনি ক্যালভিনের তীব্র ঘৃণার পাত্র হয়েছিলেন। মানুষের ভুলভ্রান্তিকে তিনি অপাপজনক বলেই মনে করতেন এবং পূর্বনির্ধারিত নিয়তি [Predestination] ও ত্রিত্বের মতো ধোঁয়াটে প্রশ্নগুলির উপরে গির্জা যে গুরুত্ব আরোপ করতো তাকে উপহাস করেছিলেন। "বিধিবিধান ও খ্রিস্টের উপদেশের মধ্যে পার্থক্য, কৃপাবলে পাপমুক্তি কিংবা আরোপিত ন্যায্যতা নিয়ে আলোচনা করা এমন একটা কাজ যে, মনে হয় যেন রাজা ঘোড়ায় আসবেন, না রথে আসবেন কিংবা তিনি সাদা না লাল পোশাক পরেছেন তা কাউকে আলোচনা করতে হবে।"[১] উৎপীড়ন যদি ধর্মের প্রয়োজনীয় অঙ্গ হয়ে থাকে তাহলে ধর্ম এক অভিশাপ।

দীর্ঘকাল যাবৎ কেবলমাত্র সোশিনীয়রা, এবং যখন তাঁরা পোল্যান্ড থেকে বিতাড়িত হয়ে জার্মানি ও হল্যান্ডে প্রবেশ করে তখন যারা তাদের প্রভাবে এসেছিল, তারাই ছিল এমন সম্প্রদায় যারা সহনশীলতার পক্ষে কথা বলতো। তাদের কাছ থেকে অ্যানাবাপ্তিস্তরা এবং হল্যান্ডের পুনর্গঠিত গির্জা (Reformed Church of Hothead)-এর আরমিনীয় অংশ এটি গ্রহণ করেছিল। ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধ ও কমনওয়েলথের ইতিহাসে ('ইন্ডিপেন্ডেন্টস' নামে) যারা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, সেই ইংরেজ কংগ্রেগেশনালিস্টদের প্রতিষ্ঠাতা বিবেকের স্বাধীনতার নীতি হল্যান্ডেই শিখেছিলেন।[২]

সোশিনাস ভেবেছিলেন যে এ নীতি রাষ্ট্রীয় গির্জা বাতিল না করেই বাস্তবায়িত করা যাবে। তিনি কল্পনা করেছিলেন রাষ্ট্র ও প্রধান ধর্মাধিষ্ঠানের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সংযোগের এবং সেই সাথে অন্যান্য মতের প্রতি পরিপূর্ণ সহিষ্ণুতার। এই ব্যবস্থার (যাকে বলা হয়েছে *জুরিসকডিকুশনাল*) অধীনেই ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহে ধর্মীয় স্বাধীনতা বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু আরো একটি সরলতর পদ্ধতি রয়েছে, তা হচ্ছে রাষ্ট্র থেকে ধর্মাধিষ্ঠানকে *পৃথক করা* এবং সকল ধর্মকে একই সমতলে স্থাপনে করা। এই সমাধানটি অ্যানাবাপ্টিস্টরা হয়তো পছন্দ করতে পারতো। তারা রাষ্ট্রকে ঘৃণা করতো ; এবং তাদের কাছে ধর্মীয় স্বাধীনতার নীতির দাম ছিল না। তাদের আদর্শ ব্যবস্থা হতে পারতো একটি অ্যানাবাপ্টিস্ট ধর্মতন্ত্র ; রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে বিযুক্ত করা ছিল দ্বিতীয় উত্তম ব্যবস্থা।

ইউরোপে জনমত [রাষ্ট্র ও ধর্মাধিষ্ঠানের] পৃথকীকরণের জন্য [তখনও] পরিপক্ব হয়নি, কারণ সহনশীলতাকে অসৎ ঔদাসীন্য বলে মনে করার ব্যাপারে সবচেয়ে শক্তিধর ধর্মীয় সংস্থাগুলো ছিল একই রকম। কিন্তু সতেরো শতকে আটলান্টিকের ওপারে পৃথিবীর একটা ছোট্ট অংশে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। ইংল্যান্ডের গির্জা ও রাষ্ট্রের অসহিষ্ণুতা থেকে পালিয়ে গিয়ে যে পিউরিট্যানরা নিউ ইংল্যান্ডে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল তারা নিজেরাও ছিল সমান অসহনশীল—শুধু অ্যাংগ্লিক্যান ও ক্যাথলিকদের প্রতিই নয়, বরং ব্যাপ্টিস্ট ও কোওকারদের[৩] প্রতিও। তারা স্থাপন করেছিল ধর্মতান্ত্রিক সরকার এবং যারা তাদের সম্প্রদায়ের লোক ছিল না তাদের সকলকে সেসব সরকার থেকে বাইরে রেখেছিল। রাষ্ট্র থেকে গির্জাকে পৃথক করার ধারণাটি রজার উইলিয়াম্‌স [১৬০৩–১৬৮৩] আত্মস্থ করেছিলেন ডাচ আর্মিনীয়দের কাছ থেকে। এই বিরুদ্ধ মতের জন্য তিনি ম্যাসাচুসেট্‌স থেকে বিতাড়িত হন এবং তারপর তিনি পিউরিট্যান উপনিবেশীরা যাদেরকে নির্যাতন করতো তাদের আশ্রয়স্থল হিসেবে 'প্রভিডেন্স' নামে একটি উপনিবেশ স্থাপন করলেন। এখানে তিনি একটি

গণতান্ত্রিক সংবিধান কায়েম করলেন যাতে ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতা ছিল কেবলমাত্র অযাজকীয় ব্যাপারে এবং তাঁরা ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। অচিরেই রোড আইল্যান্ডে আরো শহরের প্রতিষ্ঠা হলো এবং দ্বিতীয় চার্লস [১৬৬০–১৬৮৫]–এর এক সনদে (১৬৬৩) সেখানকার সংবিধান অনুমোদন করা হলো। ঐ সংবিধানে যে–কোনো ধরনের খ্রিস্টধর্ম অনুসরণকারী সকল নাগরিকের পুরো রাজনৈতিক অধিকার ভোগ নিশ্চিত করা হয়েছিল। অখ্রিস্টানদেরকে সহ্য করা হতো, কিন্তু তাদেরকে খ্রিস্টানদের মতো রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয়নি। এই পর্যন্ত ঐ নতুন রাষ্ট্রও পরিপূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ থেকে নীচে অবস্থান করছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও শীঘ্রই ইহুদিদের যে পূর্ণ নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছিল, সেই সত্য দেখিয়ে দেয় সেখানকার বাতাবরণ কতটাই মুক্ত ছিল। রজার উইলিয়াম্‌সেরই প্রাপ্য প্রথম আধুনিক রাষ্ট্র স্থাপনের গৌরব, যে রাষ্ট্র বাস্তবিকই সহনশীল ছিল এবং যার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল ধর্মীয় ব্যাপারগুলোর নিয়ন্ত্রণ অযাজকীয় সরকারের হাত থেকে পুরোপুরি বের করে নেওয়ার নীতির উপর।

রোমান ক্যাথলিক উপনিবেশ ম্যারিল্যান্ডেও সহনশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তবে তা একটি ভিন্ন উপায়ে। লর্ড বাল্টিমোরের[৪] প্রভাবে ১৬৪৯ সালে একটি 'সহনশীলতা আইন' পাশ হয়। প্রথম অনুশাসন হিসেবে লক্ষণীয় ও একটি বৈধ সভায় ভোটের মাধ্যমে পাশকৃত, এই আইনে সকল খ্রিস্টানকে [ধর্ম পালনের] পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল। যিশু খ্রিস্টে বিশ্বাস স্থাপনকারী কোনো ব্যক্তিই তাঁর ধর্মের কারণে নিগৃহীত হতে পারবেন না। কিন্তু এই গণ্ডির বাইরের সকলের জন্য আইনটি ছিল দুর্বহ। যে কেউ ঈশ্বরনিন্দা করলে কিংবা ত্রীশ্বর বা ত্রীশ্বরের যেকোনো একজনকে আক্রমণ করলে তার জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিভীষিকা বিদ্যমান ছিল। ম্যারিল্যান্ডের সহনশীলতার ফলে ভার্জিনিয়া থেকে এতো বেশি প্রটেস্ট্যান্ট সেখানে এসে বসতি স্থাপন করলো যে প্রটেস্ট্যান্টরাই সংখ্যাগুরু হয়ে পড়লো। তারপর সেই তারা রাজনৈতিক প্রাধান্য অর্জন করলো অমনি একটা আইন পাশ করে (১৬৫৪) তারা পোপপন্থী ও প্রিলেটপন্থীদের সহনশীলতার আওতা থেকে বাদ দিলো। ১৬৬০ সালের পরে বাল্টিমোরদের শাসন পুনঃপ্রবর্তিত হয় এবং পুরোনো ধর্মীয় স্বাধীনতা আবার ফিরে আসে। কিন্তু তৃতীয় উইলিয়াম [১৬৮৮–১৭০২]–এর সিংহাসন লাভের সাথে সাথে প্রটেস্ট্যান্টরা পুনরায় ক্ষমতায় আসে এবং ম্যারিল্যান্ডে ক্যাথলিকরা যে সহনশীলতা প্রবর্তন করেছিল তার অবসান হয়।

লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে এই দুই ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা অসম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু রোড আইল্যান্ডে তা আরো বৃহত্তর এবং অনেক বেশি মৌলিক ছিল ; সেখানে স্বাধীনতার আদি উৎস ছিল সোশিনাসের নীতিমালা।[৫] যখন উপনিবেশগুলো ইংল্যান্ড থেকে স্বাধীন হলো তখন তারা কেন্দ্রে যে সংবিধান চালু করে তা ছিল সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি সদস্য অঙ্গরাজ্যকে শাসনব্যবস্থা থেকে ধর্মকে পৃথক করা বা না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার দেয়া হয়েছিল (১৭৮৯)। আজ যে আমেরিকার অঙ্গরাজ্যগুলোতে [রাষ্ট্র ও গির্জা] পৃথকীকরণ নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার প্রধান কারণ হয়তো এই ছিল যে অন্য কোনো ব্যবস্থায় বিভিন্ন সম্প্রদায়কে পারস্পরিক সহনশীলতার নীতি মেনে চলতে বাধ্য করা সরকারগুলোর পক্ষে শক্ত হতো। এখানে এ কথাটাও যোগ করা প্রয়োজন যে, ম্যারিল্যান্ডে ও অল্প কয়েকটি দক্ষিণী অঙ্গরাজ্যে নাস্তিকদের উপর এখনো [বিশ শতকের গোড়ায়] কতিপয় রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রয়েছে।

ইংল্যান্ডে রাষ্ট্র থেকে ধর্মাধিষ্ঠান পৃথকীকরণের পরীক্ষা চালানো হতো যদি 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট'–রা তাদের ইচ্ছেমতো কাজ করতো পারতো। ক্রমওয়েল [ক্ষমতাসীন ১৬৫৩–৫৮] এই নীতি বাতিল করে দেন। নতুন জাতীয় গির্জায় প্রেস্‌বাইটারিয়ান, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ও ব্যাপ্টিস্ট্‌রা সামিল ছিল, কিন্তু উপাসনার স্বাধীনতা রোমান ক্যাথলিক ও অ্যাংগ্লিক্যান ছাড়া অন্য সকল খ্রিস্টানকে দেওয়া হয়েছিল। যদি পার্লামেন্টের যথেষ্ট ক্ষমতা থাকতো, তাহলে এই সহনশীলতা নামমাত্রে পর্যবসিত হতো। প্রেস্‌বাইটারিয়ানরা সহনশীলতাকে শয়তানের কাজ বলে বিবেচনা করতো, এবং পারলে তারা ইন্ডিপেন্ডেন্টদেরকে নির্যাতন করতো। কিন্তু ক্রমওয়েলের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে এমন কি অ্যাংগ্লিকানরাও শান্তিতে বাস করতো এবং ইহুদিদেরকেও সহশীলতার আওতায় আনা হয়েছিল। এই সময় সাধারণ যুক্তির ভিত্তিতে সহনশীলতার পক্ষ সমর্থন করে নানা দিক থেকে কথা বলা হচ্ছিল।[৬] সহনশীলতার সবচেয়ে বিশিষ্ট প্রবক্তা ছিলেন কবি জন মিলটন [১৬০৮–৭৪] যিনি গির্জাকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করার পক্ষপাতী ছিলেন।

মিল্টনের *অ্যারিঅপ্যাজিটিকা : অ্যা স্পীচ ফর দ্য লিবার্টি অফ আনলাইসেন্সড্ প্রিন্টিং* [বিচারালয়ের কথা : অননুমোদিত মুদ্রণের স্বাধীনতার সপক্ষে একটি ভাষণ] (১৬৪৪) গ্রন্থে মুদ্রণের স্বাধীনতাকে বাকস্বাধীনতার সাথে সমর্থন করা হয়েছে এমন সব যুক্তি দিয়ে যেগুলি সাধারণভাবে চিন্তার স্বাধীনতার জন্যেও প্রযোজ্য। সেখানে দেখানো হয়েছে যে, প্রকাশনা নিয়ন্ত্রণ

> সকল জ্ঞানার্জনকে নিরুৎসাহিত ও সত্যকে নিরুদ্ধ করার কাজে সহায়ক হবে ; এবং তা হবে আমাদের জানা বিষয়ের সামর্থ্যকে অনুশীলন বন্ধের মাধ্যমে ভোঁতা করে দিয়ে, এবং শুধু তা–ই নয়, বরং ধর্মীয় ও অযাজকীয় উভয়বিধ প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে আরো যে আবিষ্কার হতে পারতো তাকে বাধাগ্রস্ত করে ও তার সম্ভাবনা ছেঁটে ফেলে দিয়ে।

কারণ, নতুন নতুন মত ধ্বনিত করেই জ্ঞানের অগ্রগতি সাধিত হয়, আর সত্য আবিষ্কৃত হয় মুক্ত আলোচনা দ্বারা। সত্যের স্রোতোধারা যদি নিরন্তর প্রগতির খাতে প্রবাহিত না হয়, তাহলে তা অসুস্থ হয়ে অনুগামিতা ও ঐতিহ্যবদ্ধতার কর্দমাক্ত পল্বলে পর্যবসিত হয়। যেসব বই অনুমোদন পায় সেগুলি, ফ্রান্সিস বেকন [১৫৬১–১৬২৬]–এর ভাষায়, সাধারণত "ঐ সময়ের বক্তব্যই বহন করে", এবং প্রগতির অনুকূলে কোনো অবদান রাখে না। যেসব দেশে প্রকাশনা নিয়ন্ত্রণ কঠোর তাদের দৃষ্টান্ত এমন আভাস দেয় না যে, নিয়ন্ত্রণ নৈতিকতার জন্য দরকারি : "ইতালি ও স্পেনের দিকে নজর দিন, দেখুন বইপুস্তকের উপর ইন্‌কুইজিশনের অত কড়াকড়ি আরোপ করা সত্ত্বেও ঐ দেশগুলি আগের চেয়ে এক রতি পরিমাণ উন্নততর, সততাসম্পন্ন, বিজ্ঞতর, বা বিশুদ্ধতর হয়েছে কিনা"। স্পেন অবশ্যই জবাব দিতে পারবে এই বলে : "যেটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা হচ্ছে এই যে, আমরা ধর্মে বেশি বেশি নিষ্ঠাবান।" কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় যে, মিল্টন নাগরিক স্বাধীনতার উপরে চিন্তার স্বাধীনতার স্থান দিয়েছেন : "অন্য সকল স্বাধীনতার উপরে আমাকে জানার, বলার, এবং আপন বিবেক অনুসারে তর্ক করার স্বাধীনতা দিন।"

রাজতন্ত্র ও অ্যাংগ্লিক্যান গির্জার পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর 'ডিসেন্টার'দের[৭] বিরুদ্ধে পরপর কতকগুলি আইন পাশ করে ধর্মীয় স্বাধীনতার বিলোপ ঘটানো হয়। পরিশেষে ১৬৮৯ সালে 'সহনশীলতার আইন' পাশের জন্য আমরা ['গৌরবময়'] বিপ্লব [১৬৮৮]–এর কাছে ঋণী।

বর্তমানে ইংল্যান্ড যে ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করছে তার উৎস ঐ আইনটি। ঐ আইন প্রেস্‌বাইটারিয়ান, কংগ্রিগেশনালিস্ট, ব্যাপ্টিস্ট, ও কোয়েকারদের উপাসনার স্বাধীনতা দিয়েছিল ; কিন্তু মাত্র ঐ সম্প্রদায়গুলিকেই। ক্যাথলিক ও ইউনিটারিয়ানদেরকে স্পষ্টভাবে বাদ দেয়া হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় চার্লসের সময়কার দমনমূলক আইন বলবৎ থাকে। বৈশিষ্ট্যগতভাবেই এটি ছিল খাঁটি ইংরেজ আইন, যৌক্তিক দিক থেকে অসঙ্গতিপূর্ণ ও উদ্ভট, সহনশীলতা ও অসহনশীলতার এক জগাখিচুড়ি, কিন্তু তখনকার পরিবেশ ও জনমতের পরিস্থিতির সাথে মানানসই।

ঐ একই বছরে জন লক [১৬৩২–১৭০৪]–এর বিখ্যাত (প্রথম) *লেটার কনসার্নিং টলারেশন* [সহনশীলতা সংক্রান্ত পত্র] ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশিত হয়। পরে আরো তিনখানি পত্রে তাঁর থিসিসটি গড়ে ওঠে এবং বিশদ হয়। যে মূল নীতির উপর ঐ থিসিসের প্রধান যুক্তি প্রতিষ্ঠিত তা হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্রীয় সরকারের কাজ ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং রাষ্ট্র হচ্ছে একটি সমিতি যা গঠন করা হয়েছে কেবলমাত্র তার সদস্যদের অযাজকীয় স্বার্থসমূহ সংরক্ষণ ও সেগুলির পুষ্টিসাধন করার জন্য—আর অযাজকীয় স্বার্থসমূহ বলতে জীবন, স্বাধীনতা, স্বাস্থ্য এবং সম্পত্তির অধিকার বোঝায়। আত্মার যত্ন নেয়ার দায়িত্ব ম্যাজিস্ট্রেটদের উপর ন্যস্ত নয়, যেমন তা নয় অন্য মানুষদের উপর। কারণ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কেবল বাহ্য শক্তিই প্রয়োগ করতে পারেন ; কিন্তু সত্যিকারের ধর্ম হচ্ছে চিত্তের অন্তর্মুখীন প্রত্যয়, এবং মানবচিত্ত এমনভাবে তৈরি যে জোর করে তাকে বিশ্বাস করানো যায় না। অনুরূপভাবে কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য আইন প্রণয়ন করা রাষ্ট্রের পক্ষে অসঙ্গত, কারণ শাস্তির ব্যবস্থা ছাড়া আইন অকার্যকর এবং শাস্তি এক্ষেত্রে অবান্তর, কারণ তা কারো প্রত্যয় উৎপাদন করতে সক্ষম নয়।

উপরন্তু, শাস্তি যদি মানুষের বিশ্বাস পরিবর্তন করতে পারতোও, তাতে আত্মার মুক্তির আনুকূল্য কিছু হতো না। যদি সব মানুষই তাদের শাসকদের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে রাষ্ট্রের ধর্মকেই নিজের বলে মেনে নিতো, তাহলে কি অধিক সংখ্যক লোককে নরক থেকে বাঁচানো যেতো কারণ পৃথিবীর শাসকেরা যেহেতু নানা ধর্মে বিভক্ত, তাই একটি মাত্র দেশ কেবল সঠিক পথে থাকতো এবং জগতের বাকি সব লোক তাদের শাসকদের সাথে সাথে নরকগামী হতো ; "আর যা ব্যাপারটির অযৌক্তিকতাকে আরো বাড়িয়ে তোলে এবং এক ঈশ্বরের ধারণার সাথে একেবারেই খাপ খায় না, তা হচ্ছে এই যে মানুষ তার জন্মস্থানের কারণেই অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরক ভোগ করবে।" এই নীতিটির উপরই লক বারবার জোর দিয়েছেন। যদি রাষ্ট্র কর্তৃক ধর্মবিশ্বাস চাপিয়ে দেওয়াটা যৌক্তিক হয়, তাহলে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, সত্য ধর্ম অনুসৃত হচ্ছে এমন একটি বা গুটিকয়েক দেশ ছাড়া বাকি সকল দেশের বাসিন্দাদের মিথ্যা ধর্ম গ্রহণ করাই কর্তব্য। যদি ইংল্যান্ডে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মমতকে মদদ দেয়া হয়, তাহলে ঐ একই নীতির অনুসরণে ফ্রান্সে পোপতন্ত্র আনুকূল্য লাভ করবে। "ইংল্যান্ডে যা সত্য ও কল্যাণকর, তা রোম, চীন ও জিনিভাতেও সত্য ও কল্যাণকর হবে।" নীতি হিসেবে সহনশীলতাই সত্য ধর্মকে আধিপত্য বিস্তারের উত্তম সুযোগ দেয়।

লক পৌত্তলিকদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা সমর্থন করতেন। পৌত্তলিক বলতে তিনি উত্তর আমেরিকার 'ইন্ডিয়ান'দের বোঝাতেন এবং যা এই "নির্দোষ অপধর্মাবলম্বীদেরকে" তাদের প্রাচীন ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল সেই যাজকীয় উদ্দীপনা সম্পর্কে কতিপয় কঠোর

মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর সহনশীলতা যদিও খ্রিস্টধর্মের পরিসীমার বাইরে পৌঁছেছিল, কিন্তু তবু তা পরিপূর্ণ ছিল না। প্রথমত, তিনি বাদ দিয়েছেন রোমান ক্যাথলিকদেরকে। তবে তা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসাদির জন্য নয়, বরং এজন্য যে তারা "শেখায় যে ধর্মত্যাগীদের সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষার দরকার নেই", [ক্যাথলিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক] "বহিষ্কৃত রাজারা তাঁদের সিংহাসন ও রাজ্য উভয়ের উপরই অধিকার হারিয়েছেন," এবং আরো এজন্য যে তাঁরা পোপ বলে পরিচিত এখন বিদেশী শাসকের রক্ষণ ও সেবার নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন। অন্য কথায় তাঁরা রাজনৈতিকভাবে বিপজ্জনক। লকের অপর ব্যতিক্রম হলো নিরীশ্বরবাদীরা।

> যারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে তাদের কাউকেই সহ্য করা উচিত নয়। প্রতিশ্রুতি, চুক্তি, শপথ হচ্ছে মানব সমাজের বন্ধন ; নিরীশ্বরবাদীর উপর এগুলির কোনো আধিপত্য থাকতে পারে না। ঈশ্বরকে প্রত্যাহার করে নেওয়া এমনকি মানসিকভাবে হলেও সব কিছুকে ভেঙে ফেলে। পরন্তু, যারা তাদের নাস্তিকতা দ্বারা সকল ধর্মের ক্ষতি তথা ধ্বংসসাধন করে, সহনশীলতার সুযোগ গ্রহণ করার মতো কোনো ধর্মের ছত্রছায়াও তাদের থাকতে পারে না।

অতএব লক তাঁর যুগের সংস্কার থেকে মুক্ত নন। উক্ত ব্যতিক্রমগুলি লকের নিজের নীতিরই বিরোধিতা করে। যে নীতির বক্তব্য হচ্ছে "যেসব আইন কাযে পরিণত করা মানুষের ক্ষমতার মধ্যে নয়, তেমন আইনের নিয়ন্ত্রণে সবকিছু থাকবে এটা অদ্ভুত ব্যাপার। এবং যাকে বা যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করা আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না।" এই নীতি প্রটেস্ট্যান্টদের সম্পর্কে যেমন প্রযোজ্য, রোমান ক্যাথলিকদের সম্পর্কেও তেমনিই প্রযোজ্য ; এবং যেমন প্রযোজ্য ঈশবাদী (ডিইস্ট)–দের সম্পর্কে, ঠিক তেমনই প্রযোজ্য নিরীশ্বরবাদীদের সম্পর্কে। তবে লক সম্ভবত ভেবেছিলেন যে, অনুমানমূলক নিরীশ্বরবাদী মত—যা তাঁর যুগে মোটেই সাধারণ বস্তু ছিল না—ইচ্ছাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। তিনি তাঁর কালের মহৎ দার্শনিক স্পিনোজা [১৬৩২–১৬৭৭]–কেও নিজের কল্পিত রাষ্ট্রের বাইরে রাখতেন।

কিন্তু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও লকের *টলারেশন* [সহনশীলতা] একখানা অতি মূল্যবান গ্রন্থ, এবং এর যুক্তিতর্ক আমাদেরকে লেখক যতো দূর চেয়েছিলেন তার চেয়েও আগে নিয়ে যায়। এ গ্রন্থে ধর্মনিরপেক্ষ নীতিকে অবাধে উপস্থাপন করা হয়েছে জোরের সাথে, এবং এর নৈয়ায়িক বিচার্য বিষয় হলো 'ডিজএস্টাব্লিশমেন্ট' বা রাষ্ট্রকে গির্জা থেকে পৃথক করে ফেলা। গির্জা "একটি স্বাধীন ও স্বেচ্ছামূলক সমিতি" মাত্র। এখানে আমি লকের একটি মন্তব্য উল্লেখ করতে পারি, যেখানে তিনি বলেছেন, অবিশ্বাসীদেরকে যদি গায়ের জোরেই ধর্মান্তরিত করতে হয়, তাহলে তা "সকল সশস্ত্র সৈনিকসহ গির্জার কোনো সন্তান, তা তিনি যতো শক্তিধরই হোন না কেন, অপেক্ষা স্বর্গীয় যোদ্ধবাহিনীর অধিকারী ঈশ্বরের পক্ষেই সহজতর।" এ হচ্ছে সম্রাট তিবেরিয়াস [খ্রি. ১৪–৩৭]–এর সেই নীতির (২য় অ. পৃ. ১৭) সদৃশ একটি নীতি বর্ণনা করার বিনয়সম্মত পন্থা। মিথ্যা বিশ্বাস যদি ঈশ্বরের কাছে অপরাধজনক কিছু হয়ে থাকে, তাহলে তা আসলে তাঁরই ব্যাপার।

নন্‌কন্‌ফর্মিস্ট [অ্যাংগ্লিক্যান গির্জার অনুবর্তী নয় এমন] সম্প্রদায়গুলির প্রতি সহনশীলতা চরমপন্থী অ্যাংগ্লিক্যানদেরকে মোটেই খুশি করেনি, এবং আঠারো শতকের প্রথমে এই গোষ্ঠীটির প্রভাব 'ডিসেন্টার' (ভিন্নমতাবলম্বী)–দের স্বাধীনতার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতি গোঁড়া নন্‌কন্‌ফর্মিস্ট *ড্যানিএল ডিফো* (১৬৬০–১৭৩১)–কে প্ররোচিত করে তাঁর পুস্তিকা *দ্য শর্টেস্ট ওয়ে উইথ দ্য ডিসেন্টার্স* [ভিন্ন মতাবলম্বীদের সাথে সংক্ষিপ্ততম

পথ] (১৭০২) লিখতে। এটি ছিল সহনশীলতার নীতির বিরুদ্ধে একটি ব্যাজস্তুতিপূর্ণ আক্রমণ। এতে দেখানোর ভান করা হয়েছে যে, ডিসেন্টাররা অন্তরে সংশোধনাতীত বিদ্রোহী এবং তাদের প্রতি শিষ্ট নীতি অবলম্বন নিরর্থক। এতে আরো ইঙ্গিত করা হয় যে, গুপ্ত সভাসমূহের সকল প্রচারকের ফাঁসি হওয়া উচিত এবং যারা ঐসব সভায় যোগ দেয় তাদের সকলকে নির্বাসনে পাঠানো উচিত। 'হাই অ্যাংগ্লিক্যান' দলের অনুভূতির এই দারুণ মজাদার ও অসম্ভব রকম আন্তরিক অনুকরণ প্রথমত ডিসেন্টারদেরই ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু 'হাই অ্যাংগ্লিক্যান' যাজকেরা রুষ্ট হয়ে উঠলেন। ডীফোকে জরিমানা করা হলো, তিন তিন বার শাস্তি স্তম্ভে চড়ানো হল, এবং শেষ পর্যন্ত নিউগেট কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হলো [১৭০৩]।

কিন্তু টোরি প্রতিক্রিয়া ছিল সাময়িক। আঠারো শতকে খ্রিস্টান সম্প্রদায়গুলির মধ্যে তুলনামূলকভাবে সহিষ্ণু মনোভাব প্রাধান্য পায় এবং একাধিক নতুন সম্প্রদায় স্থাপিত হয়। সরকারি গির্জার ধর্মান্ধতা হ্রাস পেয়েছিল ; ঐ ধর্মাধিষ্ঠানের পুরোহিতদের অনেকেই যুক্তিবাদী চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। যদি রাজা তৃতীয় জর্জ [রাজ. ১৭৬০–১৮২০] বিরোধিতা না করতেন তাহলে হয়তো ঐ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই [রোমান] ক্যাথলিকরা তাদের বিরুদ্ধে আরোপিত বিধিনিষেধ থেকে মুক্তি পেতো। এই পদক্ষেপের সপক্ষে এডমণ্ড বার্ক [১৭২৯–৯৭] জোরালো বক্তব্য রেখেছিলেন এবং উইলিয়াম পিটও [১৭৫৯–১৮০৬] এটা চাইতেন। তবু ১৮২৯ সালের আগে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি এবং তখনও আয়ারল্যান্ডে বিদ্রোহের হুমকির মুখেই নেয়া হয়েছিল। ইতোমধ্যে ১৮১৩ সালে ইউনিট্যারিয়ানদেরকে আইনগত সহনশীলতার আওতায় আনা হয়েছিল, কিন্তু চল্লিশের দশকের আগে তারা সকল বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। ১৮৫৮–র আগে ইহুদিদেরকে পূর্ণ নাগরিকত্ব দেওয়া হয়নি।

উনিশ শতকে ইংল্যান্ডে ধর্মীয় স্বাধীনতা অর্জন ছিল প্রধানত লিবারাল [উদার পন্থী]–দের কাজ। লিবারাল দল এগিয়ে চলছিল সম্পূর্ণ জাগতিকায়ন [বা ধর্মনিরপেক্ষতা] এবং ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে—আর এটাই ছিল লকের অযাজকীয় সরকার তত্ত্বের যৌক্তিক পরিণতি। ১৮৬৯ সালে আয়ারল্যান্ডে গির্জাকে সরকার থেকে পৃথক করা হলে এই আদর্শ আংশিক বাস্তবায়িত হয় ; আর এখন চল্লিশ বছর পর [১৯১৩] লিবারাল দল ওয়েলসে ঐ নীতি প্রয়োগ করতে চাইছে। এইভাবে একটু একটু করে ঐ পরিবর্তন সাধিত হোক এটা ইংরেজ রাজনীতি ও ইংরেজ মনস্তত্ত্বের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের খুবই অনুকূল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশে [ধর্ম ও রাষ্ট্রের] পৃথকীকরণের ব্যবস্থা চালু আছে ; রাষ্ট্র ও ধর্মমত বিশেষের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই ; কোনো গির্জাই স্বেচ্ছাভিত্তিক সমিতি ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথকীকরণের কাজ রাষ্ট্রীয় গির্জা ব্যবস্থার অধীনেই এগিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে ১৮৭০ সালের শিক্ষা আইন এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ধর্মীয় পরীক্ষা বিলোপের (১৮৭১) উল্লেখই যথেষ্ট। [ধর্মীয়] স্বাধীনতার অনুকূলে অন্যান্য অর্জনের কথা উল্লেখ করা হবে যখন ভিন্ন এক অধ্যায়ে [সপ্তম অধ্যায়] যুক্তিবাদের অগ্রগতি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে।

ফ্রান্সে সতেরো শতকের ধর্মীয় পরিস্থিতির সাথে যদি আঠারো শতকের ধর্মীয় পরিস্থিতির তুলনা করি, তাহলে মনে হবে তা ইংল্যান্ডের অবস্থার ঠিক বিপরীত। ইংল্যান্ডে

ধর্মীয় স্বাধীনতার অনুকূলে বিরাট অগ্রগতি হয়েছিল, আর ফ্রান্সে তা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছিল। ১৬৭৬ সাল পর্যন্ত ফরাসি প্রটেস্ট্যান্টদের (হুগেনোদের) সহ্য করা হয়েছিল ; পরের একশো বছর তারা আইনের রক্ষণাবেক্ষণ থেকে বঞ্চিত ছিল। পরন্তু 'ইডিক্ট অফ নান্টস্' [নান্টস্-এর ফরমান] (১৫৯৮) নামক সনদের বলে যে সহনশীলতা তারা পেয়েছিল তা ছিল সীমিত ধরনের। উদাহরণস্বরূপ, প্রটেস্ট্যান্টদের সেনাবাহিনীতে নেওয়া হতো না, তারা প্যারিস ও অন্য কতিপয় শহর ও জেলায় বাস করতে পারতো না। আর যেটুকু স্বাধীনতা তারা ভোগ করতো তা কেবল তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল অন্য কোনো সম্প্রদায়কে দেওয়া হয়নি। ত্রয়োদশ লুই [রাজ. ১৬১৩-১৬৪৩] ও চতুর্দশ লুই [রাজ. ১৬৪৩-১৭১৫]-এর রাজত্বকালে যতোদিন দুজন মহান কার্ডিনাল (রিশল্যু ও মাজারিন) ফ্রান্স শাসন করেছিলেন ততোদিন [১৬১৪-১৬৬১] ঐ সনদের শতসমূহ বিশ্বস্ততার সাথে পালন করা হয়েছিল। কিন্তু ১৬৬১ সালে চতুর্দশ লুই নিজে ক্ষমতা গ্রহণ করার পর প্রটেস্ট্যান্টদের বিরুদ্ধে একের পর এক অনেকগুলো আইন পাস করেন, যার পরিণতিতে ১৬৭৬ সালে সনদ প্রত্যাহার করে নেওয়া হলো এবং প্রটেস্ট্যান্টদের উপর নির্যাতন শুরু হয়ে গেল।

ফরাসি যাজকেরা '*কমপেল দেম টু কাম ইন*' [তাদের বাধ্য করো পুরোনো ধর্মে ফিরে আসতে] শীর্ষক কুখ্যাত বই লিখে ঐ নীতির যৌক্তিকতা দেখালেন এবং সেন্ট অগাস্তিন [খ্রি. ৩৫৪-৪৩০] এর দোহাই দিলেন। তাঁদের যুক্তিতর্ক হল্যান্ডে শরণার্থী হয়ে আসা ফরাসি প্রটেস্ট্যান্ট পিয়্যার বেয়ল [১৬৪৭-১৭০৬]-কে প্রণোদিত করলো সহনশীলতার সমর্থনে একখানি বই লিখতে। বইটির নাম দেওয়া হয়েছিল *ফিলসফিক্যাল কমেন্ট্রি অন দ্য টেক্স্ট 'কমপেল দেম টু কাম ইন'* [তাদের বাধ্য করো ভেতরে আসতে'] শীর্ষক পুস্তকের উপর দার্শনিক ভাষ্য (১৬৮৬)। গুরুত্বের দিক থেকে এটি লকের গ্রন্থের সমান। আর লকের বইটি ঐ সময়েই লেখা হচ্ছিল। যেসব যুক্তির উপর দুই লেখক জোর দিয়েছিলেন তার অনেকগুলিই অভিন্ন। রোমান ক্যাথলিকদের বাদ দেওয়ার ব্যাপারে তাঁরা একমত ছিলেন এবং তা অভিন্ন কারণে। বেইলের বই-এ সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জিনিসটি হচ্ছে তাঁর এই সন্দেহবাদী যুক্তি যে, ভ্রমকে বলপ্রয়োগে দমন করাটা যদি একটি সঠিক নীতিও হতো, তবু কোনো সত্যই এতটা সুনিশ্চিত নয় যে, ঐ তত্ত্বটিকে বাস্তবে প্রয়োগ করার পক্ষে আমরা যুক্তি খুঁজে পাই। পরের অধ্যায়ে আমরা দেখবো যুক্তিবাদের পক্ষে এই বিশিষ্ট পণ্ডিত কি অবদান রেখেছিলেন।

যদিও ফ্রান্স থেকে প্রটেস্ট্যান্টরা বিরাট সংখ্যায় দেশত্যাগ করেছিল, তবু দেশ থেকে ধর্মীয় ভিন্নমত সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করার যে পরিকল্পনা চতুর্দশ লুই এঁটেছিলেন তাতে তিনি সফলকাম হননি। আঠারো শতকে পঞ্চদশ লুই [রাজ. ১৭১৫-১৭৭৪]-এর আমলে প্রটেস্ট্যান্টদের অস্তিত্ব সহ্য করা হতো, যদিও তারা আইনের সংরক্ষণ পায়নি, তাদের বিয়ে আইনসম্মত বলে স্বীকার করা হতো না, এবং যেকোনো সময় তাদের উপর নির্যাতন নেমে আসতে পারতো। ঐ নির্যাতিত সম্প্রদায়ের দুর্দশা মোচনের লক্ষ্যে, শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে একটি সাহিত্যিক আন্দোলনের সূচনা হয়। এটির পরিচালনায় ছিলেন প্রধানত যুক্তিবাদীরা, কিন্তু শেষে আলোকপ্রাপ্ত ক্যাথলিকরাও ঐ আন্দোলন সমর্থন করেন। ফলে অবশেষে ১৭৮৭ সালে জারি হলো একটি 'ইডিক্ট অফ টলারেশন বা সহনশীলতার ফরমান, যা প্রটেস্ট্যান্টদের অবস্থাকে সহনযোগ্য করেছিল, যদিও ঐ ফরমানও তাদেরকে কোনো কোনো চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখে।

অসহনশীলতার বিরুদ্ধে অভিযানে সবচেয়ে তেজী ও শক্তিমান নেতা ছিলেন ভল্‌তেয়ার [১৬৯৪–১৭৭৮] (পরবর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। অন্যায় উৎপীড়নের কতিপয় জ্বলন্ত ঘটনা তাঁর লেখায় উদ্‌ঘাটিত হলে তা ঐ লক্ষ্যে [অর্থাৎ রাষ্ট্রে সহনশীলতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে] পৌঁছানোর সপক্ষে সাধারণ যুক্তিসমূহের চেয়ে অনেক বেশি কাজ করেছিল। তুলুজ শহরের প্রটেস্ট্যান্ট ব্যবসায়ী জঁ কালা (Jean Calas)-র ঘটনাটি ছিল সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত। জঁ কালা–র এক ছেলে আত্মহত্যা করলে গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হলো যে, ঐ তরুণ ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলে তার বাবা, মা ও ভাই প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মান্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে জনৈক বন্ধুর সাহায্যে তাকে হত্যা করেছে। তাদের সকলকে শিকল দিয়ে বাধা হলো, তারপর তাদের বিচার করে শাস্তি দেওয়া হলো। অথচ ধর্মান্ধতার আনুমানিক ধারণা ছাড়া তাদের অপরাধের পক্ষে কোনো যুক্তি প্রমাণ ছিল না। জঁ কালাকে চাকায় পিষে মারা হলো, তাঁর ছেলে ও মেয়েকে পাঠিয়ে দেয়া হলো কন্‌ভেন্টে, আর তাঁর স্ত্রীকে অনাহারের মুখে পরিত্যাগ করা হলো। তখন ভল্‌তেয়ার জিনিভার কাছে বাস করছিলেন। তাঁর তৎপরতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিধবা মহিলাটি প্যারিস গেলে তাঁকে সহৃদয়তার সাথে গ্রহণ করা হয়, বিশিষ্ট আইনজীবীরা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেন। একটা বিচার বিভাগীয় তদন্ত হয়। তুলুজের রায় উল্টে যায় এবং রাজা ক্ষতিগ্রস্তদের ভাতা মঞ্জুর করেন। ভল্‌তেয়ারের মতে এই কলঙ্কজনক ঘটনা মফস্বলে বলেই ঘটতে পেয়েছিল। কারণ, তিনি বলেন, 'প্যারিসে ধর্মান্ধতা হয়তো বা প্রবলই, কিন্তু সব সময়ই তা যুক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত।"

স্যরভঁ (Sirven)–র ঘটনাটিও অনুরূপ ছিল, যদিও তার পরিণতি বিয়োগান্তক হয়নি এবং এ-ক্ষেত্রেও সেই তুলুজ সরকারই দায়ী ছিল। ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ থেকে নিজ কন্যাকে নিবৃত্ত করার জন্য তাকে একটি কূপে ডুবিয়ে দেওয়ার অভিযোগ এনে স্যরভঁ ও তাঁর স্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে তিনি ও তাঁর পরিবার সুইজারল্যান্ডে পালিয়ে যান এবং সেখানে তাঁরা ভল্‌তেয়ারকে বোঝাতে পেরেছিলেন যে তাঁরা নির্দোষ। তাদের মৃত্যুদণ্ড বাতিল করাতে নয় বছর সময় লেগেছিল, এবং এবার তা তুলুজেই বাতিল হয়েছিল। ১৭৭৮ সালে ভল্‌তেয়ার যখন প্যারিস যান তখন জনতা তাঁকে 'কালা ও স্যারভঁ–র রক্ষক' বলে অভিনন্দিত করে। কালা ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি *টলারেশন* [সহনশীলতা] শিরোনামে যে বই লিখেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবহ ছিল [ধর্মীয়] নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাঁর নিঃস্বার্থ বাস্তব তৎপরতা। লক ও বেইল এর বই–এর তুলনায় ভল্‌তেয়ারের বইটি অনেক দুর্বল। যে সহনশীলতার কথা তিনি সেখানে বলেছেন তা সীমিত ধরনের সহনশীলতা ; তিনি সরকারি চাকরি ও সরকার প্রদত্ত সম্মানাদি রাষ্ট্রধর্মের অনুসারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন।

কিন্তু ভল্‌তেয়ারের সহনশীলতার নিয়মকে যদি সীমিত বলি, তবু তা তাঁর সমসাময়িক রুসো [১৭১২–৭৮] যে ধর্মব্যবস্থা কায়েম করতে চেয়েছিলেন তার তুলনায় প্রশস্ত ছিল। রুসোর জন্ম সুইজারল্যান্ডে হলেও তিনি ফ্রান্সের সাহিত্য ও ইতিহাসের অংশ, কিন্তু তিনি যে জিনিভার ক্যাল্‌ভিনীয় ঐতিহ্যের মধ্যে বেড়ে উঠেছিলেন তা সম্পূর্ণ অর্থহীন নয়। তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র, তার নিজস্ব ভঙ্গিতে, যেকোনো দেবতান্ত্রিক রাষ্ট্র অপেক্ষা বিশেষ ভালো হতো না। তাঁর প্রস্তাব ছিল একটি 'অযাজকীয় ধর্ম' প্রতিষ্ঠা করার, যা হতো এক ধরনের অন্ধবিশ্বাসবর্জিত খ্রিস্টধর্ম। কিন্তু কতিপয় স্থির বিশ্বাসকে তিনি অপরিহার্য বলে মনে করতেন এবং নির্বাসন দণ্ডের শাস্তির মুখে সেগুলি বাধ্যতামূলকভাবে সকল নাগরিকের জন্য গ্রহণীয় করেছিলেন।

এসব বিশ্বাসের মধ্যে ছিল একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব, লোকান্তরে সৎ মানুষের জন্য দিব্য সুখ ও অসতের জন্য শাস্তি এবং যারা মূল বিশ্বাসগুলি মেনে নেবে তাদের সকলের প্রতি সহনশীলতা। এটা বলা যেতে পারে যে ঐ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র মোটামুটি ব্যাপক হবে এবং সেখানে সকল খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের লোক এবং অনেক ঈশবাদীর (ডিইস্ট্) স্থান হবে। কিন্তু কতিপয় অপরিহার্য বিশ্বাস বাধ্যতামূলক করায় রুসোর রাষ্ট্র সহনশীলতার নীতি মানতে অস্বীকার করেছে। রুসোর ধারণার গুরুত্ব হচ্ছে এই যে, ফরাসি বিপ্লবের সময় ধর্মীয় নীতিতে যেসব পরীক্ষা–নিরীক্ষা করা হয়েছিল তার একটির প্রেরণা এসেছিল ঐ ধারণা থেকে।

ফ্রান্সে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে বিপ্লব। বিপ্লবের নেতাদের অধিকাংশই গোঁড়া ছিলেন না। তাঁদের যুক্তিবাদ স্বভাবতই ছিল অষ্টাদশ শতকীয় চরিত্রের এবং ১৭৮৯–এর 'ডিক্লারেশন অফ রাইট্স্' [অধিকারের ঘোষণা]–এর মুখবন্ধে নিম্নোক্ত ভাষায় ডিইজ্ম বা ঈশবাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয় : "পরমেশ্বরের উপস্থিতিতে ও আনুকূল্যে"। (এর বিরুদ্ধে মাত্র একটি কণ্ঠে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছিল)। ঐ ঘোষণায় বিধান দেওয়া হয় যে, কোনো ব্যক্তিকে তার মতামতের জন্য উত্ত্যক্ত করা যাবে না, যদি ঐ মত পোষণ করতে গিয়ে সে জনশৃঙ্খলা ক্ষুণ্ণ না করে। ক্যাথলিক মতকে 'প্রাধান্যপ্রাপ্ত' (dominant) ধর্ম হিসেবে স্বীকার করা হয়; প্রোটেস্ট্যান্টদের (কিন্তু ইহুদিদের নয়) সরকারি চাকুরিতে গ্রহণযোগ্যতা দেওয়া হয়। এ সময়ের সবচেয়ে প্রধান রাষ্ট্রনায়ক কোঁত দ্য মিরাবো [১৭৪৯–৯১] 'সহনশীলতা' (tolerance) ও 'প্রাধান্যপ্রাপ্ত' (dominant) শব্দ দুটি ব্যবহারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন : "সবচেয়ে নির্বাধ ধর্মীয় স্বাধীনতা আমার চোখে এমন এক অলংঘনীয় অধিকার যে তাকে 'সহনশীলতা' শব্দে প্রকাশ করা আমার কাছে এক ধরনের পীড়ন বলে মনে হয়, কারণ যে কর্তৃপক্ষ সহ্য করে সে তা নাও করতে পারে।" দু বছর পরে প্রকাশিত টমাস পেইন [১৭৩৭–১৮০৯]–এর *রাইট্স্ অফ ম্যান* [মানুষের অধিকার] (১৭৯১)–এ একই প্রতিবাদ করা হয়েছিল : "সহনশীলতা অসহনশীলতার *বিপরীত* বস্তু নয়, বরং তার অনুকৃতি মাত্র। উভয়ই স্বৈরাচার। প্রথমটি বিবেকের স্বাধীনতা প্রত্যাহার করে নেওয়ার অধিকার নিজের উপরে নেয়, অপরটি ঐ স্বাধীনতা দান করার অধিকার নিজের জন্য সংরক্ষণ করে।" পেইন ছিলেন একজন উৎসাহী ঈশবাদী এবং তিনি আরো লিখেছেন :

> যদি কোনো সংসদে এমন একটি বিল উঠতো যার শিরোনাম 'সর্বশক্তিমানকে কোনো ইহুদি বা তুর্কির প্রার্থনা গ্রহণ করার স্বাধীনতা দান বা তা সহ্য করা সম্পর্কিত আইন', অথবা 'সবশক্তিমানকে অনুরূপ প্রার্থনা গ্রহণ থেকে বিরত রাখার জন্য আইন', তাহলে মানুষ চমকে উঠতো এবং একে ঈশ্বরদ্রোহিতা বলে অভিহিত করতো। চারদিকে একটা হৈ–চৈ পড়ে যেতো। তখনই ধর্মীয় ব্যাপারে সহনশীলতার দায়িত্ব নেওয়ার বিষয়টির মুখোশ খুলে পড়তো।

ফরাসি বিপ্লবের শুরুটা ভালোই হয়েছিল, কিন্তু বিপ্লবকালে সর্বক্ষণ মিরাবোর চেতনার প্রাধান্য থাকেনি। ১৭৮৯ থেকে ১৮০১ পর্যন্ত ধর্মীয় নীতিতে অদল–বদলের ব্যাপারটি বিশেষ কৌতূহলের। কারণ, পূর্ববর্তী সরকারকে উচ্ছেদ করে তার অসহনশীলতার অবসান ঘটিয়েছেন বলে যাঁরা গর্ব করতেন তাঁদের মনের উপর বিবেকের স্বাধীনতার নীতিটি আদৌ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ১৭৯০ সালের 'সিভিল কনস্টিটিউশন অফ দ্য ক্লার্জি' [যাজকবর্গের শাসনতান্ত্রিক সংবিধান]–এর দ্বারা রাষ্ট্রীয় ধর্মাধিষ্ঠান পুনর্গঠন করা হয়। এতে

পোপের কর্তৃত্ব স্বীকার করা ফরাসি নাগরিকদের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যায়, এবং বিশপদের নিয়োগ চলে যায় 'ইলেকটর্স্ অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট্স' [বিভাগীয় নির্বাচকমণ্ডলী]–এর হাতে, যাতে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রাজার কাছ থেকে জনগণের কাছে স্থানান্তরিত হয়। রাজতন্ত্রের পতনের পর গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের আমলে (১৭৯২–১৭৯৫) এই সংবিধানই চালু থাকে, কিন্তু ফ্রান্সকে খ্রিস্টধর্মমুক্ত করার এক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়, এবং প্যারিসের কমিউন সকল ধর্মের উপাসনালয় বন্ধ করার হুকুম দেয়। প্যারিস ও প্রদেশগুলিতে ক্যাথলিক উপাসনার আদলে আচার–অনুষ্ঠান সহযোগে 'যুক্তিদেবী'র পূজার আয়োজন করা হয়। উগ্র ক্যাথলিক–বিদ্বেষী সরকার প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগের কথা বিবেচনা করেনি ; সরাসরি উৎপীড়ন জাতীয় প্রতিরক্ষা দুর্বল করতে পারতো এবং ইউরোপকে কলঙ্কিত করতো। বালসুলভ সরলতায় তারা আশা করেছিল যে, ধর্মরূপ কুসংস্কার ক্রমান্বয়ে দূরীভূত হবে। রোব্স্পিয়্যার [১৭৫৮–৯৪] ফ্রান্সকে খ্রিস্টধর্মশূন্য করার নীতির বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং ক্ষমতায় থাকা কালে (এপ্রিল ১৭৯৫) তিনি রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে 'সুপ্রিম বিইং' [পরমেশ্বর]–এর উপাসনা চালু করেন। "ফরাসি জাতি পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ও আত্মার অনশ্বরতা স্বীকার করে।" অন্যান্য উপাসনা পদ্ধতির স্বাধীনতা বজায় রাখা হয়। এভাবে কয়েক মাসের জন্য রুসোর ধারণা মোটামুটি বাস্তবায়িত হয়েছিল। এর অর্থ কিন্তু ছিল অসহনশীলতা। নিরীশ্বরবাদকে অধর্ম বলে মনে করা হতো, এবং "যাঁরা রোব্সপিয়্যারের অনুরূপ চিন্তা করতেন না তাঁরা সকলেই ছিলেন নিরীশ্বরবাদী।"

গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পরে হলো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রজাতন্ত্র (১৭৯৫–১৭৯৯)। তখনকার সরকারের নীতি ছিল কোনো একক ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রাধান্য ব্যাহত করা, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা ; তবে সবচেয়ে শক্তিশালী সম্প্রদায় ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে কিছুটা পক্ষপাতিত্ব অবলম্বন, কারণ মনে করা হতো যে ঐ সম্প্রদায়টি অন্য সকল সম্প্রদায় এমন কি প্রজাতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ। পরিকল্পনা ছিল, নতুন যুক্তিবাদী উপাসক গোষ্ঠীগুলিকে বেড়ে উঠতে আনুকূল্য করা এবং ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে ঈশ্বরপ্রেরিত ধর্মের ক্ষতিসাধন করা। তদনুসারে ১৭৯৫ সালের সংবিধানে গির্জাকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করা হলো। ঐ সংবিধানে সব রকম উপাসনার স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়া হয়, এবং রাষ্ট্র ক্যাথলিক যাজকদেরকে এতদিন যে বেতন দিয়ে আসছিল, তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে অযাজকীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়। ধর্মের পরিবর্তে 'ডিক্লারেশন অফ রাইট্স' [অধিকারের ঘোষণা], সংবিধানের ধারাসমূহ, এবং প্রজাতান্ত্রিক নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া হতে থাকে। জনৈক উৎসাহী ব্যক্তি ঘোষণা করলেন : "অচিরেই সক্রেতিস, মার্কাস অরেলিয়াস [রোমান সম্রাট, রাজ. খ্রি. ১৬১–১৮০] ও সিসরো [রোমান দার্শনিক ১০৬–৪৩ খ্রি. পূ.]–র ধর্মই হবে গোটা পৃথিবীর ধর্ম।"

'থিওফিল্যান্থ্রপি' [মানবহিতবাদী ঈশ্বরবিশ্বাস] নামে এক নতুন যুক্তিবাদী ধর্মের প্রচলন করা হলো। এটি ছিল ঐ শতাব্দীর দার্শনিক ও কবিদের 'স্বাভাবিক ধর্ম' (natural religion), ভল্তেয়ার ও ইংরেজ ঈশবাদীদের ধর্ম—রুসোর পরিশোধিত খ্রিস্টধর্ম নয়, বরং খ্রিস্টধর্মের চেয়ে পুরাতন ও উৎকৃষ্টতর এক আদর্শ। সংক্ষেপে এর নিয়মনীতিগুলি ছিল : ঈশ্বর, (আত্মার) অমরত্ব, ভ্রাতৃত্ব, ও মানবতায় বিশ্বাস ; অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে কোনো আক্রমণ নয়, বরং সকলের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন ; একে অপরকে নৈতিকতা চর্চায়

উৎসাহ দেওয়ার জন্য কোনো পারিবারিক বাড়িতে অথবা কোনো উপাসনালয়ে মাঝে মাঝে জড়ো হওয়া। কখনো অলক্ষ্যে কখনো প্রকাশ্যে সরকারের রক্ষণাবেক্ষণ পেয়ে এ ধর্মমত বিদগ্ধ শ্রেণীসমূহের ভেতর কিছুটা সাফল্য লাভ করেছিল।

এই শাসনামলে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ধারণা জনপ্রিয়তা লাভ করে, এবং শতাব্দীর শেষ নাগাদ ফ্রান্সে কার্যত ধর্মীয় শান্তি স্থাপিত হয়েছিল। কনস্যুলেটের সময়ে (১৭৯৯ থেকে) একই ব্যবস্থা চলতে থাকে, তবে নেপোলিয়ন [১৭৬৯–১৮২১] থিওফিল্যানথ্রপিকে আর প্রতিরক্ষা দেননি। যদিও বিদ্যমান ব্যবস্থায় অসন্তুষ্টি ছিল না বলেই মনে হয়, তবু ১৮০১ সালে নেপোলিয়ন এ ব্যবস্থা রহিত করে পোপকে দৃশ্যপটে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। সংখ্যাগুরুর ধর্ম হিসেবে রোমান ক্যাথলিক ধর্মকে আবার রাষ্ট্রের বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় নেওয়া হলো, ধর্মযাজকদের বেতন আবার রাষ্ট্র থেকে পরিশোধ করা হতে লাগলো, এবং ধর্মাধিষ্ঠানের উপর পোপের কর্তৃত্ব সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবার মেনে নেওয়া হলো। তবে অন্যান্য ধর্মের প্রতিও পূর্ণ সহনশীলতা বজায় রাখা হলো। এ ছিল ফরাসি প্রজাতন্ত্র ও পোপ [সপ্তম পায়াস (১৮০০ ১৮২৩)]-এর মধ্যেকার কংকর্ড্যাট [Concordat 1801] বা ঐকমত্যের ফল। জনৈক মহামান্য পণ্ডিত রায় দিয়েছেন যে, ফরাসি জাতির পরামর্শ যদি চাওয়া হতো তাহলে তারা উক্ত পরিবর্তনের বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করতো। ধারণাটি সত্য কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা যেতে পারে। তবে মনে হয়, নেপোলিয়নের নীতির প্রেরণা এসেছিল এমন একটা হিসেব থেকে যে পোপকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে তিনি মানুষের বিবেক নিয়ন্ত্রণ করতে এবং আরো সহজে তাঁর সাম্রাজ্যিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারবেন।

ধর্মসংক্রান্ত নীতি এবং যুক্তিবাদী চিন্তাবিদ্‌দের দেওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে নতুন নতুন ধর্মমত নিয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষা ছাড়াও আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রসঙ্গে ফরাসি বিপ্লবের একটি গুরুত্ব রয়েছে। আর তা হচ্ছে এই যে, ঐ বিপ্লব নিজেই ছিল এক অসহিষ্ণু বিশ্বাস কর্তৃক যুক্তিকে দমন করার একটা দৃষ্টান্ত।

বিপ্লবের নেতারা বিশ্বাস করতেন যে, কতিপয় তত্ত্ব প্রয়োগ করে তাঁরা ফ্রান্সকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারবেন এবং পৃথিবীকে দেখিয়ে দেবেন কিভাবে মানব জাতির চিরস্থায়ী সুখ নিশ্চিত করা যেতে পারে। তাঁরা যুক্তির নামে কাজ করতেন, কিন্তু তাঁদের তত্ত্বগুলি ছিল বিশ্বাসবিধি (articles of faith) ; সেগুলি যেকোনো অতিপ্রাকৃত ধর্মের নির্বিচার বিশ্বাসসমূহের (dogmas) মতোই অন্ধভাবে ও অযৌক্তিকভাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল। এসব নির্বিচার বিশ্বাসের একটি ছিল রুসোর এই ভ্রান্ত মত যে, মানুষ এমন একটি জীব যে স্বভাবতই সৎ এবং ন্যায়বিচার ও শৃংখলা ভালোবাসে। সকল মানুষ স্বভাবত সমান—এই অলীক ধারণা ছিল অনুরূপ আর একটি বিশ্বাস। আইন পাশ করে অতীতকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা এবং একটি সমাজের চরিত্র আমূল বদলে দেওয়া যায় এই বালসুলভ প্রত্যয় চালু হয়ে গিয়েছিল। "স্বাধীনতা, সমতা, ভ্রাতৃত্ব" ছিল প্রেরিত পুরুষদের (Apostles) ধর্মবিশ্বাসের মতোই একটা বিশ্বাস যা স্বর্গ থেকে আসা প্রত্যাদেশের ন্যায় মানুষের মনকে সম্মোহিত করেছিল, এবং এর প্রচারে যুক্তির ভূমিকা খ্রিস্টধর্ম বা প্রটেস্ট্যান্ট মতবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে যেমনটি হয়েছিল তেমন নগণ্যই ছিল। 'যুক্তি'র অন্ধ প্রবক্তারা মানব প্রকৃতি সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং তারা অর্থনীতির সত্যগুলোকে অবজ্ঞা করতো। তাই তারা যখন তাদের

নীতিকে কার্যে পরিণত করলো তখন তার অর্থ মতবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে যেমনটি হয়েছিল তেমন নগণ্যই ছিল। 'যুক্তি'র অন্ধ প্রবক্তারা মানব প্রকৃতি সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং তারা অর্থনীতির সত্যগুলোকে অবজ্ঞা করতো। তাই তারা যখন তাদের নীতিকে কার্যে পরিণত করলো তখন তার অর্থ আর সমতা, ভ্রাতৃত্ব বা স্বাধীনতা থাকলো না, বিশেষত স্বাধীনতা একেবারেই নয়। ধর্মপ্রচারের প্রচলিত হাতিয়ার যে সন্ত্রাস, তাকে এর আগে কখনো এতো নির্মমতার সাথে প্রয়োগ করা হয়নি। কেউ বিপ্লবের নীতিমালা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করলে সে দ্রোহী বলে বিবেচিত হতো এবং ধর্মদ্রোহীর ভাগ্যই তার প্রাপ্য ছিল। আর অধিকাংশ ধর্মীয় আন্দোলনের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও যারা কিছুটা কোমল ও কম অযুক্তিবাদী ছিল তারা কট্টরপন্থীদের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হতো। যারা বিশ্বাস করতো যে তারা যুক্তির শাসনের উদ্বোধন করছে, তাদের হাতেই যুক্তি কথাটির এমন যন্ত্রণাকর অপব্যবহার হলো যেমনটি আর কখনো হয়নি।

তবে ফরাসি বিপ্লব থেকে অন্যান্য ভালো জিনিসের সাথে ধর্মীয় স্বাধীনতাও অবশ্য উদ্ভূত হয়েছিল—প্রথমত রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করার মধ্য দিয়ে, এবং তারপর কংকর্ড্যাট চুক্তির অধীনে। কংকর্ড্যাট একশো বছরের বেশি সময় ধরে রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের অধীনে টিকে ছিল। তারপর ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কংকর্ড্যাট বাতিল করে পুনরায় রাষ্ট্র থেকে ধর্মের পৃথকীকরণ চালু করা হলো।

জার্মান রাজ্যগুলিতে ধর্মীয় স্বাধীনতার ইতিহাস অনেক দিক থেকেই ভিন্ন ছিল, কিন্তু ফ্রান্সের ঘটনাবলীর সাথে তার মিল এখানে যে, [ফ্রান্সের মতো জার্মানিতেও] যুদ্ধের মাধ্যমে সীমিত আকারে সহনশীলতা এসেছিল। 'তিরিশ বছরের যুদ্ধ' [১৬১৮–১৬৪৮] যা সতেরো শতকের প্রথমার্ধে জার্মানিকে বিভক্ত করে ফেলেছিল, এবং যে যুদ্ধে ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধের মতো ধর্ম ও রাজনীতি মিশে গিয়েছিল, সেই যুদ্ধ শেষ হলো ওয়েস্টফ্যালিয়ার সন্ধি (১৬৪৮) দ্বারা। এই সন্ধি দ্বারা ক্যাথলিক, লুথ্‌রান এবং রিফর্ম্‌ড[৮] এই তিন ধর্ম [অর্থাৎ খ্রিস্টধর্মের তিন রূপ] 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য' কর্তৃক স্বীকৃতি পায় এবং সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় ; অন্য সকল ধর্মকে এই সন্ধির বাইরে রাখা হয়। কিন্তু যেসব জার্মান রাজ্য নিয়ে ঐ সাম্রাজ্য গঠিত ছিল তাদের প্রত্যেকে নিজ পছন্দমত কোনো ধর্মকে সহ্য করবে কি করবে না তা রাজ্যের উপরেই ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ প্রত্যেক রাজা ঐ তিন ধর্মের যেটি তাঁর পছন্দ সেটিকে প্রজাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারতেন, এবং নিজ ভূখণ্ডে অন্য দুটিকে বরদাশ্‌ত না করতে পারতেন। কিন্তু তিনি আবার বাকি দুটির একটি বা দুটিকেই তাঁর রাজ্যে থাকতে দিতে পারতেন, এবং তিনি অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদেরকেও তাঁর রাজ্যে বাস করতে এবং তাদের নিজ নিজ বাড়ির আঙিনার মধ্যে তাদের ধর্ম চর্চা করতে দিতে পারতেন। এভাবে রাজ্যে রাজ্যে সহনশীলতা বিচিত্র রূপ ধারণ করেছিল প্রত্যেক শাসকের অবলম্বিত নীতি অনুসারে।

অন্যান্য দেশের মতো জার্মানিতে, বিশেষত প্রুশিয়ায়, রাজনৈতিক উপযোগিতার বিবেচনা সহনশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল ; এবং অন্যান্য দেশের মতোই তাত্ত্বিক প্রবক্তারা জনমতের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু জার্মানিতে সহনশীলতার সমর্থকেরা তাঁদের যুক্তি দাঁড় করিয়েছিলেন আইনগত ভিত্তির উপর, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মতো নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তির উপর নয়। তাঁরা এটি আইনের প্রশ্ন হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন এবং রাষ্ট্র ও গির্জার মধ্যকার আইনগত সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে এর উপর

আলোচনা করেছিলেন। সহনশীলতাকে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক কাল আগে বিবেচনা করেছিলেন মৌলিক চিন্তার অধিকারী একজন ইতালীয়। পাদুয়া নগরের অধিবাসী মার্সিলিউস [আ. ১২৭৫–আ. ১৩৪২] মনে করতেন যে শারীরিকভাবে বাধ্য করার কোনো ক্ষমতা গির্জার নেই, এবং যদি অযাজকীয় কর্তৃপক্ষ ধর্মদ্রোহীদের শাস্তি দেয় তাহলে সেই শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে ঈশ্বরের আদেশ লংঘনের জন্য নয়, বরং রাষ্ট্রের আইন লংঘনের জন্য, যে আইন অনুসারে ধর্মদ্রোহীর রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে বাস করার অধিকার ছিল না।

আইনের সঠিক ধারণা থেকেই যৌক্তিকভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিষ্পন্ন হয়—এই তত্ত্বের একজন প্রধান প্রবক্তা হিসেবে ক্রিশ্চিআন থোমাসিউসকে গ্রহণ করা যায়। ১৬৯৩ থেকে ১৬৯৭ সালের মধ্যে পরপর প্রকাশিত কতিপয় পুস্তিকায় তিনি বিধান দেন যে, শক্তিপ্রয়োগের একমাত্র অধিকারী রাজা, তার আধ্যাত্মিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই ; আবার ধর্মযাজকেরা যদি জাগতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন কিংবা শিক্ষাদান ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে তাঁদের বিশ্বাসকে বাঁচাতে চেষ্টা করেন, তাহলে তাঁরা তাঁদের সীমা অতিক্রম করবেন। কিন্তু অযাজকীয় শক্তির [অর্থাৎ রাজশক্তির] কোনো অধিকার নেই বলপ্রয়োগে বিরুদ্ধধর্মীদের দমন করার, যদি না [ধর্মের ব্যাপারে] বিরুদ্ধ মত পোষণ করা [সাধারণ আইনে দণ্ডার্হ] কোনো অপরাধ হয়। আর ধর্মীয় বিরুদ্ধ মত কোনো অপরাধ নয়, বরং একটা ভ্রান্তি ; কারণ এটা কোনো শৃঙ্খলাশৃঙ্খলার ব্যাপার নয়। থোমাসিউস এই মতের উপর আরো জোর দেন যে, বিশ্বাসের ঐক্য থেকে জনকল্যাণের লাভ করার মতো কিছু নেই, এবং একজন মানুষ কোন্ ধর্মবিশ্বাস পোষণ করছে তাতে কিছুই আসে-যায় না, যতক্ষণ সে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকছে। থোমাসিউসের সহনশীলতা অবশ্য সম্পূর্ণ ছিল না। তিনি তাঁর সমসাময়িক লকের লেখা দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তিনি ঠিক সেই সেই শ্রেণীকে সহনশীলতার সুফল থেকে বাদ রেখেছেন, যেগুলিকে লক বাদ দিয়েছিলেন।

আইনজ্ঞদের প্রভাব ছাড়াও, আমরা লক্ষ্য করি যে লুথ্‌রান যাজকদের আনুষ্ঠানিকতা পূর্ণ সর্বস্ব ধর্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে ধর্মীয় উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট পাঈটিস্ট্ (Pietist) [ধর্মনিষ্ঠাবাদী] আন্দোলন সহনশীলতার অনুকূল এক চেতনা দ্বারা সঞ্জীবিত হয়েছিল। আরো লক্ষ্য করি, আঠারো শতকের শেষার্ধে অগ্রণী বিদ্বানেরা, বিশেষত গট্‌থোল্‌ড' লেসিং [১৭২৯–১৭৮১] সমর্থন দিয়ে সহনশীলতার পক্ষকে এগিয়ে নিয়েছিলেন।

কিন্তু জার্মানিতে ধর্মীয় স্বাধীনতার বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হওয়ার ব্যাপারে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল ফ্রেড্‌রিক দ্য গ্রেট [রাজ. ১৭৪০–১৭৮৬]-এর মতো একজন যুক্তিবাদীর প্রুশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ (১৭৪০)। সিংহাসনে আরোহনের কয়েক মাস পর ধর্মীয় নীতির প্রশ্ন সম্বলিত একটি সরকারি কাগজের মার্জিনে তিনি লিখেছিলেন যে প্রত্যেককেই তার নিজ পন্থায় স্বর্গে পৌঁছানোর সুযোগ দেওয়া উচিত। ফ্রেড্‌রিকের মত ছিল, নৈতিকতা ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র জিনিস, তাই তা সকল ধর্মের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার যোগ্য এবং সেজন্য একজন মানুষ যে ধর্মবিশ্বাসই অবলম্বন করুক না কেন, তা তার সুনাগরিক হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না ; আর রাষ্ট্র একমাত্র সুনাগরিকত্বই দাবি করার অধিকারী। তাঁর এই মতের যৌক্তিক পরিণতিস্বরূপ জার্মানিতে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা এসেছিল। ক্যাথলিকদেরকে প্রটেস্ট্যান্টদের সাথে সমান মর্যদা দেওয়া হলো, এবং ওয়েস্ট্‌ফ্যালিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে সকল নিষিদ্ধ সম্প্রদায়কে পূর্ণ সহনশীলতার আওতায় আনা হলো এবং ফ্রেড্‌রিক এমনকি মুসলমান

অভিবাসীদের তাঁর রাজ্যের কোনো কোনো অংশে জায়গা দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। তৃতীয় জর্জের শাসনাধীন [রাজ. ১৭৬০–১৮২০] ইংল্যান্ড, পঞ্চদশ লুই নিয়ন্ত্রিত [রাজ. ১৭১৫–১৭৭৪] ফ্রান্স, এবং পোপদের প্রভাবাধীন ইতালির সাথে জার্মানির তুলনা করে বৈসাদৃশ্যটি লক্ষ্য করুন। ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটির উপর কদাচিৎই যথার্থ জোর দেওয়া হয়েছে যে, আধুনিক ইউরোপের কোনো দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রথম বাস্তবায়িত হয়েছিল মুক্তচিন্তার অধিকারী এক শাসকের অধীনে, যিনি ছিলেন মহা 'ঈশ্বরনিন্দুক' ভল্‌তেয়ারের বন্ধু।

ফ্রেডরিকের কর্মাদর্শ ও নীতিমালা ১৭৯৪ সালের 'প্রুশিয়ান টেরিটোরিয়াল কোড' [প্রুশীয় ভূখণ্ডের জন্য আইনগ্রন্থ]–এ সূত্রবদ্ধ করা হয়। ঐ আইনে বিবেকের অবারিত স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল ; লুথ্‌রান, রিফর্ম্‌ড, এবং ক্যাথলিক এই তিন প্রধান ধর্মকে সমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হলো এবং তারা একই সুযোগসুবিধা ভোগ করতে লাগলো। ব্যবস্থাটি 'জুরিস্‌ডিক্‌শনাল' বা আইনগত অধিকার সংক্রান্ত ; ইংল্যান্ডে একমাত্র অ্যাংগ্লিক্যান চার্চ যে স্থান দখল করে আছে এখানে যুগপৎ তিনটি চার্চ সেই স্থান অধিকার করলো। 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে'র শেষের দিকের একটি আইনের দ্বারা ওয়েস্ট্‌ফ্যালিয়ার ব্যবস্থা পরিবর্তিত (১৮০৩) না হওয়া পর্যন্ত জার্মানির বাকি অংশ প্রুশিয়ার প্রদর্শিত পথে চলা শুরু করেনি। নতুন সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ার (১৮৭০) আগেই জার্মানির সর্বত্র ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অস্ট্রিয়াতে সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফ [রাজ. ১৭৬৫–১৭৯০] ১৭৮১ সালে এক 'ইডিক্‌ট্‌ অফ টলারেশন' [সহনশীলতার ফরমান] জারি করেন ; এটিকে সে সময়ে একটি ক্যাথলিক রাষ্ট্রের জন্য এক উদার বিধান বলে মনে করা যেতে পারে। জোসেফ একজন অকৃত্রিম ক্যাথলিক ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর যুগের আলোকিত ধ্যানধারণার প্রতি নিরেট থাকেননি। তিনি ফ্রেডারিককে শ্রদ্ধা করতেন এবং এটি খাঁটি সহনশীল চেতনা থেকেই তাঁর ফরমানটি জারি করেছিলেন। ইংল্যান্ডে ১৬৮৯ সালের আইনটির পেছনে অতটা সহনশীল প্রেরণা ছিল না। যা হোক, ফরমান শুধুমাত্র লূথ্‌রান ও রিফর্ম্‌ড সম্প্রদায় দুটিকে এবং রোমের সাথে ঐক্যে উপনীত গ্রীক চার্চের অনুগামী গোষ্ঠীগুলিকে সহনশীলতার আওতায় এনেছিল, এবং সে সহনশীলতা ছিল সীমিত ধরনের। ১৮৬৭ সালের আগে অস্ট্রিয়ায় সত্যকার ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

ইতালিতে অবস্থিত অস্ট্রিয়ার প্রদেশগুলিতেও জোসেফের আইন চালু হয়েছিল। এতে ধর্মীয় স্বাধীনতার ধারণাটি উপলব্ধির জন্য ইতালিকে প্রস্তুত করার কাজ সহজ হয়েছিল। এটা লক্ষণীয় যে, অষ্টাদশ শতকে ইতালিতে সহনশীলতার প্রবক্তা ছিলেন না কোনো যুক্তিবাদী বা দার্শনিক, বরং ছিলেন একজন ক্যাথলিক যাজক–তাম্বুরিনি—যিনি তাঁর বন্ধু ট্রাউট্‌মান্‌স্‌ডর্ফ–এর নামে *অন ইকলেজিআস্টিক্যাল অ্যান্ড সিভিল টলারেশন* [যাজকীয় ও অযাজকীয় সহিষ্ণুতা সম্পর্কে] শীর্ষক একখানা বই প্রকাশ করেছিলেন (১৭৮৩)। এ বই–এ গির্জা ও রাষ্ট্রের এখতিয়ারের মাঝে সুস্পষ্ট রেখা টেনে দেওয়া হয়েছে ; ধর্মীয় নির্যাতন ও ইনকুইজিশনের নিন্দা করা হয়েছে ; মানুষের বিবেকের উপর জবরদস্তিকে খ্রিস্টীয় চেতনাবিরোধী বলে ঘোষণা করা হয়েছে ; এবং এই নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে যে, শাসক শুধু সেই সব ক্ষেত্রে জোর প্রয়োগ করতে পারবেন যেখানে জননিরাপত্তার স্বার্থ জড়িত রয়েছে। লকের মতো এই লেখকও মনে করেছেন, নাস্তিকতা এ ধরনের দমননীতি প্রয়োগের একটি বৈধ ক্ষেত্র।

নেপোলিয়ন ইতালিতে যেসব নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেগুলি বিভিন্ন মাত্রায় সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেছিল। কিন্তু প্রকৃত বিবেকের স্বাধীনতা প্রথম চালু করেন সেখানকার শাসক কাউন্ট কাভুর [১৮১০–১৮৬১] পিএদ্‌মন্ত রাজ্যে (১৮৪৮)। এই পদক্ষেপই পথ প্রস্তুত করে দেয় পরিপূর্ণ মুক্তির, যা ছিল ১৮৭০ সালে ঐক্যবদ্ধ ইতালি রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম ফলগুলির একটি। ইতালির ঐক্য তার সকল অর্থসহ খ্রিস্টীয় গির্জার সনাতনী রীতিনীতির উপর আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণাসমূহের বিজয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে বিশিষ্ট ও নাটকীয় ঘটনা। ঐ রীতিনীতির সবচেয়ে বিশ্বস্ত সংরক্ষক রোম [অর্থাৎ পোপশাসিত ভ্যাটিক্যান গির্জা] উনবিংশ শতকে ইউরোপ জুড়ে উদারপন্থী ধ্যানধারণার যে প্রবাহ চলেছিল তার বিরুদ্ধে এক অবিচল, এমন কি বলা যায় বীরোচিত, প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিল। সুদূর অতীতে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান যা নিজেকে অপরিবর্তনীয়, তথা কখনো যুগের অনুপযোগী নয় বলে দাবি করতো, তার জন্য উদারপন্থী ধ্যানধারণার অর্থ কতো বিপজ্জনক ছিল তা খুব ভালোভাবেই অনুধাবন করেছিলেন রোমের নীতিনিয়ন্ত্রকেরা। কয়েকজন তরুণ ফরাসি ক্যাথলিক (লামেনেই ১৭৮২–১৮৫৪ ও তাঁর বন্ধুরা) সমসাময়িক উদারপন্থী চেতনাদ্বারা গির্জার রূপান্তর ঘটানোর সম্ভাবনাময় ধারণার জন্ম দিয়েছিলেন। তাঁদেরকে ভর্ৎসনা করার উদ্দেশ্যে ১৮৩২ সালে জারিকৃত একটি 'এনাসাইক্লিকাল লেটার' [ব্যাপক প্রচারপত্র]-এ পোপ ষোড়শ গ্রেগরি [১৮৩১–১৮৪৬] এক পুরুণপন্থীর প্রতিবাদ ব্যক্ত করে [বিবেকের] স্বাধীনতার বিরুদ্ধে [গির্জার] কর্তৃত্বকে, এবং আধুনিক আদর্শের বিরুদ্ধে মধ্যযুগীয় আদর্শকে সমর্থন করেন। ঐ পত্রে পোপ "প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বিবেকের স্বাধীনতার ব্যবস্থা করা এবং তার গ্যারান্টি দেয়া উচিত—এই উদ্ভট ও ভ্রান্ত নীতি কিংবা উন্মত্ততার" কঠোর নিন্দা করেন :

> এই মারাত্মক ভ্রান্তির পথ প্রস্তুত হয়েছে চিন্তার এক পরিপূর্ণ ও সীমাহীন স্বাধীনতা দ্বারা, যা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিয়ে গির্জা ও রাষ্ট্রের দুর্ভাগ্য ডেকে আনা হয়েছে এবং কিছু লোক অপরিমিত ধৃষ্টতার সাথে ঐ স্বাধীনতাকে ধর্মের জন্য একটা সুবিধা বলে প্রতিপন্ন করতে সাহসী হচ্ছে। এখান থেকেই আসছে তরুণ সমাজের দূষণ, ধর্ম ও সর্বোচ্চ মর্যাদাশালী আইনের প্রতি অবজ্ঞা এবং পৃথিবীতে এক সাধারণ মানসিক পরিবর্তন—সংক্ষেপে সমাজের সাংঘাতিকতম মারণযন্ত্র ; কারণ ইতিহাসের অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছে, যেসব রাষ্ট্র একদা সম্পদ, শক্তি ও মহিমায় উজ্জ্বল হয়েছিল তারা ধ্বংস হয়েছে এই পাপেই—মতামতের মাত্রাতিরিক্ত স্বাধীনতা, আলাপ-আলোচনার অত্যধিক প্রশ্রয় এবং অভিনবত্বের প্রতি আসক্তি। এর সাথে সম্পর্ক রয়েছে যেকোনো ধরনের যেকোনো লেখা প্রকাশের স্বাধীনতা। এটি একটি মারাত্মক ও জঘন্য স্বাধীনতা যার জন্য আমাদের আতঙ্কের অবধি নেই, যদিও কিছু লোক সরবে ও সোৎসাহে এর জয়ধ্বনি দেয়ার সাহস করে।

এক প্রজন্ম পরে পোপ নবম পায়াস [১৮৪৬–১৮৭৮] *সিলেবাস অব মডার্ন এর‍্যরস* [আধুনিক ভুল-ভ্রান্তির নির্ঘন্ট] (১৮৬৪) নামক অনুরূপ আর একটি ঘোষণাপত্র দিয়ে বিশ্বকে চমকে দিয়েছিলেন। তবুও, খ্রিস্টীয় গির্জার নীতি ও আধুনিক সভ্যতার প্রবাহের মধ্যে মৌলিক বৈরিতা থাকা সত্ত্বেও, পোপতন্ত্র টিকে আছে—যেসব ধ্যানধারণা সে বাতিল করে দিয়েছিল সেগুলি জীবনের অত্যন্ত মামুলি ব্যাপারে পরিণত হয়েছে এমন এক পৃথিবীতেও শক্তি ও সম্মানের সাথেই টিকে আছে।

পনেরো শতকে খ্রিস্টীয় ঐক্যের যে ব্যবস্থার প্রাধান্য ছিল তা থেকে উনিশ শতকে প্রচলিত বিবেকের স্বাধীনতার ব্যবস্থায় পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের যে উদ্বর্তন তা ছিল ধীর ও যন্ত্রণাময়, যুক্তিহীন ও স্থিরতাবিহীন, সাধারণত রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে সংঘটিত, কদাচিৎই সুচিন্তিত প্রত্যয়ের দ্বারা অনুচালিত। আমরা দেখেছি, আইনগত দিক থেকে কিভাবে 'জুরিস্‌ডিক্‌শন' বা আইনের এখতিআর এবং 'সেপারেশন বা ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ—এই দুই স্বতন্ত্র ব্যবস্থায় ধর্মীয় স্বাধীনতা বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু আইনগত সহিষ্ণুতা প্রচুর বাস্তব অসহিষ্ণুতার সাথে একত্রে অবস্থান করতে পারে এবং আইনের চোখে বিবেকের স্বাধীনতার পাশাপাশি ব্যক্তির এমন সব অক্ষমতা থাকতে পারে যেগুলির ব্যাপারে আইন কিছু করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, ধর্মানুগত নয় এমন মতামত প্রকাশের জন্য একজন মানুষের একটি অযাজকীয় চাকরি লাভ অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে, কিংবা তার উন্নতি ব্যাহত হতে পারে। একটি সহনশীল সামাজিক পরিমণ্ডল সৃষ্টির ব্যাপারে ঐ দুই ব্যবস্থার মধ্যে কোন্‌টি বেশি অনুকূল সে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছে। রুফিনি *(রিলিজিয়াস লিবার্টি* [ধর্মীয় স্বাধীনতা]–র উপর লিখিত যাঁর চমৎকার গ্রন্থ আমাকে এ অধ্যায়টি রচনায় প্রচুর সাহায্য করেছে) জুরিস্‌ডিক্‌শনের অনুকূলে রায় দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, যখন চিন্তার স্বাধীনতার একজন সত্যিকার বন্ধু সোশিনাস এই ব্যবস্থার কথা ভেবেছিলেন তখন আনাবাপ্তিস্তরা, যাদের প্রকৃতি ছিল অসহনশীল, চেয়েছিল গির্জা ও রাষ্ট্রর পৃথকীকরণ। আরো গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হচ্ছে এই যে, যেখানে শক্তিশালী গির্জা বা গির্জাসমূহ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে সেই জার্মানি, ইংল্যান্ড ও ইতালিতে গির্জাকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করা হয়েছে এমন অনেক আমেরিকান অঙ্গরাজ্যের চেয়ে বেশি স্বাধীনতা, বেশি ভিন্নমত–সহিষ্ণুতা বিদ্যমান। আজ [১৯১৩] থেকে একশো বছর আগে আমেরিকানরা, যিনি তাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশিষ্ট ভূমিকা রেখেছিলেন, সেই টমাস পেইনের প্রতি ভয়ংকর অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেছিল স্রেফ এই কারণে যে, তিনি একখানি ধর্মনিষ্ঠাবিহীন পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। এই কুখ্যাতি সুবিদিত যে, মুক্তচিন্তা এখনো (১৯১২–১৪) একজন আমেরিকানের জন্য একটা সাংঘাতিক বাধা ও প্রতিবন্ধক, এমনকি অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েও। এতে প্রমাণিত হয় যে ধর্ম থেকে রাষ্ট্রকে পৃথক করাই সহনশীলতা সৃষ্টির অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র নয়। কিন্তু যদি আমেরিকার কেন্দ্রীয় প্রজাতন্ত্র কিংবা অঙ্গরাজ্যগুলি পৃথকভাবে জুরিস্‌ডিক্‌শন প্রথা গ্রহণ করতো, তাহলেও সে দেশের জনমত ভিন্ন হতো এমন মনে করার কোনো কারণ আমি দেখি না। ঐ দুই ব্যবস্থার যেকোনোটির অধীনে আইনগত স্বাধীনতা দেওয়া হলেও আমি বলবো জনমতের প্রতি সহিষ্ণুতা নির্ভর করে সামাজিক অবস্থার উপর, বিশেষত শিক্ষিত শ্রেণীসমূহের মধ্যে সংস্কৃতির মাত্রার উপর।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটা দেখা যাবে যে, রিফর্মেশনের ফলে খ্রিস্টীয় গির্জার সৃষ্ট অনৈক্য যে নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের জন্ম দিয়েছিল তারই ফলস্বরূপ সহনশীলতা এসেছিল। কিন্তু এর অর্থ এই যে, যেসব রাষ্ট্র সহনশীলতা মেনে নিয়েছিল সেখানে শাসকশ্রেণীর অন্তর্গত একটি যথেষ্ট প্রভাবশালী গোষ্ঠীর মনোভাব ঐ পরিবর্তনের জন্য পরিপক্ব হয়েছিল ; আর এই নতুন মানসিক ভঙ্গি এসেছিল রেনেসাঁস আন্দোলনের দ্বারা ছড়িয়ে পড়া সন্দেহবাদ ও যুক্তিবাদ থেকে ; এবং ঐ মনোভাব সূক্ষ্মভাবে ও অজান্তে এমন অনেক মানুষের মনকে প্রভাবিত করেছিল যারা কট্টর গোঁড়া বিশ্বাসসমূহের প্রতি অকপট

শ্রদ্ধাশীল ছিল। সাংকেতিক প্রক্রিয়ার শক্তি এতই কার্যকর। পরের দুই অধ্যায়ে সতেরো, আঠারো ও উনিশ শতকে যুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে ধর্মবিশ্বাসের অবনতির বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

তথ্যনির্দেশ

১. লোক কর্তৃক অনূদিত।

[বিডাল দিয়েছেন ফ্রাঁসোয়া লোকের ফরাসি অনুবাদ। তা থেকে বাংলা ভাষান্তর বর্তমান অনুবাদকের।]

২. ডাচ রিফর্মড চার্চের একজন ধর্মতাত্ত্বিক জ্যাকোবাস আর্মিনিয়াস (১৫৬০–১৬০৯) ক্যালভিনের 'প্রিডেস্টিনেশন' (পূর্বনির্ধারিত ভাগ্য) মতবাদের প্রতিক্রিয়ায় ঘোষণা করেন যে, ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব ও মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা (free will) র সামঞ্জস্য সম্ভব। রিফর্মড ধর্মতত্ত্বের এই আর্মিনীয় প্রকরণ (যা 'আর্মিনিয়ানিজম' নামে পরিচিত ছিল) সতেরো শতকে 'কংগ্রিগেশনালিস্ট' এবং আঠারো শতকে 'মেথডিস্ট'দের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। আর কংগ্রিগেশনালিজমের মূল নিহিত ছিল ষোলো শতকের 'রিমমেশনে' এবং এটি সতেরো শতকে ইংল্যান্ডে বিকাশ লাভ করে।

৩. **অ্যাংগ্লিক্যান (Anglican)** : অ্যাংগ্লিকানিজম (Anglicanism) হচ্ছে একটি সাধারণ অভিধা যা চার্চ অব ইংল্যান্ডের (এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গির্জার) যাজকীয় পদ্ধতি, সংগঠন ও ধর্মনীতি বোঝায়। অ্যাংগ্লিক্যান বলতে অ্যাংগ্লিকানিজমের অনুসারী লোক বা ঐ ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছুকে বোঝায়।

ব্যাপ্টিস্ট (Baptist) : জন ক্যালভিন (১৫০৯–১৫৬৪) প্রচারিত সংস্কারসিদ্ধ খ্রিস্টধর্ম ইংল্যান্ডে 'পিউরিট্যানিজম' [বিশুদ্ধতাবাদ] নামে পরিচিত। সতেরো শতকে পিউরিট্যানিজমের অভ্যন্তরে কংগ্রিগেশনালিজমের একটি প্রশাখা হিসেবে ব্যাপ্টিজমের উদ্ভব ঘটে। ব্যাপ্টিস্টদের মতে কেবলমাত্র প্রাপ্ত বয়স্ক লোককেই ব্যাপ্টাইজ (ধর্মদীক্ষা দান) করা যায়।

কোয়েকার (Quaker) : সতেরো শতকে ইংল্যান্ডে জর্জ ফক্স (১৬২৪–৯১) প্রতিষ্ঠিত 'রিলিজিয়াস সোসাইটি অফ ফ্রেন্ডস' ('ফ্রেন্ডস চার্চ') নামক সম্প্রদায়ের সদস্যদের 'কোয়েকার' বলা হয়। ধর্মীয় আবেগে তাদের শরীরে কাঁপুনি সৃষ্টি হতো বলে নাম হয়ে যায়।

৪. ইনি হচ্ছেন প্রথম ব্যারন অব বাল্টিমোর (Lord Baltimor ১৫৭৮/৭৯–১৬৩২)–এর ছেলে দ্বিতীয় ব্যারন অব বাল্টিমোর (আসল নাম সিসিলিয়াস ক্যালভার্ট–Cecilius Calvert ১৬০৫–১৬৭৫) যিনি পিতার মৃত্যুর পর ম্যারিল্যান্ডের শাসন ক্ষমতায় ছিলেন।

৫. কোএকার উপনিবেশ পেন্‌সিলভ্যানিয়ায় [উইলিয়ম] পেন [১৬৪৪–১৭১৮] ১৬৮২ সালে পূর্ণ সহনশীলতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

৬. বিশেষত চিলিংওয়ার্থের *রিলিজান অফ প্রটেস্ট্যান্টস্* [প্রটেস্ট্যান্টদের ধর্ম] (১৬৩৭), এবং জেরিমি টেইলর [১৬১৩–১৭৬৭]–এর *লিবার্টি অফ প্রফেসিইং* [ভবিষ্যদ্বাণী করার স্বাধীনতা] (১৬৪৬)দ্র.।

৭. ডিসেন্টার্স (Dissenters) : সতেরো শতকের ইংল্যান্ডে যেসব প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান গোষ্ঠী ইংল্যান্ডের সরকারি গির্জা (চার্চ অব ইংল্যান্ড বা অ্যাংগ্লিক্যান চার্চ)–র সাথে ঐকমত্য পোষণ করতো না তারাই 'ডিসেন্টার্স' বা ভিন্নমতাবলম্বী বলে পরিচিত হয়েছিল। এদের মধ্যে ছিল কোয়েকার, প্রেসবাইটারিয়ান, কংগ্রিগেশনালিস্ট, ব্যাপ্টিস্ট, ইউনিট্যারিয়ান প্রমুখ বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং পরবর্তী কালের মেথডিস্টরা।

৮. জন ক্যালভিন ও হ্যালড্রিক ছুইংগ্লি [Zwingli] [১৪৮৪–১৫৩১]–র অনুসারীদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল 'রিফর্মড চার্চ, বা পুনর্গঠিত ধর্মাধিষ্ঠান।

ষষ্ঠ অধ্যায়

যুক্তিবাদের বিকাশ
(সতেরো ও আঠারো শতক)

গত তিনশত বছর [আ. ১৬০০–১৯০০] ধরে যুক্তি ধীরে অথচ অব্যাহতভাবে খ্রিস্টীয় পৌরাণিক কাহিনীকে নস্যাৎ করে এসেছে এবং অতিপ্রাকৃত প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির অলীক দাবির মুখোশ খুলে দিয়েছে। যুক্তিবাদের অগ্রগতির ইতিহাস স্বাভাবিকভাবে দুটি কালপর্বে বিভক্ত। ১. সতেরো ও আঠারো শতকে যেসব চিন্তাবিদ খ্রিস্টীয় ঈশ্বরতত্ত্বকে এবং যে গ্রন্থের উপর তা নির্ভরশীল সেই গ্রন্থকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তাঁরা তা করেছিলেন প্রধানত সাক্ষ্যপ্রমাণে তাঁরা যেসব অসঙ্গতি, বৈপরীত্য, ও অসামঞ্জস্য আবিষ্কার করেছিলেন সেগুলির দ্বারা, তথা ঐ ধর্মমতের নৈতিক সংকটসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক সত্য জানা ছিল যেগুলি ঐশী প্রত্যাদেশের অভ্রান্ততার উপর আলোকপাত করে বলে প্রতীয়মান হতো, কিন্তু বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিতর্ক ছিল গৌণ। ২. উনিশ শতকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহ অতীতের সরল বিশ্বাস ও অজ্ঞানতার যুগে তৈরি বিশ্বাসতন্ত্রের উপর সর্বশক্তি দিয়ে চাপ প্রয়োগ করলো। আর ঐতিহাসিক সমালোচনা পদ্ধতিগতভাবে নস্যাৎ করতে লাগলো ধর্মসংক্রান্ত দলিলাদির কর্তৃত্বকে—যেসব দলিল এত দিন প্রধানত সাধারণ বুদ্ধিভিত্তিক সমালোচনার বিষয় হয়েছিল, যে সমালোচনা ছিল শাণিত কিন্তু কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করতো না।

[ইতিহাসের] প্রকৃত ঘটনাবলী কারো আশা অথবা আশঙ্কা কিংবা ভাগ্যের উপর যে প্রভাবই রেখে থাকুক না কেন, সে দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে ঐ ঘটনাবলীর প্রতি নিঃস্বার্থ আকর্ষণ সকল যুগেই একটি বিরল গুণ, বিশেষত গ্রীস ও রোমের প্রাচীন যুগের পর থেকে এটি অত্যন্ত বিরলই হয়ে গিয়েছিল। [সত্যের প্রতি এই যে নিরাসক্ত আগ্রহ] এর অর্থ বৈজ্ঞানিক চেতনা। এখন আমরা বলতে পারি যে, সতেরো শতকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আধুনিক চর্চা শুরু হয়, এবং ঐ একই সময়ে আমরা একদল বিখ্যাত চিন্তাবিদকে পাই যাঁরা বিশ্বাসকে উচ্চতর মননবৃত্তি বলে ধরে নেননি।

পর্যায়ক্রমে যুক্তির প্রভাব বৃদ্ধির একটি লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হলো ডাকিনীবিদ্যা সম্পর্কে নিঃশব্দে ঘটে যাওয়া পরিবর্তন। "তোমরা কোনো ডাইনির জীবিত থাকাকে বরদাশত করবেনা"—বাইবেলের এই নির্দেশ কার্যকর করার জন্য ব্রিটেনের রাজা প্রথম জেম্‌স [রাজ. ১৬০৩–১৬২৫]–এর কুখ্যাত তৎপরতাকেও হার মানিয়েছিল 'শয়তানের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী' দুষ্ট বুড়িদের দমন করার জন্য 'কমনওয়েলথ' আমলে [১৬৪৯–১৬৬০] পিডরিট্যানদের অতি উৎসাহ। 'রেস্টোরেশন' [স্টুআর্ট রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা–১৬৬০]–এর পরে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ডাকিনীবিদ্যায় বিশ্বাস কমে যেতে থাকে—(যদিও কয়েকজন

শক্তিমান লেখক এটি ধরে রাখেন)—এবং ডাইনি হত্যার ঘটনা প্রায় ঘটেনি বললেই চলে। সর্বশেষ ডাইনির বিচার হয়েছিল ১৭১২ সালে, যখন হার্টফোর্ডশায়ারে কতিপয় যাজক জেন ওয়েনহ্যাম নাম্নী এক মহিলার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু করেছিলেন। জুরি তাকে দোষী সাব্যস্তও করেছিল, কিন্তু বিচারক অভিযুক্তার পক্ষে সিদ্ধান্ত দিয়ে তার সাজা মকুব করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরপর ১৭৩৫ সালে ডাইনিবিরোধী আইনই বাতিল হয়ে যায়। জন ওয়েসলি অত্যন্ত খাঁটি কথাই বলেছিলেন যে, ডাকিনীবিদ্যায় বিশ্বাস হারানো মানে বাইবেলে বিশ্বাস হারানো। শয়তানের কাজকর্মের এই বিশেষ ধরনটির ব্যাপারে বিশ্বাস ও আগ্রহ ফ্রান্স ও হল্যান্ডে একই সময়ে হ্রাস পায়। স্কটল্যান্ডে ধর্মতত্ত্বের জবরদস্ত প্রভাব ছিল এবং সেখানে ১৭১৭ সালেও এক মহিলাকে [ডাইনি বলে] পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। যে যুগে আধুনিক বিজ্ঞান ও আধুনিক দর্শনের উত্থান ঘটে সেই একই যুগে ঐ কুসংস্কারটিও সবখানেই দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে—এ ঘটনা নেহাত কাকতালীয় হতে পারে না।

সতেরো শতকের ইংরেজ চিন্তাবিদদের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে প্রতিভাধর টমাস হব্‌স্ [১৫৮৮–১৬৭৯] ছিলেন একজন মুক্তচিন্তা চর্চাকারী ও বস্তুবাদী। তাঁর উপর প্রভাব পড়েছিল তার বন্ধু ফরাসি দার্শনিক পিয়্যার গাসেন্দি [১৫৯২–১৬৫৫]-র যিনি বস্তুবাদকে তার আপাতকঠোর স্বরূপে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। তথাপি হব্‌স বিবেকের স্বাধীনতার প্রবক্তা ছিলেন না, ছিলেন চরম আপোসহীন ধরনের দমননীতির সমর্থক। *লেভিআথান* [সমুদ্র দানব] গ্রন্থে তিনি যে রাজনৈতিক তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন তাতে অন্য সকল ক্ষেত্রের মত ধর্মীয় মতবাদের ক্ষেত্রেও রাজার স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা আছে এবং রাজা কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া ধর্মমতের সাথে একাত্ম হওয়া প্রজাবৃন্দের কর্তব্য। এভাবে ধর্মীয় জবরদস্তি সমর্থিত হয়েছে, কিন্তু গির্জার কোনো স্বাধীন ক্ষমতা আর রাখা হয়নি। তবে যেসকল নীতির উপর হব্‌স তাঁর তত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন সেগুলো ছিল যুক্তিভিত্তিক। তিনি ধর্ম থেকে নৈতিকতাকে পৃথক করে "সঠিক নৈতিক দর্শন"–কে "প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর সঠিক তত্ত্বে"র সাথে অভিন্ন বলে শনাক্ত করেন। ধর্ম সম্পর্কে আসলে তিনি কি ভাবতেন তা অনুমান করা যায় তাঁর এই মন্তব্য থেকে যে, (অজ্ঞতাবশত) অদৃশ্য বস্তুর প্রতি যে কাল্পনিক ভয় সেটিই হচ্ছে ঐ অনুভূতির উৎস, যে অনুভূতিকে মানুষ নিজের ক্ষেত্রে বলে ধর্ম, আর যারা ঐ অদৃশ্য শক্তিকে ভিন্নভাবে ভয় বা ভক্তি করে তাদের ক্ষেত্রে বলে কুসংস্কার। দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে [১৬৬০–১৬৮৫] হব্‌সের কণ্ঠরোধ করা হয় এবং তাঁর লেখা বইগুলি পুড়িয়ে ফেলা হয়।

হল্যান্ডের ইহুদি জাতীয় দার্শনিক স্পিনোজা [১৬৩২–৭৭] দেকার্তের কাছে এবং (রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে) হব্‌সের কাছে যথেষ্ট ঋণী ছিলেন, কিন্তু তাঁর দর্শনের অর্থ ছিল অধিষ্ঠিত ধর্মমত থেকে আরো অনেক প্রশস্ত এবং আরো উন্মুক্ত এক বিচ্ছিন্নতা, যার উদ্যোগ নিতে তাঁর গুরুদ্বয়ের কেউ সাহসী হননি। তাঁর ধারণায় চরম সত্য, যাকে তিনি 'ঈশ্বর' বলতেন, তা ছিল নিশ্চিতরূপে সম্পূর্ণ এক *নৈর্ব্যক্তিক* সত্তা, একটি সারতত্ত্ব, যার প্রকৃতি দুটি 'গুণ' নিয়ে গঠিত—চৈতন্য ও স্থানিক বিস্তার। স্পিনোজা মনে করতেন ঈশ্বরপ্রেমই সুখ ; তবে ঈশ্বরপ্রেম বলতে তিনি বুঝতেন স্থির ও অপরিবর্তনীয় নিয়মাধীন বিশ্বপ্রকৃতিতে (মনুষ্য প্রকৃতিসহ) বিদ্যমান শৃঙ্খলা সম্পর্কিত জ্ঞান ও ধ্যান। তিনি স্বাধীন ইচ্ছা (free will) এবং বিশ্ব প্রকৃতিতে চূড়ান্ত কারণ (final cause)–এর ধারণা (যাকে তিনি 'কুসংস্কার' বলেছেন) প্রত্যাখ্যান করেন। যদি আমরা তাঁর দর্শনে লেবেল আঁটতে চাই

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, এটি এক ধরনের সর্বেশ্বরবাদ। একে প্রায়ই নিরীশ্বরবাদ atheism বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আমি অনুমান করি, প্রচলিত ব্যবহারে সাধারণভাবে ধরে নেয়া হয় যে নিরীশ্বরবাদ মানে ব্যক্তি ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করা। এই অর্থ সঠিক হলে স্পিনোজা একজন নিরীশ্বরবাদী। এখানে বলা দরকার, সতেরো ও আঠারো শতকে মুক্তচিন্তার অধিকারীদেরকে গালি দিতে নিরীশ্বরবাদী কথাটি অত্যন্ত অসংযতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই যখন আমরা নিরীশ্বরবাদীদের সম্পর্কে পড়ি (সতর্ক লেখকদের লেখায় ব্যতীত) তখন আমরা সাধারণভাবে ধরে নিতে পারি যে, যেসব ব্যক্তিকে এভাবে অপবাদ দেয়া হয়েছে তাঁরা প্রকৃত পক্ষে ছিলেন ডিইস্ট বা ঈশবাদী ; অর্থাৎ তাঁরা একজন ব্যক্তি–ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন কিন্তু প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করতেন না।[১]

স্পিনোজার দুঃসাহসী দর্শন সমকালের দার্শনিক ভাবনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না এবং তা অনেক পরবর্তী যুগের আগে [ইউরোপের] চিন্তাধারার উপর কোনো গভীর প্রভাব ফেলতে পারেনি। যে চিন্তাবিদের লেখা তাঁর যুগের মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশি আবেদন রাখতে পেরেছিল এবং সর্বাপেক্ষা সময়োচিত ও কার্যকর হয়েছিল, তিনি ছিলেন জন লক [১৬৩২–১৭০৪], যিনি মোটামুটি নৈষ্ঠিক অ্যাংগ্লিক্যানিজ্‌ম অনুসরণ করতেন। দর্শনে তাঁর বিরাট অবদান [ধর্মীয়] কর্তৃত্বের অন্যায় দখলদারির বিরুদ্ধে যুক্তিকে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা দেওয়ার সমতুল্য। সকল জ্ঞান অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত—এটি প্রদর্শন করাই ছিল লকের *এসে অন দ্য হিউম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং* [মানবীয় বোধশক্তি সংক্রান্ত নিবন্ধ] (১৬৯০) গ্রন্থের লক্ষ্য। [ঐ গ্রন্থে] তিনি বিশ্বাসকে সম্পূর্ণরূপে যুক্তির অধীন করেছেন। যদিও তিনি খ্রিস্টীয় প্রত্যাদেশ তত্ত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তিনি মনে করতেন, প্রত্যাদেশ যদি যুক্তির উচ্চতর বিচারের বিরুদ্ধে যায় তাহলে তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে। তাঁর আরো ধারণা ছিল, যুক্তি যেমন সন্দেহাতীত জ্ঞান দান করে তেমন নিশ্চিত জ্ঞান প্রত্যাদেশ আমাদেরকে দিতে পারে না। তাঁর ভাষায়,

> যে ব্যক্তি প্রত্যাদেশের জায়গা করে দেওয়ার জন্য যুক্তিকে সরিয়ে নেয় সে ঐ দুই বস্তু থেকেই আলো নিবিয়ে ফেলে ; এবং এক অদৃশ্য তারকার দূরাগত আলো টেলিস্কোপে গ্রহণ করার নিমিত্ত কোনো মানুষকে তার নিজের চোখ তুলে ফেলতে রাজী করানোর মতো প্রায় একই ধরনের কাজ সে করে।

খ্রিস্টীয় প্রত্যাদেশ যে যুক্তিবিরোধী নয় তা দেখানোর জন্য লক একটি বই লিখেছিলেন ; এবং ঐ বই–এর শিরোনাম—*দ্য রিজনেবলনেস অফ ক্রিশ্চিঅ্যানিটি* [খ্রিস্টধর্মের যৌক্তিকতা]—পরবর্তী একশো বছর যাবৎ ইংল্যান্ডে চলতে থাকা সকল ধর্মীয় বিতণ্ডার মূল সুর ধ্বনিত করে। নিষ্ঠাবান ধার্মিকবর্গ তথা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা উভয় পক্ষই সোৎসাহে মেনে নিলেন যে যৌক্তিকতাই হলো প্রত্যাদিষ্ট ধর্মের দাবিগুলোর একমাত্র পরীক্ষা। লকের প্রত্যক্ষ প্রভাবে রোমান ক্যাথলিসিজ্‌ম থেকে [অ্যাংগ্লিক্যানিজ্‌মে] ধর্মান্তরিত আইরিশ লেখক জন টোল্যান্ড [১৬৭০–১৭২২] *ক্রিশ্চিঅ্যানিটি নট মিস্টেরিয়াস* [খ্রিস্টধর্ম রহস্যমূলক নয়] (১৬৯৬) নামে একখানি উত্তেজক পুস্তক রচনা করলেন। তিনি ধরে নিয়েছেন যে, খ্রিস্টধর্ম সত্য এবং এই বলে যুক্তি দেখিয়েছেন যে এতে কোনো রহস্য থাকতে পারে না, কারণ রহস্য, অর্থাৎ অবুদ্ধিগ্রাহ্য অন্ধবিশ্বাস যুক্তিদ্বারা গ্রহণীয় হতে পারে না। আর যদি কোনো যৌক্তিক দেবসত্তা কোনো প্রত্যাদেশ দিয়ে থাকেন, তার উদ্দেশ্য অবশ্যই জ্ঞানের আলো দান করা, ধাঁধায় ফেলে

দেওয়া নয়। খ্রিস্টধর্মের সত্যতা মেনে নেওয়া যে একটি ছলমাত্র তা বুঝতে একজন বুদ্ধিমান পাঠকের ব্যর্থ হওয়া অসম্ভব ছিল। পুস্তকখানি গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে এটি লকের দর্শন থেকে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত টেনেছিল এবং বইটির ব্যাপক প্রচারও হয়েছিল। লেডি ম্যারি ওয়ার্টলি মন্ট্যাগু [১৬৮৯–১৭৬২] বেলগ্রেডে এক তুর্কি এফেন্দির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন যিনি তাঁর কাছে মি. টোল্যান্ডের খবর জানতে চেয়েছিলেন।

যুক্তি ও [ধর্মীয়] কর্তৃত্বের মধ্যে দ্বন্দ্বের এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, (আঠারো শতকের প্রধান প্রধান ফরাসি চিন্তাবিদ ব্যতীত) অন্যান্য যুক্তিবাদী যাঁরা ধর্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই তাঁদের আক্রমণের লক্ষীভূত ধ্যান–ধারণাগুলোর সত্যতা স্বীকার করে নেয়ার ভান করতেন। তাঁরা মিছামিছি দাবি করতেন যে তাঁদের [দার্শনিক] অনুমানগুলো ধর্মের উপর কোনো [ক্ষতিকর] প্রভাব ফেলেনি ; তাঁরা যুক্তি ও বিশ্বাসের অঙ্গন পৃথক করতে পারতেন ; তাঁরা দেখাতে পারতেন যে, প্রত্যাদেশ প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়ে পড়ে যদি তার সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা না হয় ; তাঁরা অধিষ্ঠিত ধর্মের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেও এমন সব মত ব্যক্ত করতে পারতেন যেগুলোর সাথে অধিষ্ঠিত ধর্মের সমন্বয় হওয়া অসম্ভব ছিল। যুক্তির এলাকাতে তাঁরা যেসব ভ্রান্তি প্রদর্শন করতেন, ধর্মতত্ত্বের আঙিনায় সেগুলোকেই আবার শ্লেষভরে সত্য বলে প্রতিপন্ন হতে বাধা দিতেন না। দ্বৈত সত্যের মধ্যযুগীয় নীতি এবং অন্যান্য কৌশল অবলম্বন করা হতো অধিষ্ঠিত ধর্মের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে, যদিও সেগুলো সবসময় কাজে আসতো না। আর এ যুগের যুক্তিবাদী রচনার অধিকাংশের পঠনকালে আমাদেরকে পংক্তির ফাঁকে ফাঁকে পড়তে হবে। এ বিষয়ে পিয়্যার বেইল [১৬৪৭–১৭০৬] হচ্ছেন একটি আকর্ষণীয় দৃষ্টান্ত।

[ধর্মীয়] কর্তৃত্বকে তার সঠিক জায়গায় স্থাপন করে এবং অভিজ্ঞতা থেকে সমস্ত জ্ঞান আহরণ করে লকের দর্শন যুক্তিবাদের একটি শক্তিশালী সহায় হয়েছিল। তাঁর সমকালীন বেইল ইতিহাস অনুসন্ধানের মাধ্যমে ঐ একই লক্ষ্যে কাজ করেছিলেন। ফ্রান্স থেকে বিতাড়িত হয়ে (পৃ. ৫১ দ্র.) তিনি আম্স্টার্ডামে গিয়ে বাস করেন এবং সেখানে প্রকাশ করেন *ফিলসফিক্যাল ডিক্শনারি* [দার্শনিক অভিধান]। তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত মুক্তচিন্তা চর্চাকারী, কিন্তু কখনো নৈষ্ঠিক ধার্মিকতার ছদ্মবেশ ত্যাগ করেননি এবং এটিই তাঁর কাজকে একটি বিশেষ কৌতূহলের বস্তু করেছে। খ্রিস্টধর্মের মূল বিশ্বাসগুলির বিরুদ্ধে অতীতের ধর্মদ্রোহীরা যেসব অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন তার সবগুলি একত্র সাজাতে তিনি আনন্দ পেতেন। রাজা ডেভিডের অপরাধ ও নিষ্ঠুর কাজগুলোকে তিনি নির্মমভাবে প্রকাশ করে দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রিয় এই ব্যক্তিটি এমন একজন লোক ছিলেন যাঁর সাথে করমর্দন করতে যে–কেউ অস্বীকার করবে। এই মর্যাদাহানিকর সত্য ভাষণের সাথে সাথে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। প্রত্যুত্তরে মঁতেইন [১৫৩৩–১৫৯২] ও পাস্কালের দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে বেইল ধর্মবিশ্বাসকে যুক্তির বিপরীতে স্থাপন করেন।

তিনি বলতেন, একমাত্র ঈশ্বরকে প্রমাণ জেনে প্রত্যাদিষ্ট সত্যে বিশ্বাস করার মধ্যেই বিশ্বাসের ধর্মতান্ত্রিক মূল্য নিহিত। যদি তুমি দার্শনিক কারণে আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করো, তাহলে তুমি নৈষ্ঠিক, কিন্তু সে ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাসে তোমার কোনো অংশ থাকছে না। প্রত্যাদিষ্ট সত্য আমাদের সকল মানসিক শক্তিকে যতোটা অতিক্রম করতে পারে, ধর্মবিশ্বাস ঠিক

ততোটাই মহত্তর হয়। ঐ সত্য যতো বেশি দুর্বোধ্য এবং যুক্তিবিরুদ্ধ হয়,সেটিক গ্রহণ করতে আমরা ততোটা বৃহত্তর ত্যাগ স্বীকার করি, ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন আমাদের ততোটাই গভীরতর হয়। সুতরাং, মৌল ধর্মনীতির বিরুদ্ধে যুক্তির যতো অভিযোগ আছে সেগুলির একটি নির্মম তালিকা ধর্মবিশ্বাসের উৎকর্ষ তুলে ধরার কাজ করে।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করতেন এমন সব ব্যক্তির নৈতিক মহত্ত্বের প্রতি সুবিচার করার জন্যও বেইলের *ডিক্‌শনারির* সমালোচনা হয়েছিল। জবাবে বেইল বলেছিলেন, যদি তিনি এমন নিরীশ্বরবাদী ভাবুকদের খোঁজ পেতে সক্ষম হতেন যাঁরা অসৎ জীবন যাপন করতেন, তাহলে সানন্দেই তিনি তাঁদের অসৎ কাজের বিস্তারিত বিবরণ দিতেন, কিন্তু তেমন কারো কথা তাঁর গোচরে আসেনি। ইতিহাসে সব অপরাধীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাদের জঘন্য কাজকর্মের কথা শুনে মানুষ কম্পিত হয়, তাদের সম্পর্কে বক্তব্য এই যে তাদের অধার্মিকতা ও ঈশ্বরনিন্দা প্রমাণ করে যে তারা জনৈক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতো। এ হচ্ছে—যে শয়তান নিরীশ্বরবাদী হতে সক্ষমই নয়, সে-ই মানুষের সকল পাপের প্ররোচক—ধর্মশাস্ত্রের এই তত্ত্বটির স্বাভাবিক পরিণতি। কারণ, মানুষের পাপিষ্ঠতা অবশ্যই শয়তানের পাপিষ্ঠতার অনুরূপ হতে হবে, এবং অতএব তাকে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের সাথে, যেহেতু শয়তান কোনো নিরীশ্বরবাদী নয়। জঘন্যতম অপরাধীরা কেউ নিরীশ্বরবাদী নয় এবং ইতিহাসে নাম লেখা আছে এমন নিরীশ্বরবাদীদের অধিকাংশই সৎ লোক ছিলেন—এটি কি ঈশ্বরের অপরিসীম প্রাজ্ঞতার প্রমাণ নয়? এই ব্যবস্থা করে নিয়তি মানুষের দুর্নীতির সীমারেখা ঠিক করে দিয়েছে ; কারণ নিরীশ্বরবাদ ও নৈতিক দুর্বৃত্তি যদি অভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে মিলিত হত, তাহলে পৃথিবী এক সর্বনাশা পাপবন্যায় ভেসে যেত।

একই ধরনের আরো অনেক কিছু ছিল ; এবং ধর্মের সেবা করার হালকা পর্দার আড়ালে লেখকের আসল লক্ষ্য ছিল দেখিয়ে দেওয়া যে খ্রিস্টীয় বদ্ধবিশ্বাসগুলো মূলত অযৌক্তিক।

পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ বিদ্যাবত্তায় সমৃদ্ধ বেইলের বইখানির বিরাট প্রভাব ছিল ইংল্যান্ডে ও ফ্রান্সে। এটি দু'দেশেই খ্রিস্টধর্মের শত্রুদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করেছিল। প্রথমে দুরন্ত তেজ ও দক্ষতার সাথে আক্রমণ চালিয়েছিলেন ইংরেজ ঈশবাদীরা। যদিও এখন তাঁদের রচনা কেউ বড় একটা পড়ে না, কিন্তু প্রত্যাদিষ্ট ধর্মের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে তর্কসমৃদ্ধ লেখা লিখে তাঁরা স্মরণীয় কাজ করে গেছেন।

ঈশবাদী ও তাঁদের নৈষ্ঠিক খ্রিস্টান প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে বিতর্ক [শেষ পর্যন্ত] এই প্রশ্নে গিয়ে ঠেকলো যে, স্বাভাবিক ধর্মের ঈশ্বর, যাঁর অস্তিত্ব যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করা যায় বলে মনে করা হতো, তিনি খ্রিস্টীয় প্রত্যাদেশ প্রণেতার সাথে অভিন্ন হতে পারেন কি না। ঈশবাদীদের কাছে এটি ছিল অসম্ভব। [কারণ] কথিত প্রত্যাদেশের প্রকৃতি যুক্তিসূচিত ঈশ্বরের চরিত্রের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। প্রত্যাদেশের সমর্থকরা, অন্তত তাঁদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন তাঁরা সকলে, ঈশবাদীদের সাথে একমত হয়ে যুক্তিকে সর্বোচ্চ স্থান দিলেন এবং যুক্তির উপর এই নির্ভরতার কারণে তাঁদের কেউ কেউ ধর্মদ্রোহে জড়িয়ে পড়লেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাঁদের ভেতর দক্ষতমদের একজন হয়েও স্যামুএল ক্লার্ক [১৬৭৫–১৭২৯] ত্রিত্ববাদের ডগম্যাটির ব্যাপারে খুবই অনিশ্চিত ছিলেন। এও লক্ষণীয় যে উভয় গোষ্ঠীর কাছেই নৈতিকতার স্বার্থটি ছিল প্রধান প্রেরণা। নিষ্ঠাবান ধার্মিকেরা বিশ্বাস করতেন যে ভবিষ্যতের পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে প্রত্যাদিষ্ট নীতিমালা নৈতিকতার জন্য প্রয়োজনীয়।

[অপরপক্ষে] ঈশবাদীরা মনে করতেন যে নৈতিকতা একমাত্র যুক্তির উপরই নির্ভরশীল এবং প্রত্যাদেশের মধ্যে এমন অনেক কিছুই রয়েছে যা নৈতিক আদর্শমালার পরিপন্থী। গোটা আঠারো শতক জুড়ে অ্যাংগলিক্যান যাজকদের প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল নৈতিকতা। ফলে, বিশ্বাস মধ্যে সন্তুষ্টি না মেলায় ধর্মীয় আবেগ বলতে গেলে বিতাড়িত হয়ে বাইরে গিয়ে ওস্‌লি [১৭০৫–১৭৬৬] ও জর্জ হোয়াইটফিল্ড [১৭১৪–১৭৭০]–এর মেথডিজ্‌মের[২] মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশের পথ খুঁজতে থাকে।

স্পিনোজা নীতি পরিবর্তন করেছিলেন যে, ধর্মগ্রন্থকে অন্য যেকোনো বই–এর মতোই ব্যাখ্যা করতে হবে (১৬৭০)[১] এবং ঈশবাদীদের কাছে এটি ছিল অপরিহার্য নীতি। নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য তারা সাধারণত তাদের সিদ্ধান্তগুলোকে যথেষ্ট হালকা ছদ্মাবরণে ঢেকে রাখতেন। পরে দিন পর্যন্ত 'প্রেস লাইসেন্সিং অ্যাক্ট' [মুদ্রণ অনুমোদন আইন] (১৬৬২) অত্যন্ত কার্যকরভাবে ধর্মবিরোধী রচনাবলীর প্রকাশ রুদ্ধ করে রেখেছিল এবং অবিশ্বাসীদের মতামতকে প্রত্যাখ্যান করে লেখা গোড়া ধার্মিকদের রচনা থেকেই আমরা জানতে পারি যুক্তিবাদ কি স্থান লাভ করেছিল। কিন্তু ১৬৯৫ সালে ছাপাখানা আইনটি বাতিল করা হয় এবং সাথে সাথে ঈশবাদী সাহিত্য প্রকাশিত হতে শুরু করে। তবে ব্ল্যাসফিমি [ঈশ্বরনিন্দামূলক, ধর্মদ্রোহ আদেশ-এর] আইনে অভিযুক্ত হওয়ার বিপদ ছিল। যারা খ্রিস্টধর্মকে আক্রমণ করতো তাদেরকে দমন করার জন্য তিনটি অস্ত্র ছিল : ১. নিরীশ্বরবাদিতা, ধর্মনিন্দা, ধর্মত্যাগ এবং সাহিত্য মতামতের জন্য সর্বোচ্চ ছ'মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড দেয়ার ক্ষমতা ধর্মীয় আদালতগুলোর ছিল এবং আছে। ২. সাধারণ আইন—যেমনটি ব্যাখ্যা করেছিলেন লর্ড চীফ জাস্টিস [প্রধান বিচারপতি] স্যার ম্যাথ্যু হেল [১৬০৯–১৬৭৬] ১৬৭৬ সালে, যখন জনৈক টেলরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল যে, সে ধর্মকে বলেছে প্রতারণা এবং যীশু খ্রিস্টের বিরুদ্ধে কটূক্তি করেছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অর্থদণ্ড ও শাস্তিস্তম্ভে (pillory) যন্ত্রণা দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন ঐ বিচারক, যিনি রায়ে বলেছিলেন যে এ ধরনের মামলার বিচার করার অধিকার রাজকীয় বেঞ্চ আদালতের আছে, কারণ এরকম ধর্মনিন্দামূলক উক্তি আইন ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ এবং খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলা মানে আইনের ক্ষতিসাধনের জন্য কথা বলা, কেননা খ্রিস্টধর্ম "ইংল্যান্ডের আইনের অঙ্গবিশেষ"। ৩. ১৬৯৮ সালের স্ট্যাটিউট আইনে বিধান রাখা হয় যে, খ্রিস্টধর্মে শিক্ষাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি যদি "লেখন, মুদ্রণ, শিক্ষাদান, বা ভেবে চিন্তে দেওয়া ভাষণ দ্বারা পবিত্র ত্রীশ্বর (Trinity)–এর যেকোনো জনের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করে, অথবা একের বেশি দেবতা আছে বলে মানে বা দাবি করে, কিংবা খ্রিস্টধর্মের সত্যতা অস্বীকার করে, অথবা পুরাতন ও নূতন নিয়মের অন্তর্গত পবিত্র ধর্মপুস্তকসমূহকে ঈশ্বরপ্রণীত বলে মান্য না করে এবং অপরাধী সাব্যস্ত হয়, তাহলে প্রথমবার অপরাধের জন্য সে সরকারি পদ বা নিয়োগের জন্য অযোগ্য ঘোষিত হবে এবং দ্বিতীয়বার অপরাধ করলে সে তার নাগরিক অধিকার হারাবে ও তিন বছরের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করবে। আইনটিতে এর মূল প্রেরণা স্পষ্ট করে বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, "বিগত বছরগুলোতে অনেক লোক খ্রিস্টধর্মের নীতি ও উপদেশাবলীর পরিপন্থী, ঈশ্বরনিন্দামূলক ও অধার্মিক বহু মতামত প্রকাশ্যে ঘোষণা তথা ছাপিয়ে প্রকাশ করেছে।"

প্রকৃতপক্ষে ধর্মনিন্দা সংক্রান্ত যেসব বিচার গত দু'শো বছরের মধ্যে [অর্থাৎ আঠারো ও উনিশ শতকে] অনুষ্ঠিত হয়েছে তার অধিকাংশই ঐ দ্বিতীয় শিরোনামের আওতায় পড়ে। কিন্তু ১৬৯৮ সালের নতুন আইনটি অত্যন্ত ভীতিকর ছিল এবং আমরা সহজেই বুঝতে পারি কিভাবে এটি বিরুদ্ধবাদী লেখকদেরকে বাধ্য করেছিল নানা রহস্যময় ছদ্মাবরণ গ্রহণ করতে।

এসব ছদ্মাবরণের মধ্যে একটি ছিল ধর্মগ্রন্থের রূপকাশ্রিত ব্যাখ্যা দান। তাঁরা দেখালেন যে, আক্ষরিক অর্থ করলে নানা অসমাঞ্জস্য কিংবা ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা ও ন্যায় বিচারের সাথে অসংগতির সম্মুখীন হতে হয়। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ভান করেন যে, প্রতিকল্প হিসেবে অবশ্যই রূপক ব্যাখ্যার পথ গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু তাঁরা চাইতেন পাঠক তাঁদের চাতুরিপূর্ণ সমাধান প্রত্যাখ্যান করুক এবং প্রত্যাদেশের জন্য ক্ষতিকর সিদ্ধান্তে আসুক।

প্রত্যাদেশের অভ্রান্ততার অনুকূলে ব্যবহৃত যুক্তিতর্কের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য ছিল বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী ফলে যাওয়ার ব্যাপারটি এবং বাইবেলের 'নতুন নিয়মে' বর্ণিত অলৌকিক ঘটনাবলীর কথা। অ্যান্থনি কলিন্স নামে লকের শিষ্য এক গ্রাম্য ভদ্রলোক ১৭৩৩ সালে[৪] তাঁর *ডিস্‌কোর্স অন দ্য গ্রাউন্ডস অ্যান্ড রিজন্‌স অব দ্য ক্রিশ্চিআন রিলিজ্যন* [খ্রিস্টধর্মের ভিত্তি ও যুক্তি সম্পর্কিত আলোচনা] প্রকাশ করেন। এতে তিনি একেবারে পরিস্কার করে ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হওয়ার প্রমাণগুলোর দুর্বলতা দেখিয়ে দেন—কিভাবে সেগুলো অস্বাভাবিক ও আলংকারিক ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল। কুড়ি বছর আগে তিনি লিখেছিলেন *ডিস্‌কোর্স অফ ফ্রি-থিংকিং* [মুক্ত চিন্তা সম্পর্কিত আলোচনা] (যাতে বেইলেই প্রভাব স্পষ্ট)। সেখানে তিনি মুক্ত আলোচনার পক্ষে এবং সকল ধর্মীয় প্রশ্নকে যুক্তির মুখোমুখী দাঁড় করানো পক্ষে কথা বলেছিলেন। তিনি অভিযোগ করেছিলেন সার্বিক অসহিষ্ণুতার, যা সে সময় প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। কিন্তু যেসব ঘটনা অসহিষ্ণুতার সাক্ষ্য দেয় সেগুলিই আবার অবিশ্বাস বিস্তারলাভের সাক্ষ্যও বহন করে।

কলিন্স তুলনামূলকভাবে শাস্তি ছাড়াই নিস্কৃতি পেয়েছিলেন, কিন্তু কেমব্রিজের সিড্‌নি সাসেক্‌স কলেজের ফেলো টমাস উল্‌স্টন [১৬৭০–১৭৩৩] ছ'খানি আক্রমণাত্মক *ডিস্‌কোর্সেস অন দ্য মিরাক্‌ল্‌স অফ আউআর সেইভিআর* [আমাদের ত্রাণকর্তার অলৌকিক ঘটনাবলী সম্পর্কিত বিবিধ আলোচনা] (১৭২৭–১৭৩০) লিখে তাঁর ঔদ্ধত্যের খেসারত দিয়েছিলেন। তাঁর ফেলোশিপ কেড়ে নেয়া ছাড়াও মানহানিকর রচনার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালানো হয় এবং বিচারে তাঁর ১০০ পাউণ্ড জরিমানা ও এক বছরের কারাদণ্ড হয়। জরিমানার টাকা পরিশোধ করতে না পেরে তিনি কারাগারেই মৃত্যুবরণ করেন। অলৌলিক ঘটনাবলী অবিশ্বাস্য বা অসম্ভব—এই লাইনে তিনি তর্ক করেননি। গস্‌পেলে বর্ণিত প্রধান প্রধান অলৌকিক ঘটনা পরীক্ষা করে তিনি অসাধারণ দক্ষতা ও সুচতুর কাণ্ডজ্ঞানের সাথে দেখিয়ে দেন যে, সেগুলো বেখাপ্পা অথবা তাদের সংঘটকের পক্ষে অশোভন। তিনি উল্লেখ করেন, যেমনটা টমাস হাক্‌স্‌লি [১৮২৫–১৮৯৫] করেছিলেন গ্ল্যাডস্টোনের সাথে এক বিতর্কে, যে ভূতপ্রেতদেরকে অলৌকিকভাবে একটা শূকরের পালের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া মানে অধিকার বহির্ভূতভাবে কোনো ব্যক্তির সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করা। ঐশী ক্ষমতাবলে ফুঁ দিয়ে ডুমুর গাছ জ্বালিয়ে দেওয়ার কাহিনী সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন :

> যদি কেন্টের একজন কৃষক ইস্টারের সময় (যে সময়ে যীশু এই ডুমুরের খোঁজ করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়) তার বাগানে আপেল খুঁজতে যায় এবং না পেয়ে গাছগুলো কেটে ফেলে তাহলে কি হবে? তাঁর প্রতিবেশীরা তখন তাকে নিয়ে কি করবে? হাস্যাস্পদের চেয়ে কম কিছু হবে না সে। আর যদি গল্পটা আমাদের গণমাধ্যমে পৌঁছে যায় তাহলে লোকটা গোটা মানব জাতির ঠাট্টা ও উপহাসের পাত্র হবে।

অথবা ধরা যাক 'বেথেস্‌দার পুকুর' এর অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে উল্‌স্টনের মন্তব্যের কথা। বেথেস্‌দার পুকুরের জলে আলোড়ন সৃষ্টি করতো এক দেবদূত এবং যে লোকটি প্রথম ঐ পুকুরে নামে তার শারীরিক বৈকল্য সেরে যায়।

> ঐশ্বরিক দয়া প্রকাশের এটা এক অদ্ভুত ও মজাদার উপায়। এবং যেকোনো লোক ভাবতে পারেন যে, ভগবানের দূতেরা কাজটি করেছিলেন মানুষের উপকারের জন্য যতোটা না, তার চেয়ে বেশি নিজেরা আমোদলাভের জন্য। যেমন কেউ কেউ একদল শিকারি কুকুরের খোঁয়াড়ে এক টুকরো হাড় ফেলে দেয় সেটির জন্য কুকুরগুলোর কামড়াকামড়ি দেখে মজা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ; অথবা অন্য কেউ কেউ এক দঙ্গল বালকের মধ্যে একটা টাকা ছুড়ে দেয় সেটির জন্য ছেলেগুলোর ধস্তাধস্তি দেখে আনন্দ পেতে, ঠিক তেমনই ছিল এক্ষেত্রে দেবদূতদের চিত্তবিনোদনের খেলা।

এটি উল্‌স্টনের ভাষ্য। রক্তক্ষরণে ভুগতে থাকা এক মহিলার আরোগ্য লাভের ঘটনা নিয়ে বলতে গিয়ে উল্‌স্টন প্রশ্ন রাখেন :

> যদি আমাদেরকে বলা হতো যে এ রকম একটি রক্তক্ষরণের রোগীকে পোপ আমাদের সামনে ভালো করে দিয়েছেন, তাহলে প্রটেস্ট্যান্টরা এ সম্পর্কে কি বলতো? বলতো, 'একটা বোকা, হাবা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মেয়েছেলে ভেবে নিয়েছিল যে সে কোনো সামান্য অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেয়েছে, আর ধূর্ত পোপ ও তার অনুসারীরা সাধারণ মানুষের প্রশংসা কুড়োনোর আশায় ঐ ধরে নেওয়া আরোগ্যলাভকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অলৌকিক ঘটনা বানিয়েছিল'। পোপ কর্তৃক সম্পাদিত অলৌকিক ঘটনার এরকম একটা কল্পিত কাহিনীর স্বরূপ উন্মোচন করা সহজ ; এবং যদি অবিশ্বাসীরা, ইহুদিরা ও মুসলমানেরা —যিশু খ্রিস্ট সম্পর্কে যাদের ধারণা পোপ সম্পর্কে আমাদের ধারণার থেকে মোটেই উন্নত নয়—তারা [যিশু সম্পাদিত অলৌকিক ঘটনার কাহিনী সম্পর্কে] এমনটা করে, তাহলে করার কিছু নেই।

ধর্মগ্রন্থ যে প্রত্যাদিষ্ট সে বিষয়ে উল্‌স্টন কোনো সন্দেহ প্রকাশ করেননি। এক দিকে তিনি যেমন তর্ক করতেন যে, অলৌকিক ঘটনাবলী আক্ষরিক অর্থে সত্য এমন মনে করার প্রশ্নই ওঠে না, অপর দিকে আবার তিনি এই আজগুবি তত্ত্বে বিশ্বাস করেন বলে দাবি করতেন যে, মানুষের আত্মার অভ্যন্তরে খ্রিস্টের রহস্যময় কাজকর্মের প্রতীক হিসেবে রূপক উদ্দেশ্যে সেসব ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে। খ্রিস্টীয় ফাদার অরিজেন [আ. খ্রি. ১৮৫–আ. ২৫৪], যিনি খুব একটা গোঁড়া ছিলেন না, তিনিই [ধর্ম শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় উলস্টনের আগে] এই রূপক পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন, এবং উলস্টন নিজের সমর্থনে তাঁর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাঁর জোরালো সমালোচনাগুলোর মান সব সময় এক নয়, কিন্তু তার অনেকগুলোই একেবারে ঠিক জায়গাটিতেই আঘাত করেছিল। কোনো কোনো আধুনিক সমালোচক কর্তৃক উলস্টনের লেখাগুলোকে 'অশালীন' বা 'স্থূল' বলে গুরুত্বহীন হিসেবে উপেক্ষা করার যে ফ্যাশন শুরু হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে অন্যায্য। উলস্টনের পুস্তিকাগুলো বিপুল সংখ্যায় বিক্রি হয়েছিল এবং তাঁর কুখ্যাতির পরিচয় পাওয়া যায় এক 'হাসিখুশি তরুণী'-র গল্পে। ঐ তরুণী একদিন উলস্টনকে বাইরে বেড়াতে দেখে কাছে গিয়ে বললো, "এই বুড়ো বদমাশ, এখনো তোমার ফাঁসি হয়নি?" উলস্টন সাহেব জবাব দিলেন, "ভদ্রে, আমি আপনাকে চিনি না ; জানতে

পারি কি আপনাকে অসন্তুষ্ট করার মতো কি করেছি আমি?" "তুমি আমার পরিত্রাতার বিরুদ্ধে লিখেছো," মহিলা বললো ; "আমার এই নগণ্য পাপিষ্ঠ আত্মার পরিণতি কি হবে যদি তা আমার প্রিয় পরিত্রাতার [যিশুর] জন্যই নিবেদিত না হয়?"

প্রায় একই সময়ে ম্যাথিউ টিন্‌ডাল (অল সোল্‌স কলেজের একজন ফেলো) আরো ব্যাপক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যাদেশকে আক্রমণ করেন। তাঁর *ক্রিশ্চিঅ্যানিটি অ্যাজ ওল্ড অ্যাজ দ্য ক্রিয়েশন* [খ্রিস্টধর্ম সৃষ্ট জগতের মতোই পুরাতন] (১৭৩০) গ্রন্থে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ হিসেবে *বাইবেল* অপ্রয়োজনীয়, কারণ ঈশ্বর প্রথম থেকেই একমাত্র যুক্তির আলোকে মানুষের কাছে যে স্বাভাবিক ধর্ম ব্যক্ত করেছেন তার সাথে বাইবেল নতুন কিছু যোগ করেনি। তিনি এই মর্মে তর্ক করেন যে, যাঁরা স্বাভাবিক ধর্মের সাথে মিল আছে বলে প্রত্যাদিষ্ট ধর্মকে সমর্থন দেন, তাঁরা এভাবে যুক্তি ও [ধর্মীয়] কর্তৃত্বের দ্বৈত শাসন কায়েম করেন এবং ঐ দুই এর মাঝখানে পড়ে যান। "এটা একটা উদ্ভট বিশৃঙ্খলা", টিনডাল পর্যবেক্ষণ করেছেন, "একটা বই-এর সত্যতা প্রমাণ করতে হচ্ছে ঐ বইয়ে বর্ণিত নীতিসমূহের সত্যতা দিয়ে, আবার একই সাথে সিদ্ধান্ত করতে হচ্ছে যে ঐ নীতিগুলো সত্য এই কারণে যে, সেগুলো ঐ বইটিতে লেখা আছে।" তিনি বাইবেলের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা চালিয়ে যেতে থাকেন। যুক্তির প্রতি খড়্গহস্ত না হয়ে বাইবেলের অভ্রান্ততা যদি বজায় রাখতে চান, তাহলে যখনই তাতে অযৌক্তিক বক্তব্যসমূহ দেখতে পাবেন তখনই সেগুলোকে মোচড় দেবেন এবং তাদের আক্ষরিক অর্থ থেকে সরে যাবেন। আপনি কি মনে করেন যে একজন মুসলমান তার *কোরআন* গ্রন্থ দ্বারা পরিচালিত এবং সে সকল উপলক্ষেই [অর্থাৎ উপলক্ষ পেলেই] আক্ষরিক অর্থ থেকে সরে আসে? "শুধু তাই নয়, আপনি কি রোমান দার্শনিক লোকটিকে বলবেন না যে তার প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থটি [রোমান বিদ্বান] সিস্‌রো [১০৬–৪৩ খ্রি. পূ.]–র অপ্রত্যাদিষ্ট লেখমালার তুলনায় অপরিসীমভাবে ন্যূন, কারণ সিস্‌রোর রচনা পড়তে কখনো আক্ষরিক অর্থ থেকে সরে আসতে হয় না?"

যেসব কালগত ও ভৌত ভ্রান্তি ধর্মগ্রন্থের অভ্রান্ততাকে আপাতদৃষ্টিতে বিপন্ন করে তুলেছিল, সেগুলি সম্পর্কিত বিতর্কের জবাবে জনৈক বিশপ বেশ যুক্তিসঙ্গতভাবেই বলেছিলেন যে বাইবেলে ঈশ্বর যাদের উদ্দেশ্যে কথা বলেছেন তাদের ধ্যানধারণা অনুসারেই তা বলেছেন, আর এসব ব্যাপারে তাদের মতামত সংশোধন করা প্রত্যাদেশের কাজ নয়। প্রত্যুত্তরে টিন্‌ডাল নিচের প্রশ্নগুলি উত্থাপন করেছিলেন :

> ঐসব বিষয়ে মানুষের অনুভূতি সংশোধন না করা এবং ঐ সংশোধন সাপেক্ষ অনুভূতিগুলি নিজেই ব্যবহার করা—ঈশ্বরের এই দুই কাজের মধ্যে কি কোনো বৈপরীত্য নেই? অথবা, মানুষের যুক্তিতর্ক ও ভাষাবিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ হলেও তা সংশোধন না করা এবং অনুরূপ যুক্তি ও ভাষা নিজেই ব্যবহার করা—ঈশ্বরের এই দুই কাজের মধ্যে? অথবা, অমার্জিত ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে কিছু না বলা এবং সেগুলি অনুসরণপূর্বক কথা বলে সেগুলিকে অনুমোদন করা—ঈশ্বরের এই দুই কাজের মধ্যে? এই ধরনের হীন কর্মের পথ না ধরলে মানুষের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা লাভ করা বা বজায় রাখার ব্যাপারে অনন্ত জ্ঞানময় ঈশ্বর কি হতাশ হতেন?

আত্মার মুক্তির একটাই পথ—এই মত যে কতো বিকট তা টিন্‌ডাল অত্যন্ত কার্যকরভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি প্রশ্ন করেন—যাঁর আগমনের আগে মানুষ যুক্তির

নির্দেশে চললে তাদের জন্য স্বর্গের দরজা খোলা ছিল, সেই দরজা তাদের জন্য বন্ধ করে দিতেই যদি তিনি এসে থাকেন, তাহলে সেই ব্যক্তিকে মানবজাতির একজন পরিত্রাতা হিসেবে প্রেরিত বলা যেতে পারে কিনা এ কথা কি আমাদের অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে না? ঈশ্বরের যে নিরপেক্ষ ও বিশ্বজনীন মঙ্গলময়তার কথা আমরা প্রকৃতির আলো থেকে উপলব্ধি করি, তার সাথে জিহোবাহ্ কিংবা তাঁর পয়গম্বরদের কৃতকর্মের অসঙ্গতির সমালোচনা করেছেন টিন্ডাল। যে অপরাধ মানুষ করেনি তার জন্য তাদের শাস্তি দেয়ার প্রয়োজনে প্রকৃতির শৃংখলা ভাঙার ঘটনাগুলোর কথা বিবেচনা করুন—যেমন ইলাইজাহ্ কর্তৃক সাড়ে তিন বছর ধরে বৃষ্টি বর্ষণ ব্যাহত করার ঘটনা। অপরাধীর বদলে নিরপরাধকে শাস্তি দিতে ঈশ্বর যদি তাঁর সদয় তত্ত্বাবধানের সাধারণ নিয়মগুলি নিজেই ভেঙে তছনছ করেন, তাহলে ইহজীবনেই আমাদের সাথে যখন তিনি এমন ব্যবহার করছেন, তখন আমাদের কোনো গ্যারান্টি নেই যে পারলৌকিক জীবনেও তিনি ঐ একই পন্থায় কাজ করবেন না, "কেননা ন্যায়বিচারের শাশ্বত নিয়মাবলী যদি একবার ভাঙা হয় তাহলে কেমন করে তার নিবৃত্তির কথা আমরা কল্পনা করতে পারি?" কিন্তু *ওল্ড টেস্টামেন্টে* বর্ণিত পবিত্রতা ও ন্যায়বিচারের আদর্শসমূহ সত্যিই অদ্ভুত। পবিত্রতর মানুষেরা যতোটা নির্দয় বলে প্রতীয়মান হন, তার চেয়ে বেশি নির্দয় করে এবং অভিশাপ দেওয়ায় বেশি পারঙ্গমরূপে, তাঁদেরকে দেখানো হয়েছে। পবিত্র পয়গম্বর এলিশাকে ছোট বাচ্চারা *টেকো* বলেছিল বলে তিনি ঈশ্বরের নামে তাদের অভিশাপ দিলেন—কি বিস্ময়কর ব্যাপার! এবং যা আরো বিস্ময়জনক তা হচ্ছে, দুটো ভল্লুকী সাথে সাথে বিয়াল্লিশ জন ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে খেয়ে ফেললো!

আমি মন্তব্য করেছি যে, এ সময় ধর্মশাস্ত্রবেত্তারা সাধারণত খ্রিস্টধর্মকে বিশ্বাসের উপর স্থাপন না করে যুক্তির ভিত্তির উপর স্থাপন করার পথ ধরেছিলেন। হেনরি ডড্ওয়েল (জুনিয়র) রচিত এবং অক্সফোর্ডের এক তরুণ ভদ্রলোককে লেখা চিঠির আকারে গ্রথিত একখানি আকর্ষণীয় ছোট্ট বই, *ক্রিশ্চিঅ্যানিটি নট ফাউন্ডেড অন আরগুমেন্ট* [খ্রিস্টধর্ম যুক্তিতর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়], ১৭৪১ সালে প্রকাশিত হয়। এতে যুক্তির উপর ওরকম আস্থা স্থাপনের বিপদ সম্পর্কে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে। এটি বেইলের নীতির এক বিপরীত পরিণতি; এর প্রতিপাদ্য হচ্ছে: খ্রিস্টধর্ম মূলত অযৌক্তিক এবং যদি তুমি বিশ্বাস করতে চাও, তাহলে যৌক্তিক বিচার করতে যাওয়া সর্বনাশা। বিশ্বাস ও যৌক্তিক বিচারের চর্চা বিপরীত ফল উৎপাদন করে; দার্শনিক তাঁর ইন্দ্রিয়গত জ্ঞানের অগ্রগতির ফলেই ঐশ্বরিক প্রভাবের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েন; গস্পেলকে গ্রহণ করতে হবে সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহ শিশুর মতো আত্মসমর্পণের সাথে, যে শিশুর পাঠ শেখা ছাড়া অন্য কোনো প্রবণতা থাকে না। যিশু খ্রিস্ট তাঁর ধর্মমত তদন্তের জন্য উপস্থাপন করেননি, তিনি তাঁর মিশন বা ধর্মস্থাপনের কাজের সপক্ষে কোনো যুক্তিতর্ক শিষ্যদের সামনে রেখে সেগুলির শক্তি সম্পর্কে শান্তভাবে বিবেচনা করার জন্য যথেষ্ট সময় এবং তাদের যুক্তি তাদেরকে যেভাবে পরিচালিত করে সেভাবেই সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা—এ দুটোর কোনটাই দেননি। এ কাজ করার মতো যোগ্যতা খ্রিস্টের দ্বাদশ শিষ্যের কারোই ছিল না, কারণ তাঁরা ছিলেন সবচেয়ে ছলাকলাবিহীন ও নিরক্ষর মানুষ। ডড্ওয়েল প্রটেস্ট্যান্ট অবস্থানের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করেছেন। সকল মানুষকে নিজের মতো বিচার করার স্বাধীনতা দেওয়া এবং একই সাথে আশা করা যে তারা [বাইবেলের 'ইক্লেজিআস্টস্' গ্রন্থের প্রণেতা] প্রিচারের মনোবৃত্তিসম্পন্ন হবে—এটি

ঐকমত্যের এমন এক পরিকল্প যা কল্পনাতে আনার মতো যথেষ্ট দুর্বল কেউ আছে এ কথা কোনো ব্যক্তি ভাবতে পারবে না ; সেটাকে সত্য বলে ঘোষণা দিয়ে বাস্তবে চর্চা করার প্রস্তাব দেওয়ার মতো যথেষ্ট শক্ত কাউকে কখনো পাওয়া যেতে পারে তেমন সম্ভাবনা আরো ক্ষীণ। "(সকল বিবেচক ব্যক্তির) বিচারে", রোমের লোকেরা—

> এই প্রজন্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হবে এবং একে অপরাধী সাব্যস্ত করবে ; কারণ তারা [ধর্মগ্রন্থের] অভ্রান্ততা নামক মাত্র একটা অযৌক্তিক জিনিস উদ্ভাবন করেছিল এবং এখন তারা এখানে অভ্রান্ততার চেয়েও বড় আর এক অযৌক্তিকতা দেখতে পাচ্ছে।

আমাকে এখনো কথা বলতে হবে (তৃতীয়) আর্ল্ অফ শ্যাফ্‌ট্‌স্‌বেরি [১৬৭১–১৭১৩] সম্পর্কে, যাঁর রচনাবলী সামগ্রিক অবহেলা থেকে রক্ষা পেয়েছে তাঁর শৈলীর জন্য। তাঁর বিশেষ আগ্রহের বিষয় ছিল নৈতিকতা। যদিও এই সময়ের অধিকাংশ বিরুদ্ধবাদী লেখকের মূল্যবান কাজটি ছিল অতিপ্রাকৃত ধর্মের (supernatural religion) ধ্বংসাত্মক সমালোচনা, তাঁরা আঁকড়ে ধরেছিলেন—যেমনটি আমরা উপরে দেখে এসেছি—সেই বস্তুটিকে যাকে বলা হতো 'প্রাকৃতিক (বা স্বাভাবিক) ধর্ম' (natural religion)—যার অর্থ একজন সদয় ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি–ঈশ্বরে বিশ্বাস যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, সেটিকে শাসন করছেন প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে এবং আমাদের সুখশান্তি কামনা করেন। ধারণাটি নেওয়া হয়েছিল প্রাচীন যুগের দার্শনিকদের কাছ থেকে এবং এটি পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন লর্ড [এডওয়ার্ড] হারবার্ট অফ চেরবেরি [১৫৮৩–১৬৪৮] তাঁর *অন ট্রুথ* [সত্য নিয়ে] শীর্ষক ল্যাটিন গ্রন্থে (প্রথম জেম্‌সের রাজত্বকালে [১৬০৩–১৬২৫] রচিত [প্রকাশ ১৬২৪])। এই ঈশবাদীরা দাবি করতেন যে ঐ প্রাকৃতিক ধর্মই নৈতিকতার যথার্থ ভিত্তি, এবং সদাচরণে উৎসাহ দানের জন্য খ্রিস্টীয় প্রতিশ্রুতিসমূহ অপ্রয়োজনীয়। শ্যাফ্‌ট্‌স্‌বেরি তাঁর *ইন্‌কোয়্যারি কন্‌সার্নিং ভারচ্যু* [সদ্‌গুণ সম্পর্কিত অনুসন্ধান] (১৬৯৯) গ্রন্থে প্রশ্নটি নিয়ে তর্ক উত্থাপন করেন এবং যুক্তি দেখিয়ে বলেন যে, মনের মধ্যে স্বার্থপর প্রত্যাশা ও ভীতি সঞ্চার করে যে স্বর্গ–নরকের পরিকল্পনা, তা নৈতিকতাকে কলুষিত করে ; আর আচরণের একমাত্র যথার্থ প্রেরণা হচ্ছে সততার নিজস্ব সৌন্দর্য। তিনি নৈতিক বিধানের জন্য, এমন কি ঈশবাদকেও একটি 'দরকারি অনুমান' বলে বিবেচনা করেননি। তিনি স্বীকার করেছেন, নিরীশ্বরবাদীদের মতামত নৈতিকতার কোনো ক্ষতি করে না। তবে তিনি মনে করেন যে, বিশ্বের একজন মঙ্গলময় নিয়ন্তায় বিশ্বাস সততা চর্চার পক্ষে এক শক্তিশালী সমর্থন।

শ্যাফ্‌ট্‌স্‌বেরি আদ্যন্ত একজন আশাবাদী, এবং উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে পন্থা অবলম্বনের প্রশংসনীয় নীতিতে তিনি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ; এই নীতি অনুসারে এক প্রাণীর কাজই হচ্ছে অপর প্রাণীর খাদ্য হওয়া। প্রকৃতির রক্তাক্ত দন্ত–নখর এবং প্রকৃতিরই শক্তিধর শিল্পীর হিতৈষণা—এই বৈপরীত্য নিরসনের কোনো চেষ্টা তিনি করেননি। "প্রধানত সকল বস্তুর মধ্যেই দয়া ও সৌহার্দ্যের ভাব বিদ্যমান।" একজন নিরীশ্বরবাদী হয়তো বলতে পারতেন যে তিনি বরং অন্ধ আপতন (chance)–এর আয়ত্তাধীন থাকবেন তবু, লর্ড শ্যাফ্‌ট্‌স্‌বেরির শৃংখলার ধারণানুযায়ী, যিনি মাছি সৃষ্টি করেছেন মাকড়সার খাদ্য হওয়ার জন্য, তেমন কোনো স্বৈরাচারী ঈশ্বরের হস্তগত হবেন না। কিন্তু এটি ছিল বিশ্বব্যবস্থার এমন একটি দিক যা নিয়ে আঠারো শতকের চিন্তাবিদরা তেমন মাথা ঘামাননি। পক্ষান্তরে, *ওল্ড টেস্টামেন্টের* ঈশ্বর

শ্যাফ্‌ট্‌স্‌বেরির বিরক্তি উৎপাদন করেছিলেন। তিনি সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে কিংবা ব্যাজস্তুতির মাধ্যমে ধর্মশাস্ত্রকে আক্রমণ করেছেন। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, যদি কোনো ঈশ্বর থেকেই থাকেন তাহলে তিনি নিরীশ্বরবাদীদের উপর যতোটা অসন্তুষ্ট হবেন তার চেয়ে বেশি হবেন যারা তাঁকে জিহোবারূপে গ্রহণ করেছে তাদের উপর। প্লুটার্ক [আ. খ্রি. ৪৬–১১৯+] যেমন বলেছিলেন, "আমি বরং এমন মানুষ চাইবো যারা আমার সম্পর্কে বলবে যে, প্লুটার্ক বলে কেউ নেই এবং কখনো ছিল না, তবু তেমন লোকদের চাই না যারা বলবে, 'প্লুতার্ক নামে একজন লোক ছিল বটে, কিন্তু সে ছিল অস্থিতিপ্রবণ, পরিবর্তনশীল, সহজে প্ররোচিত হওয়ার মতো এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষ'।" শ্যাফ্‌ট্‌স্‌বেরির তাৎপর্য এই যে, তিনি নৈতিকতার একটি ইতিবাচক তত্ত্ব নির্মাণ করেছিলেন এবং যদিও এটির কোনো দার্শনিক গভীরতা ছিল না, কিন্তু ফরাসি ও জার্মান চিন্তাবিদদের উপর তাঁর প্রভাব প্রভূত পরিমাণে পড়েছিল।

কোনো কোনো দিক থেকে ঈশবাদীদের মধ্যে সম্ভবত যোগ্যতম এবং অবশ্যই সবচেয়ে বিদ্বান ছিলেন রেভারেন্ড কোনিয়ার্স মিডলটন [১৬৮৩–১৭৫০] যিনি গির্জার অধীনেই থেকে গিয়েছিলেন। তিনি খ্রিস্টধর্মকে সমর্থন করতেন উপযোগিতার যুক্তিতে। তিনি বলতেন, যদি এই ধর্মটি প্রতারণাও হয়ে থাকে, তবু এটি ধ্বংস করা অনুচিত হবে। কারণ এটা আইন দ্বারা স্থাপিত এবং এর পেছনে রয়েছে সুদীর্ঘ ঐতিহ্য। ঐতিহ্যবাহী ধর্ম আমাদের প্রয়োজন এবং খ্রিস্টধর্মকে উচ্ছেদ করে তার জায়গায় যুক্তিকে স্থাপন করা হবে হতাশাজনক। কিন্তু মিড্‌ল্‌টনের লেখায় এমন সব কার্যকর যুক্তিতর্ক রয়েছে যেগুলো প্রত্যাদেশের ধারণার ক্ষতিসাধন করেছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল খ্রিস্টীয় অলৌকিক ঘটনাবলীর ব্যাপার নিয়ে তাঁর লেখা (১৭৪৮) *ফ্রি ইন্‌কোয়্যারি* [খ্রিস্টীয় অলৌকিক ঘটনাবলী নিয়ে মুক্ত অনুসন্ধান] শীর্ষক বই, যাতে একটি পুরোনো প্রশ্নকে এক নতুন ও বিপজ্জনক আলোকে অবলোকন করা হয়েছে : কোন্ সময় গির্জার [অর্থাৎ ধর্মাধিষ্ঠানের] অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে? আমরা শিগ্‌গিরই দেখবো কিভাবে গিবন মিড্‌ল্‌টনের পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন।

ঈশবাদীদের মতো তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীরাও যুক্তিই অবলম্বন করেছিলেন এবং তা করতে গিয়ে ধর্মীয় কর্তৃত্বের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিলেন। ধর্মবিশ্বাসের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা দিয়েছিল যে বইটি, বিশপ জোসেফ বাট্‌লার [১৬৯২–১৭৫২] রচিত সেই *অ্যানালজি* [উপমা] (১৭৩৬) যতো সংশয় নিরসন করেছিল তার চেয়ে বেশি জাগিয়ে তুলেছিল বলে সন্দেহ করা হয়। [বইটি পড়ে] কনিষ্ঠ উইলিয়ম পিট [১৭৫৯–১৮০৬]–এর এই অভিজ্ঞতাই হয়েছিল, এবং *অ্যানালজি* অবিশ্বাসীতে পরিণত করেছিল [উপযোগবাদী] জেম্‌স মিল [১৭৭৩–১৮৩৬]–কে। ঈশবাদীরা তর্ক করতেন এই বলে যে, প্রত্যাদেশের অন্যায়বাদী ও নিষ্ঠুর ঈশ্বর কখনো প্রকৃতির ঈশ্বর হতে পারেন না ; বাট্‌লার প্রকৃতির দিকে আঙুল তুলে বললেন, "চেয়ে দেখুন, সেখানেও নিষ্ঠুরতা ও অবিচার।" শ্যাফ্‌ট্‌স্‌বেরির আশাবাদের বিরুদ্ধে এই যুক্তি সম্পূর্ণ যথার্থ ছিল, কিন্তু এতে পরিষ্কার এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া হলো যে ন্যায়বাদী ও মঙ্গলদাতা কোনো ঈশ্বর নেই—বাট্‌লার যে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন ঠিক তার উল্টো। বাট্‌লার শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েছেন এই সন্দেহবাদী যুক্তির উপর নির্ভর করতে যে আমরা চরমভাবে অজ্ঞ ; সব কিছুই সম্ভব, এমনকি অনন্ত নরকাগ্নিও ; এবং সেজন্য নিরাপদ

তথা বিচক্ষণতার পথ হচ্ছে খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাস মেনে নেওয়া। এখানে বলা যেতে পারে যে, সামান্য পরিবর্তন করে এই যুক্তি মক্কা ও তিম্বুক্তুতে[৫] অন্য ধর্মের অনুকূলেও ব্যবহার করা যেতে পারতো। তিনি কার্যত পাস্কালের ব্যবহৃত সেই যুক্তির পুনরুজ্জীবন ঘটান যেখানে বলা হয়েছিল যে, যদি অসংখ্য সম্ভাবনার মধ্যে খ্রিস্টধর্ম সত্য হওয়ার পক্ষে একটিমাত্র সম্ভাবনা থাকে, তা হলেও খ্রিস্টান হওয়া একজন মানুষের স্বার্থের অনুকূলই বটে ; কারণ যদি এটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়, এটি বিশ্বাস করার জন্য তার কোনো ক্ষতি হবে না ; আবার যদি এটি সত্য প্রমাণিত হয়, তা হলে সে অপরিমেয়রূপে লাভবান হবে। বাটলার অবশ্যই দেখাতে চেয়েছেন যে, খ্রিস্টধর্মের অনুকূলে সম্ভাবনা বলতে গেলে প্রায় বিশ্বাস করার মতো, কিন্তু তাঁর যুক্তিক্রমের বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক মূল্য মূলত পাস্কালের যুক্তিক্রমের অনুরূপ। কেউ কেউ দেখিয়ে দিয়েছেন যে এই যুক্তিক্রম অনুসরণ করলে একটি সহজ পদক্ষেপ নিয়েই অ্যাংগ্লিক্যান খ্রিস্টধর্ম থেকে রোমান খ্রিস্টধর্মে উপনীত হওয়া যায়। (ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ অঁরি [হেন্‌রি] [রাজ. ১৫৮৯–১৬১০] যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে,) [রোমান] ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট উভয়েই একমত যে একজন ক্যাথলিকের [আত্মার] মুক্তি হতেও পারে ; ক্যাথলিকরা জোর দিয়ে বলেন যে প্রটেস্ট্যান্ট নিশ্চয়ই নরকে প্রেরিত হবেন ; সুতরাং নিরাপদ রাস্তা হলো [রোমান] ক্যাথলিক ধর্ম অবলম্বন করা।[৬]

আমি কয়েজন ইংরেজ ঈশবাদীদের নিয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা করেছি, কারণ একদিকে তাঁরা যেমন ইংল্যান্ডে যুক্তিবাদের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন, তেমনি বেইলের সাথে সাথে তাঁরাও প্রচুর চিন্তাভাবনা সরবরাহ করেন যা ইংলিশ চ্যানেলের অপর তীরের প্রতিভাধর লেখকদের কৌশলী উপস্থাপনায় ফ্রান্সের শিক্ষিত শ্রেণীগুলিকে কব্‌জা করে ফেলেছিল। এখন আমরা ভল্‌তেয়ার [১৬৯৪–১৭৭৮]–এর যুগে প্রবেশ করেছি, যিনি ছিলেন একজন প্রত্যয়ী ঈশবাদী। তিনি গভীরভাবে ভেবে দেখেছিলেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি প্রমাণ করে যে তা একজন সচেতন স্থপতি কর্তৃক নির্মিত ; তিনি মত পোষণ করতেন যে সঠিক আচরণের স্বার্থেই ঈশ্বর প্রয়োজনীয় ; এবং তিনি সোৎসাহে নিরীশ্ববাদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। তাঁর মহৎ কৃতিত্ব ছিল ১. সহনশীলতার সপক্ষে তাঁর নিরলস ফলদায়ক কাজ, এবং ২. কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর সুসম্বদ্ধ সংগ্রাম। তাঁর উপর ইংরেজ চিন্তানায়কদের গভীর প্রভাব ছিল, বিশেষত লক ও হেনরি বোলিংব্রোক [১৬৭৮–১৭৫১]–এর। রাষ্ট্রনায়ক বোলিংব্রোক নিজের একান্ত ঘনিষ্ঠ জন ব্যতীত অন্য সকলের কাছে সারা জীবন ধরে তাঁর [ধর্মে] অবিশ্বাস গোপন রেখেছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল ফ্রান্সে নির্বাসিত জীবন যাপন করেছিলেন। তাঁর যুক্তিবাদভিত্তিক নিবন্ধসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল (১৭৫৪) তাঁর মৃত্যুর পর। ভল্‌তেয়ারের সাহিত্যিক প্রতিভা ইংরেজ চিন্তাবিদদের কাজকে একটা বিশ্বশক্তিতে রূপান্তরিত করেছিল। আঠারো শতকের মধ্যভাগের পরে যখন ভল্‌তেয়ারের দেশ কুসংস্কারমূলক আচার–অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় উৎপীড়ন এক কলঙ্কজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, ঠিক তখনই তিনি খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম শুরু করেন, তার আগে নয়। তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্যাথলিক ধর্মাধিষ্ঠানকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপাত্মক রচনা দ্বারা আক্রমণ করলেন। *দ্য টুম্ অফ ফ্যানাটিসিজ্‌ম্* [ধর্মান্ধতার কবর] (রচনা ১৭৩৬, প্রকাশ ১৭৬৭) নামের ছোট্ট একটি বই–এ তিনি আলোচনা শুরু করেন এই পর্যবেক্ষণ দিয়ে যে, যে ব্যক্তি তার ধর্মকে পরীক্ষা না করেই গ্রহণ করেছে (যেমনটা অধিকাংশ লোকই করে থাকে) সে হচ্ছে

একটি ষাঁড়ের মত যেটি স্বেচ্ছায় নিজেকে দড়িদড়ায় আবদ্ধ হতে দিয়েছে ; এরপর ভল্‌তেয়ার বাইবেলের সমস্যাসমূহ, খ্রিস্টধর্মের উত্থান ও ধর্মাধিষ্ঠানের ইতিহাসের গতি পুনরীক্ষণ করেন এবং তা থেকে এই উপসংহার টানেন যে, প্রত্যেক বিবেচক মানুষের উচিত খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়কে আতঙ্কের বস্তু বলে মনে করা।

> একটি সহজ ও বিশ্বজনীন ধর্মের পরিবর্তে মানুষ অন্ধভাবে বেছে নিয়েছে একটা অযৌক্তিক ও রক্তাক্ত ধর্মমত যার সমর্থনে রয়েছে জল্লাদের দল এবং যাকে ঘিরে রেখেছে জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড, যে ধর্মমত অনুমোদন পেতে পারে শুধু তাদের যাদেরকে সে ক্ষমতা ও ধনসম্পদ দেয়, যে বিশেষ ধর্মমত পৃথিবীর একটা ক্ষুদ্র অংশেই মাত্র চালু রয়েছে।

সারমন অফ দ্য ফিফটি [পঞ্চাশ জনের ধর্মভাষণ] এবং *কোয়েশ্চন্‌স অফ জাপাতা* [জাপাতার জিজ্ঞাসা] বই দুটিতে আমরা দেখতে পাই বেইল ও ইংরেজ ধর্মসমালোচকদের কাছে ভল্‌তেয়ার কতো ঋণী ছিলেন ; তবে তাঁর স্পর্শ ছিল আরো হাল্‌কা এবং তাঁর বিদ্রূপ ছিল অনেক বেশি কার্যকর। *ওল্ড টেস্টামেন্টের* ভৌগোলিক ভ্রান্তি সম্পর্কে তাঁর ভাষ্য হলো : "ঈশ্বর স্পষ্টতই ভূগোলে ভালো ছিলেন না।" লট–এর স্ত্রী পেছন দিকে তাকিয়ে যে 'ভয়ঙ্কর অপরাধ' করেছিলেন যার ফলে তাঁকে একটা লবণের স্তম্ভে পরিণত হতে হয়েছিল, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভল্‌তেয়ার আশা ব্যক্ত করেছেন যে, ধর্মগ্রন্থের গল্পগুলো আমাদেরকে আরো আলোকিত করতে না পারলেও আরো উন্নত করবে। তাঁর অনুসৃত পদ্ধতিগুলোর একটি ছিল এই যে, খ্রিস্টান ধর্মীয় নীতিমালা সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি অগ্রসর হতেন এমন একজন লোক হিসেবে যিনি তাঁর জীবনে প্রথম বারের মতো খ্রিস্টান বা ইহুদিদের অস্তিত্ব সম্পর্কে এইমাত্র জানতে পেরেছেন।

ভলতেয়ার রচিত নাটক *সোল* (Saul) (১৭৬৩)–কে পুলিশ নিষিদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিল। ঐ নাটকে তিনি ঈশ্বরের আপন হৃদয়ের মানুষ ডেভিডের জীবনকথা তার সমস্ত নগ্ন বিভীষিকাসহ উপস্থাপন করেছেন। যে দৃশ্যে আগাগকে হত্যা না করে ফেলার জন্য সামুএল সোলকে ভর্ৎসনা করেছেন, সেটি নাটকের মর্মবাণীর একটা ধারণা দেয়।

সামুএল : ঈশ্বর আমাকে আদেশ দিয়েছেন তোমাকে জানিয়ে দিতে যে তোমাকে রাজা বানিয়ে তিনি অনুশোচনা করছেন।

সোল ঈশ্বর অনুশোচনা করছেন ! যারা ভুল করে কেবল তারাই অনুশোচনা করে থাকে। শাশ্বত প্রজ্ঞার অধিকারী হয়ে তিনি কখনো অবিবেচক হতে পারেন না। ঈশ্বর কোনো ভুল করতে পারেন না।

সামুএল : যারা ভুল করে তাদেরকে সিংহাসনে বসিয়ে তিনি অনুশোচনা করতে পারেন।

সোল : আচ্ছা, কে ভুল করে না ? বলুন, কি আমার দোষ ?

সামুএল : তুমি এক রাজাকে ক্ষমা করে দিয়েছো।

আগাগ : কী ! সবচেয়ে সুন্দর পুণ্যকর্ম কি জুদিয়াতে অপরাধ বলে বিবেচিত ?

সামুএল (আগাগের প্রতি) : চুপ ! ঈশ্বরনিন্দা করো না। (সোলের প্রতি) : ইহুদিদের প্রাক্তন রাজা সোল, ঈশ্বর কি আমার মুখ দিয়ে তোমাকে আদেশ করেননি

মহিলা, কুমারী, কিংবা দগ্ধপোষ্য শিশু কাউকে রেহাই না দিয়ে আমালেকীয় গোষ্ঠীর সকলকে খতম করতে?

আগাগ : 'আপনার ঈশ্বর' এমন একটা আদেশ দিয়েছিলেন! আপনি ভুল করছেন, আপনি নিশ্চয় বলতে চেয়েছিলেন, 'আপনার শয়তান।'

সামুএল : সোল, তুমি কি ঈশ্বরের আদেশ মেনেছিলে?

সোল : আমি এ রকম একটা আদেশকে ইতিবাচক বলে ধরে নেইনি। আমি ভেবেছিলাম যে, মঙ্গলময়তাই পরমেশ্বরের প্রধান গুণ, এবং কোনো করুণার্দ্র হৃদয় তাঁকে অসন্তুষ্ট করতে পারে না।

সামুএল : তুমি ভুল করছো, হে অবিশ্বাসী। ঈশ্বরের নিকট তুমি নিন্দার্হ, তোমার রাজদণ্ড অন্যের হাতে চলে যাবে।

সম্ভবত খ্রিস্টীয় জগতে ভল্‌তেয়ারের চেয়ে বেশি ঘৃণা কেউ কখনো জাগিয়ে তোলেনি। তাঁকে এক প্রকার খ্রিস্টশত্রু হিসেবে দেখা হতো। সেটা স্বাভাবিক ছিল ; কারণ সে সময়ে তাঁর আক্রমণ দারুণভাবে কার্যকর হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে কখনো কখনো এই বলে দোষারোপ করা হয়ে থাকে যে তিনি শুধু ধ্বংসই করেছেন, যেখানে ভেঙেছেন সেখানে নতুন কিছু গড়ে তোলার কোনো চেষ্টাই করেননি। এটা একটা সংকীর্ণ অভিযোগ। উত্তরে বলা যেতে পারতো যে, একটা পয়ঃপ্রণালী যখন কোনো শহরে প্লেগ ছড়াচ্ছে তখন সেটা অপসারণের ব্যাপারে আমরা নতুন একটি পয়োনিস্কাশন ব্যবস্থা গড়ে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি না ; আর এটা ভালোভাবেই বলা যায় যে সমকালীন ফ্রান্সে ধর্ম যেভাবে পালন করা হতো তাতে তা একটা বিষাক্ত নর্দমা বই আর কিছু ছিল না। কিন্তু প্রকৃত উত্তর হচ্ছে এই যে, জ্ঞান তথা সভ্যতা এগিয়ে চলে সমালোচনা ও নেতিবাচক তৎপরতার মাধ্যমে, যেমন এগিয়ে চলে নির্মাণ ও ইতিবাচক আবিষ্কারের দ্বারা। মিথ্যা, কুসংস্কার (prejudice) ও প্রতারণাকে কার্যকরভাবে আক্রমণ করার দক্ষতা যখন কোনো ব্যক্তির থাকে, তখন তা ব্যবহার করা তার কর্তব্য, যদি সামাজিক কর্তব্য বলে কিছু থেকে থাকে।

গঠনমূলক চিন্তার সন্ধানে আমাদের অবশ্যই যেতে হবে ফরাসি চিন্তার অপর মহান নেতা জঁ জাক রুসো [১৭১২–১৭৭৮]–র কাছে, যিনি ভিন্ন এক পন্থায় [চিন্তার] মুক্তির অগ্রগতিতে অবদান রেখেছিলেন। তিনি ঈশবাদী ছিলেন, কিন্তু তাঁর ঈশবাদ ভল্‌তেয়ারের মতো ছিল না, বরং ছিল ধর্মীয় ও আবেগী। তিনি খ্রিস্টধর্মকে এক ধরনের শ্রদ্ধামিশ্রিত সন্দেহের সাথে অবলোকন করতেন। কিন্তু তাঁর ভাবনা ছিল বিপ্লবী এবং ধর্মাধিষ্ঠানের প্রতি বিমুখ ; এ চিন্তা সকল এলাকাতেই কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল ; এবং এর এক বিরাট প্রভাব ছিল। ধর্মযাজকেরা সম্ভবত ভল্‌তেয়ারের ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও অস্বীকৃতি অপেক্ষা রুসোর তত্ত্বসমূহকে বেশি ভয় করতেন। কতিপয় বছর ধরে তিনি পৃথিবীর বুকে একজন পলাতক ব্যক্তি ছিলেন। শিক্ষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁর সমুজ্জ্বল অবদান *এমিল* প্রকাশিত হয় ১৭৬২ সালে। এতে আছে ধর্মের উপর লিখিত কয়েকখানি অসাধারণ পৃষ্ঠা। "স্যাভয়বাসী জনৈক পল্লীযাজকের ধর্মবিশ্বাসের দাবি" শীর্ষক ঐ পৃষ্ঠাগুলিতে লেখকের ঈশবাদী বিশ্বাস জোরালোভাবে ঘোষিত এবং প্রত্যাদেশ ও ঈশ্বরতত্ত্ব পরিত্যক্ত হয়েছে। বইটি প্যারিসে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং রুসোকে গ্রেফতার করার হুকুম দেওয়া হয়। বন্ধুদের চাপে তিনি পালাতে বাধ্য হলেন, কিন্তু তাঁকে জিনিভাতে ফিরতে দেওয়া হয়নি, কারণ ঐ প্রদেশের

সরকারও প্যারিসের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিল। তিনি সুইজারল্যান্ডের বার্ন প্রদেশে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন, কিন্তু তাঁকে বেরিয়ে যাওয়ার হুকুম দেওয়া হলো। তখন তিনি প্রুশিয়ার অধীনস্থ ক্ষুদ্র রাজ্য নয়ফ্শাটেলে পালিয়ে গেলেন। ঐ যুগের একমাত্র সত্যিকারের সহনশীল শাসক ফ্রেড্রিক দ্য গ্রেট [মহানুভব ফ্রেড্রিক (১৭৪০–৮৬)] তাঁকে নিরাপত্তা দিলেন। কিন্তু স্থানীয় ধর্মযাজকেরা তাঁর উপর নির্যাতন চালালো ও তাঁর নামে কুৎসা রটনা করলো। রাজা ফ্রেড্রিক না থাকলে তারা তাঁকে বিতাড়িত করতো। তিনি ইংল্যান্ডে গিয়ে কয়েকমাস থেকে (১৭৬৬) ফ্রান্সে ফিরলেন এবং সেখানে মৃত্যু [১৭৭৮] পর্যন্ত আর তাঁকে উৎপীড়ন করা হয়নি।

রুসোর ধর্মবিরোধী চিন্তাধারায় তাঁর ধর্মসংক্রান্ত মতামত ছিল একটি গৌণ বিষয়। তিনি তাঁর দুঃসাহসী সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বগুলো দিয়েই দুনিয়াতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর যে বই–এ এসব তত্ত্ব লেখা হয়েছিল, সেই *সোশ্যল্ কনট্র্যাক্ট* [সামাজিক চুক্তি] গ্রন্থটি জিনিভাতে পুড়িয়ে ফেলা হয়। যদিও সমালোচনার মুখে তাঁর তত্ত্বগুলি এক মুহূর্তও টিকে থাকতে পারবে না, এবং যদিও মানুষকে উগ্র মতান্ধ বানানোর অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন তাঁর মতবাদ ক্ষতির কারণ হয়েছিল, তথাপি 'প্রিভিলেজ' বা বিশেষ সুবিধাভোগের রীতিকে নিন্দনীয় প্রতিপন্ন করতে, এবং সকল নাগরিকের হিত নিশ্চিত করাই যে রাষ্ট্রের লক্ষ্য এই মত প্রতিষ্ঠা করতে তিনি যে সহায়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন, তার মাধ্যমে রুসোর দর্শন প্রগতির পক্ষে অবদান রেখেছিল।

রুসোর আগাখ্রিস্টীয় রূপ বা ভল্তেয়ারের খ্রিস্টধর্মবিরোধী রূপ—যে রূপেই দেখা হোক না কেন, ঈশবাদ ছিল বালুর উপর তৈরি ইমারত ; এবং এর ভিত্তিমূল উপ্ড়ে ফেলতে ফ্রান্স, জার্মানি ও ইংল্যান্ডে অনেক চিন্তানায়কের আবির্ভাব হলো। ফ্রান্সে ঈশবাদ নিরীশ্বরবাদে পৌঁছানোর জন্য মাঝ রাস্তার সরাইখানায় পর্যবসিত হয়েছিল। ১৭৭০ সালে প্রকাশিত ব্যারন দ'ওল্বাক (D' Holbach) [১৭২৩–১৭৮৯]–এর *সিস্টেম অফ নেচার* [প্রকৃতির তন্ত্র] পড়ে ফরাসি পাঠকেরা চম্কে উঠলেন। ঐ বই–এ ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও আত্মার অবিনশ্বরতা অস্বীকার করা হয়েছিল, এবং বিশ্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে গতিশীল পদার্থমাত্র—এই মত ব্যক্ত করা হয়েছিল।

ওল্বাকের বন্ধু দেনিস দিদ্রো ও [১৭১৩–১৭৮৪]–ঈশবাদ খণ্ডন করতে এগিয়ে এসেছিলেন। দিদ্রোর মহান কীর্তি *এনসাইক্লোপিডিয়া* [বিশ্বকোষ] রচনায় অনেক নেতৃস্থানীয় চিন্তাবিদ সহযোগিতা করেছিলেন। খ্রিস্টীয় ধর্মাধিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিদ্রোহে ব্যবহৃত সকল প্রধান মতের স্থান হয়েছিল ঐ মহাগ্রন্থে। এটি শুধুমাত্র একখানি বিজ্ঞানসম্মত উৎস নির্দেশক গ্রন্থই ছিল না, ছিল ধর্মবিশ্বাসের শত্রুদের পরিচালিত গোটা আন্দোলনের প্রতিনিধি। এ গ্রন্থের লক্ষ্য ছিল মানুষকে খ্রিস্টধর্ম ও তার কথিত 'আদি পাপ' থেকে সরিয়ে পৃথিবী সম্পর্কে নতুন এক ধারণায় নিয়ে যাওয়া, যে ধারণায় পৃথিবীকে বিবেচনা করা হয় এমন এক স্থান হিসেবে যাকে মনোরম করা সম্ভব, এবং যেখানে প্রকৃত অমঙ্গল মানবপ্রকৃতির কোনো মৌলিক দোষের জন্য আসেনি, এসেছে বিকৃত প্রতিষ্ঠান ও বিকৃত শিক্ষা থেকে। মানুষের আগ্রহকে অন্ধ ধর্মবিশ্বাস থেকে সরিয়ে সমাজ–উন্নয়নমুখী করা, পৃথিবীকে বিশ্বাস করানো যে, মানুষের সুখ প্রত্যাদেশের উপর নির্ভর করে না, করে সামাজিক রূপান্তর সাধনের উপর —এ হলো সেই জিনিস যা বাস্তবায়নের জন্য দিদ্রো ও রুসো তাঁদের পৃথক পৃথক রাস্তায় এতো দূর করেছিলেন। তাঁদের কাজ সেইসব লোককেও প্রভাবিত করেছিল যাঁরা অধিষ্ঠিত

ধর্ম ত্যাগ করেননি ; ঐ কাজ এমনকি খোদ ধর্মাধিষ্ঠানের মেজাজেও প্রভাব ফেলেছিল। আঠারো শতকে ও উনিশ শতকে ফ্রান্সে ক্যাথলিক গির্জার পার্থক্য লক্ষ্য করুন। ভল্‌তেয়ার, রুসো, দিদ্‌রো ও তাঁদের সহযোদ্ধাদের কাজ ছাড়া ঐ গির্জার সংস্কার কি সম্ভব হতো? "খ্রিস্টীয় গির্জাগুলো" (আমি লর্ড মর্লে [১৮৩৮–১৯২৩]–কে উদ্ধৃত করছি) "তাদের বিধিবিধান অনুসারে যতো দ্রুত সম্ভব আত্মস্থ করে নিচ্ছে নতুন আলোক ও উদারতর নৈতিক বোধ ; এবং যাঁরা সব গির্জা ত্যাগ করেছেন এবং যাঁদেরকে মানুষের আত্মার শত্রু বলে নিয়মিত প্রকাশ্যে অভিযুক্ত করা হয়, সেসব আচার্যদের উন্নততর আধ্যাত্মিকতাও গির্জাগুলো আত্তীকরণ করছে"।

ইংল্যান্ডে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ঈশবাদী চিন্তাভাবনা ফ্রান্সের মতো একই বুদ্ধিবৃত্তিক পরিণতি লাভ করেনি। তবুও শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজ দার্শনিক [ডেভিড] হিউম [১৭১১–১৭৭৬] দেখিয়ে দেন যে, ব্যক্তি–ঈশ্বরের সপক্ষে যেসব যুক্তি সচরাচর দেওয়া হয়ে থাকে সেগুলি মেনে নেয়ার যোগ্য নয়। আমি বরং অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে তাঁর আলোচনা (যা তাঁর *এসে অন মিরাক্‌ল্‌স* [অলৌকিক ঘটনাবলী নিয়ে নিবন্ধ] গ্রন্থে এবং তাঁর দার্শনিক রচনা *ইন্‌কোয়্যারি কন্‌সার্নিং হিউম্যান আন্ডার্স্ট্যান্ডিং* [মানব বোধ সংক্রান্ত অনুসন্ধান] (১৭৪৮)–এ বিধৃত তা) নিয়ে প্রথম কথা বলি। এত দিন পর্যন্ত অলৌকিক ঘটনাবলীর বিশ্বাসযোগ্যতাকে ধর্মশাস্ত্রীয় অনুমানগুলোর বাইরে স্বাধীনভাবে কোনো সাধারণ পরীক্ষা–নিরীক্ষার বিষয় করা হয়নি। ১. প্রত্যেক অলৌকিক ঘটনার বিপরীতে একটি অভিন্ন অভিজ্ঞতা থাকতে হবে (অন্যথায় ঘটনাটি অলৌকিক নামের যোগ্যই হতো না), এবং ২. অভিজ্ঞতার বিরোধী নয় এমন ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করতে যে ধরনের সাক্ষ্য দরকার হয় তার চেয়ে শক্তিশালী সাক্ষ্য প্রয়োজন হবে অলৌকিক ঘটনা প্রমাণের জন্য—এ দুটি বিষয় উল্লেখ করে হিউম এই সাধারণ সূত্র নির্ণয় করেন যে,

> একটি অলৌকিক ঘটনার সত্যতা নিষ্পন্ন করার জন্য কোনো সাক্ষ্যই যথেষ্ট নয়, যদি না সে সাক্ষ্য এমন ধরনের হয় যে সেটি মিথ্যা হলে তা হবে যে ঘটনা সে প্রমাণ করতে চেষ্টিত তার চেয়েও বেশি অলৌকিক।

কিন্তু সত্য হচ্ছে এই যে, এমন কোনো সাক্ষ্যের অস্তিত্ব নেই যার অসত্যতা হবে পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। আমরা ইতিহাসে এমন কোনো অলৌকিক ঘটনার সাক্ষাৎ পাই না, যার সপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন যথেষ্ট সংখ্যক মানুষ যাঁদের প্রশ্নাতীত সুবিবেচনা, সুশিক্ষা ও সদজ্ঞান আমাদেরকে সব রকম প্রতারণা থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখে ; যাঁদের নিঃসন্দিগ্ধ সচ্চরিত্রতা তাঁদেরকে অন্যদের প্রতারিত করার কোনো অভিসন্ধির যাবতীয় সন্দেহের ঊর্ধ্বে স্থাপন করে ; সকল মানুষের দৃষ্টিতে যাঁদের এরূপ সুনাম রয়েছে যে, কোনো মিথ্যাচারে জড়িত বলে ধরা পরলে তাঁদের বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে, এবং যুগপৎ এটাও দরকার যে তাঁরা সাক্ষ্য দেবেন এমন সব ঘটনার সপক্ষে যেগুলো সম্পাদিত হচ্ছে এমনই প্রকাশ্যে যে [প্রতারণামূলক কিছু থাকলে] ধরা পড়া এড়ানো না যায়। এই সমুদয় পারিপার্শ্বিকতাই আবশ্যক মানুষের সাক্ষ্য সম্পর্কে আমাদেরকে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য।

হিউমের *ডায়ালগ্‌স অন ন্যাচ্‌রাল রিলিজ্যন* [স্বাভাবিক ধর্ম সম্পর্কে কথোপকথন] তাঁর মৃত্যুর (১৭৭৬) আগে প্রকাশিত হয়নি। এই রচনায় তিনি 'আর্গুমেন্ট ফ্রম ডিজাইন' (argument from design) [বিশ্বপরিকল্পনার পেছনে কোনো চৈতন্য সক্রিয়]—এই

যুক্তিকে আক্রমণ করেন। এটিই সেই যুক্তি যার উপর খ্রিস্টান ও ঈশবাদী উভয়ই নির্ভর করতেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য। যুক্তিটি এ রকম : জগতে পরিকল্পনার চিহ্ন পরিষ্কার দৃশ্যমান, এবং উদ্দেশ্যের সাথে উপায়কে খাপ খাওয়ানোর অসংখ্য দৃষ্টান্তও বিদ্যমান—এই ব্যাপারটিকে এক শক্তিশালী চৈতন্য কর্তৃক প্রণীত সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রসূত বলেই মাত্র ব্যাখ্যা করা যায়। হিউম যুক্তিটিকে এই ভিত্তিতে আক্রমণ করেন যে, কেবলমাত্র একজন বুদ্ধিসম্পন্ন সত্তা উক্ত ফল [অর্থাৎ জগতের অস্তিত্ব] ব্যাখ্যা করার জন্য কারণ হিসেবে যথেষ্ট নয়। কেননা যুক্তিটি এই হওয়া উচিত যে, বস্তুজগতের গঠনতন্ত্র কারণ হিসেবে দাবি করে পরস্পর-সংশ্লিষ্ট ধারণাসমূহের একটি অনুরূপ তন্ত্র ; কিন্তু এরূপ একটি চৈতন্যতন্ত্র আবার বস্তুজগতের মতোই তার অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দাবি করবে ; এবং এভাবে আমরা এক অন্তহীন কারণমালার সাথে দায়বদ্ধ হয়ে পড়ি। কিন্তু যাই হোক, এমনকি যদি 'পরিকল্পনার যুক্তি' (argument from design) সত্যও হতো, তাহলে তা প্রমাণ করতো এমন একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব যার শক্তিসামর্থ্য মানুষের চেয়ে বেশি হলেও, সম্ভবত খুবই সীমিত হতো, এবং যার কারিগরি দক্ষতাও হতো অতীব অসম্পূর্ণ, কারণ উচ্চতর মানের তুলনায় এই জগৎটা হয়তো খুবই ত্রুটিপূর্ণ। এটি (অর্থাৎ বিশ্বভুবন) হয়তো "কোনো শিশু দেবতার" প্রথম অদক্ষ পরীক্ষা, "সে দেবতা পরে নিজের ত্রুটিযুক্ত কাজে লজ্জিত হয়ে এটিকে পরিত্যাগ করে গেছে।" অথবা এটি এক নিম্নপদস্থ দেবতার কীর্তি যা দেখতে পেলে তার উপরওয়ালা উপহাস করতো। অথবা এটি কোনো পেনশনপ্রাপ্ত বৃদ্ধ দেবতার তৈরি জিনিস যা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই দেয়া প্রথম প্রবর্তনা থেকে এক দুঃসাহসিক জীবনধারা অনুসরণ করে চলেছে। যে যুক্তি এরকম দেবতাদেরকে প্রতিযোগিতায় ফেলে দেয় তা ঈশবাদ বা খ্রিস্টধর্মের প্রয়োজনের জন্য অকেজো অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

সাধারণ জনগণের উপর হিউমের সংশয়বাদী দর্শনের প্রভাব এডওআর্ড গিবন [১৭৩৭–১৭৯৪]–এর *ডেক্লাইন অ্যাণ্ড ফল অফ দ্য রোমান এম্পায়ার* [রোমান সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন] [১৭৭৬–১৭৮৮]–এর চেয়ে কম ছিল। আঠারো শতকে ইংল্যাণ্ডে যে প্রচুর সংখ্যক মুক্তচিন্তার বই বেরিয়েছিল তার মধ্যে এই একখানিই মাত্র আজও ব্যাপকভাবে পঠিত ধ্রুপদী সাহিত্য। ড. স্যামুএল জনসন [১৭০৯–১৭৮৪]–এর এক বান্ধবী যে দুটো অধ্যায়কে "দুটি আক্রমণাত্মক অধ্যায়" বলে উল্লেখ করেছিলেন, সেই ১৫শ ও ১৬শ অধ্যায়ে খ্রিস্টধর্মের উত্থান ও সাফল্যের কারণগুলো সাধারণ ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে এই প্রথম বারের মতো সমালোচনামূলক ভঙ্গিতে অনুসন্ধান করা হয়। ঐ সময়ের অধিকাংশ মুক্তচিন্তা চর্চাকারীদের মতো গিবনও অধিষ্ঠিত ধর্মের প্রতি ব্যাজস্তুতিমূলক মেকি শ্রদ্ধা নিবেদন করে নির্যাতনের সম্ভাবনার বিপরীতে নিজেকে ও তাঁর গ্রন্থকে রক্ষা করা উচিত বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু যদি এরকম কোনো বিপদ নাও থাকতো, তাহলেও গোঁড়া ধর্মমতের নির্মম সমালোচনায় যে শ্লেষ তিনি চূড়ান্ত স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে প্রয়োগ করেছিলেন তার চেয়ে অধিকতর মর্মভেদী কোনো অস্ত্র বেছে নিতে পারতেন না। গিবন প্রথমেই উল্লেখ করেন যে, খ্রিস্টধর্মের বিজয়ের সুস্পষ্ট ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হচ্ছে ঐ ধর্মের তত্ত্বসমূহের নিঃসন্দেহ প্রমাণ এবং ঐ ধর্মের প্রণেতা স্বয়ং ঈশ্বরের কর্তৃত্বময় তত্ত্বাবধান। একথা বলার পর তিনি "যথাযোগ্য বিনয়াবনত" ভক্তিতে [খ্রিস্টধর্মের বিজয়ের] গৌণ কারণগুলোর অনুসন্ধানে উদ্যোগী হয়েছেন। তিনি সম্রাট

কনস্তান্তিন [খ্রি. ৩০৬–৩৩৭]–এর সময় পর্যন্ত ঐ ধর্মের ইতিহাস এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যাতে পরিষ্কার ইঙ্গিত রয়েছে যে দৈব হস্তক্ষেপের অনুমান অবান্তর এবং আমাদেরকে সম্পূর্ণ মানবিক ঘটনাবলী নিয়েই কাজ করতে হবে। দৈব অতিপ্রাকৃত নিয়ন্ত্রণের অনুকূলে কথিত প্রমাণের বিরুদ্ধে স্পষ্ট আপত্তিগুলি তিনি শ্লেষাত্মক প্রতিবাদ সহকারে একত্র সন্নিবিষ্ট করেছেন। গিবন নিজে মোজেস [মুসা] ও অন্য পয়গম্বরদের সমালোচনা করেননি, কিন্তু তাঁদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে "নস্টিকদের বৃথা বিজ্ঞানে" যেসব আপত্তি তোলা হয়েছিল সেগুলো পুনরুপস্থাপন করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, অমরত্বের তত্ত্ব মোজেসের নিয়মে বাদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এটি নিঃসন্দেহে বিধির এক রহস্যময় বিধান। "খ্রিস্টধর্মে প্রথম দীক্ষিতদের বিরুদ্ধে অজ্ঞতা ও অপরিচিতির যে দোষ অন্যায় ঔদ্ধত্যের সাথে আরোপ করা হয়েছে," তা আমরা সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে পারবো না, কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই "ঐ কলঙ্কের ঘটনাকে প্রশংসনীয় বিষয়ে রূপান্তরিত করতে হবে" এবং স্মরণ রাখতে হবে যে, "প্রথম খ্রিস্টানদের পার্থিব অবস্থাকে আমরা যতো নিচে চেপে রাখবো ততই আমরা তাদের গুণ ও সাফল্যের প্রশংসা করার যুক্তি খুঁজে পাবো"।

বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে গিবন যেভাবে অলৌকিক ঘটনার আলোচনা করেছেন (তিনি এ ব্যাপারে মিড্‌লটনের কাছে যথেষ্ট ঋণী ছিলেন, উপরে পৃ. ৭৩ দেখুন) তা ছিল বিশেষভাবে অস্বস্তিকর। খ্রিস্টধর্মের প্রথম যুগে—

> ধর্মাধিষ্ঠানের উপকারার্থে প্রাকৃতিক নিয়মকে ঘন ঘন বাতিল করা হতো। কিন্তু প্রাচীন গ্রীস ও রোমের বিজ্ঞজনেরা ভীতিকর দৃশ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন এবং জীবনের সাধারণ কাজকর্মে ও অধ্যয়নে নিয়োজিত থেকে তাঁরা পৃথিবীর নৈতিক বা বাস্তব পরিচালনায় কোনো পরিবর্তনের ব্যাপারে অচেতন আছেন বলে মনে হতো। রোমান সম্রাট তিবেরিয়াস [খ্রি. ১৪–৩৭]–এর রাজত্বকালে গোটা পৃথিবী, অথবা অন্তত রোমান সাম্রাজ্যের একটা বিখ্যাত প্রদেশ তিন ঘন্টার জন্য এক অতিপ্রাকৃত অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। এমন কি এই অলৌকিক ঘটনা যা মানুষের বিস্ময়, কৌতূহল এবং ভক্তির উদ্রেক করতে পারতো, তাও ঐ বিজ্ঞান ও ইতিহাসের যুগে অলক্ষিত অবস্থায় অতিবাহিত হয়ে যায়। এটি ঘটেছিল সেনেকা [আ. খ্রি. পূ. ৪–খ্রি. ৬৫]–র ও জ্যেষ্ঠ প্লিনি [আনু. খ্রি. ২৩–৭৯]–র জীবনকালে, যাঁরা নিশ্চয়ই ঐ বিস্ময়কর ঘটনার সরাসরি ফল ভোগ করেছিলেন, কিংবা তার প্রথমতম খবর পেয়েছিলেন। এই দুই দার্শনিকের প্রত্যেকেই কঠোর পরিশ্রমে একটি করে বই লিখেছিলেন এবং তাতে সব বড় বড় প্রাকৃতিক ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তার মধ্যে ছিল ভূমিকম্প, উল্কা, ধূমকেতু, ও চন্দ্রসূর্যের গ্রহণসমূহ—লেখকের অক্লান্ত কৌতূহল সেসব ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ করতে পেরেছিল। পৃথিবীর সৃষ্টিকাল থেকে আজ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সকল ঘটনার মধ্যে মহত্তম যে ঘটনা [অর্থাৎ সম্রাট তিবেরিয়াসের আমলের ঐ মহা অন্ধকার] মানুষের নশ্বর চক্ষু প্রত্যক্ষ করেছে, তা উল্লেখ করতে ঐ দুজনই অপারগ হয়েছেন।

কিভাবে "আমরা ঐসব প্রমাণের প্রতি পৌত্তলিক ও দার্শনিক বিশ্বের অলস অমনোযোগ ক্ষমা করবো—যেসব প্রমাণ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর স্বহস্তে তাদের যুক্তির কাছে নয়, বরং ইন্দ্রিয়ের কাছে পেশ করেছিলেন ?

আবার, প্রত্যেক বিশ্বাসী ব্যক্তি যেমন অলৌকিক ঘটনার বাস্তবতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ, তেমনি প্রত্যেক যুক্তিবাদী মানুষ সেগুলোর বন্ধ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে নিঃসন্দেহ। তবুও প্রত্যেক যুগই অলৌকিক ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে এবং সে সাক্ষ্য তার আগের যুগের সাক্ষ্য অপেক্ষা কম শ্রদ্ধেয় নয় বলে মনে হয়। কখন থেকে অলৌকিক ঘটনা ঘটা বন্ধ হয়ে গেছে? এটা কেমন করে সম্ভব হলো যে শেষ অকৃত্রিম অলৌকিক ঘটনাবলী যে প্রজন্ম ঘটতে দেখেছিল, তারা সেগুলোকে পরবর্তী কালের জালিয়াতি থেকে পৃথক করতে পারেনি? লোকেরা কি "স্বর্গীয় শিল্পীর শৈলী" এত দ্রুতই বিস্মৃত হয়েছিল? অতএব সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, খাঁটি ও ভুয়া অলৌকিক ঘটনার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা অসম্ভব। কিন্তু প্রথম দিকের বিশ্বাসীদের মধ্যে যে সরলতা বা "মেজাজের কোমলতা" ছিল তা সত্য ও ধর্মের জন্য মঙ্গলজনক হয়েছিল।

> আধুনিক কালে এক ধরনের প্রচ্ছন্ন, এমনকি অনিচ্ছাজাত, সংশয়বাদ সবচেয়ে ধার্মিক লোকদের মধ্যেও বিদ্যমান থাকে। অতিপ্রাকৃত সত্যের প্রতি তাঁদের স্বীকৃতি যতোটা না সক্রিয় সম্মতি, তারচেয়ে বেশি হলো শীতল ও অসাড় মৌন বশ্যতা। দীর্ঘকাল ধরে প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় শৃঙ্খলা পর্যবেক্ষণ করতে ও তাকে শ্রদ্ধা করতে অভ্যস্ত আমাদের যুক্তি, কিংবা অন্ততঃ আমাদের কল্পনা, ঈশ্বরের দৃশ্যমান কাজ মেনে নেওয়ার মতো যথেষ্ট প্রস্তুত নয়।

পরের শতকে গিবনের তথ্য-উৎসগুলির উপর যে ধরনের সূক্ষ্ম সমালোচনাধর্মী শ্রম ব্যয় করা হয়েছিল, সে সুবিধা গিবনের ছিল না; কিন্তু প্রথম দিকের খ্রিস্টীয় গির্জার প্রথাগত ইতিহাসের যে সুদক্ষ আবরণ-মোচন তিনি করেছিলেন, তা বেশির ভাগ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আজও সঠিক। আমি সন্দেহ করি, ভল্‌তেয়ারের তীরন্দাজির চেয়ে গিবনের কামানের গোলা পরের প্রজন্মগুলির বুদ্ধিমান অংশের মনের উপর বেশি কার্যকর হয়েছিল। কারণ তাঁর গ্রন্থখানি মধ্যযুগের মহৎ ইতিহাস হিসেবে অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল; সবচেয়ে গোঁড়া ধার্মিকেরাও এটি ছাড়া চলতে পারতো না; এবং যে বিষ এতে নিহিত ছিল, তা নিশ্চয় প্রায়ই কাজ করতো।

আমরা দেখলাম আঠারো শতকের প্রথমার্ধের ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্ক কিভাবে এই প্রশ্নের মুখোমুখী হলো যে, প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক ধর্মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও মানিয়ে নেওয়ার যোগ্য ছিল কিনা। এই লাইনে ঈশবাদী আক্রমণ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায় এবং নৈষ্ঠিক গোষ্ঠী ভাবলো সেগুলির সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু প্রত্যাদেশ যে যুক্তিসহ সেটি প্রদর্শনের জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। এটা প্রমাণ করা প্রয়োজন ছিল যে, প্রত্যাদেশ বাস্তব সত্য এবং তা দৃঢ় ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ প্রশ্নটিই হিউম ও মিড্‌লটন (১৭৪৮) কৃত অলৌকিক ঘটনাবলীর সমালোচনায় তীব্রভাবে উঠে এসেছিল। সবচেয়ে শক্তিশালী উত্তরটি দিয়েছিলেন উইলিয়ম প্যালি [Paley] [১৭৪৩–১৮০৫] তাঁর *এভিডেন্সেস অফ ক্রিশ্চিআনিটি* [খ্রিস্টধর্মের প্রমাণাদি (১৭৯৪)] গ্রন্থে। ঐ যুগে ধর্মের সমর্থনে কৈফিয়তমূলক রচনাসমূহের মধ্যে এটিই একমাত্র বই যা এখনো [বিশ শতকের গোড়ার দিকে] পড়া হয়, যদিও এর এখন আর কোনো মূল্য নেই। সময়ের মেজাজ কেমন করে অচেতনভাবেই নিষ্ঠাবান ধার্মিকদের মতামতকে রঞ্জিত করেছিল, তার উদাহরণ হচ্ছে প্যালির ধর্মতত্ত্ব। তিনি তাঁর *ন্যাচ্‌রাল থিঅলজি* [স্বাভাবিক ধর্মতত্ত্ব] গ্রন্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন 'পরিকল্পনার যুক্তি' দেখিয়ে এবং ঐ যুক্তির বিরুদ্ধে হিউমের

সমালোচনাকে হিসেবের মধ্যে না নিয়ে। ঠিক যেমন একটা ঘড়ির অস্তিত্ব থেকে ঘড়ি প্রস্তুত কারকের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়, তেমনি প্রকৃতির বিবিধ কৌশল থেকে জনৈক স্বর্গীয় কারিগরের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। এরকম কৌশলের নজিরগুলো প্যালি প্রধানত মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও গঠনতন্ত্র থেকে নিয়েছেন। তাঁর ধারণায় ঈশ্বর একজন উদ্ভাবনক্ষম কৌশলী যিনি অবাধ্য পদার্থ নিয়ে কাজ করছেন। প্যালির "ঈশ্বর", (মি. লেস্‌লি স্টিফেন [১৮৩২–১৯০৪] মন্তব্য করেছিলেন,)

> মানুষের মতোই সুসভ্য ; তিনি বিজ্ঞানমনস্ক ও উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারীও হয়েছেন ; নানা যান্ত্রিক ও রাসায়নিক কৌশল উদ্ভাবনে তিনি জেমস ওয়াট [১৭৩৬–১৮১৯] ও জোসেফ প্রিস্ট্‌লি [১৭৩৩–১৮০৪]–র চেয়ে বড় এবং সে জন্য ওয়াট ও জোসেফ প্রিস্ট্‌লি যে প্রজন্মের বিশিষ্ট আলোকস্বরূপ ছিলেন, সেই প্রজন্মের ভাবমূর্তিতেই তাঁকে বানানো হয়েছে।

যখন এ জাতীয় একজন ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তখন অলৌকিক ঘটনার ব্যাপারে আর কোনো জটিলতা থাকে না ; এবং অলৌকিক ঘটনাবলীর উপরেই প্যালি তাঁর খ্রিস্টধর্মের সমর্থনপ্রয়াসকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—অন্য সকল যুক্তি সহায়ক মাত্র। *নিউ টেস্টামেন্টে* বর্ণিত অলৌকিক ঘটনাবলীর প্রমানস্বরূপ তিনি বলেন যে, প্রত্যক্ষদর্শী খ্রিস্টশিষ্যরা সেগুলোকে বিশ্বাস করেছিলেন, অন্যথায় তাঁরা তাঁদের নতুন ধর্মের জন্য কাজ করতেন না এবং দুঃখকষ্টও সহ্য করতেন না। ধর্মের সপক্ষে প্যালি যে জবাব দিয়েছেন তা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের একজন সুদক্ষ আইন উপদেষ্টার কাজ।

আঠারো শতকের ঈশবাদ–প্রভাবিত ইংরেজ লেখকদের এই তালিকার শেষে এমন একজন আছেন যাঁর নাম তাঁর পূর্বসূরিদের যে কারো চেয়ে বেশি পরিচিত। তিনি হচ্ছেন টমাস পেইন [১৭৩৭–১৮০৯]। নর্‌ফোকের লোক পেইন আমেরিকায় অভিবাসী হয়ে সেখানকার বিপ্লবে এক প্রধান ভূমিকা পালন করেন। তারপর তিনি ইংল্যান্ডে ফেরেন এবং ১৭৯১ সালে প্রকাশ করেন তাঁর *রাইটস অফ ম্যান* [মানুষের অধিকার] দুই খণ্ডে। আমি শুধু, বলতে গেলে একচেটিয়াভাবে, ধর্মের ক্ষেত্রেই চিন্তার স্বাধীনতার কথা আলোচনা করে আসছি, কারণ সাধারণভাবে চিন্তার তাপমান যন্ত্র হিসেবে এটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। এ সময়ে রাজনীতিতে বিপ্লবী মতামত প্রকাশ করা ধর্মতত্ত্বে তা করার মতোই বিপজ্জনক ছিল। পেইন সোৎসাহে আমেরিকান সংবিধানের গুণকীর্তন করতেন এবং তিনি ফরাসি বিপ্লবেরও একজন সমর্থক ছিলেন (এই বিপ্লবেও তিনি একটি ভূমিকা নিয়েছিলেন)। তাঁর *রাইটস্ অফ ম্যান* ছিল রাজতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগনামা এবং প্রতিনিধিত্ববান গণতন্ত্রের পক্ষে ওকালতি। বইটি বিপুলভাবে বিক্রি হচ্ছিল, এর একটি সস্তা সংস্করণও বেরিয়েছিল, এবং এটি দরিদ্রতর শ্রেণীর নাগালের মধ্যে রয়েছে দেখে সরকার মামলা করার সিদ্ধান্ত নিল। পেইন ফ্রান্সে পালিয়ে গেলেন, কালে [Calais] শহরে এক চমৎকার গণসম্বর্ধনা পেলেন এবং সেখান থেকে ফ্রান্সের 'ন্যাশনাল কনভেনশনে' [জাতীয় সভা] ডেপুটি নির্বাচিত হলেন। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে ইংল্যান্ডে তাঁর বিচার শুরু হলো ১৭৯২ সালের শেষে। তাঁর বই–এর যেসব অংশের উপর ভিত্তি করে ঐ অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল সেগুলো ছিল এই :

১. সকল বংশগত শাসনই প্রকৃতিগতভাবে পীড়নমূলক।

২. সেদিন বেশি দূরে নয় যখন ইংল্যান্ড, নিজেকেই উপহাস করবে [নিজের রাজার অভাব পূরণ করতে] হল্যান্ড, হ্যানোভার, জেল (Zell), কিংবা ব্র্যান্সউইকে লোক (অর্থাৎ রাজা ৩য় উইলিয়ম [রাজ. : ১৬৯৪–১৭০২] এবং রাজা ১ম জর্জ [রাজ. ১৭১৪–১৭২৭]-কে) ডেকে পাঠানোর জন্য, যেসব লোকের পেছনে বছরে দশ লাখ পাউণ্ড খরচ, যারা ইংল্যান্ডের আইন, ভাষা, বা স্বার্থ কিছুই বুঝতো না, এবং যাদের যোগ্যতা প্যারিসের [যাজক–পল্লী] রক্ষীর পদ পাওয়ার জন্য যথেষ্ট কিনা সন্দেহ। শাসন কাজ যদি এ জাতীয় লোকের হাতে ন্যস্ত করা চলে, তাহলে সে কাজ নিশ্চয়ই একটা সহজ ও সরল জিনিস বলতে হবে, এবং ঐ সকল উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ইংল্যান্ডের প্রত্যেক শহর ও গ্রামে পাওয়া যেতে পারে।

পেইনের কৌসুলি ছিলেন হেনরি এস্কিন [১৭৪৬–১৮১৭] যিনি বাক্–স্বাধীনতার সমর্থনে একটা সুন্দর বক্তৃতা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন :

> বাধ্য করা থেকেই জন্ম নেয় প্রতিরোধ, এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ যে, যুক্তি তাদের পক্ষে নয় যারা এটি ব্যবহার করে। সুধীমণ্ডলী, আপনারা সবাই নিশ্চয়ই লুসিয়ানের চমৎকার গল্পটি স্মরণ করতে পারছেন : জুপিটার [বৃহস্পতি গ্রহের অধিষ্ঠাতা রোমান দেবতা] ও জনৈক গ্রামবাসী একসাথে হাঁটতে হাঁটতে স্বর্গ ও মর্ত্য সম্পর্কে আলাপ করছিলেন। কথা বলার প্রভূত স্বাধীনতা এবং বিষয় সম্পর্কে প্রচুর জানাশোনা নিয়েই এ আলাপ চলছিল। গ্রাম্য লোকটি মনোযোগ ও নীরব সম্মতির সাথে শুনছিলেন আর জুপিটার শুধু চেষ্টা করছিলেন তার বিশ্বাস উৎপাদনের। কিন্তু লোকটি একটি সন্দেহের ইঙ্গিত করতেই জুপিটার সাথে সাথে ঘুরে দাঁড়ালেন এবং লোকটিকে তাঁর বজ্রের ভয় দেখালেন। "আঃ হা !" গ্রাম্য লোকটি বললো, "জুপিটার, এখন আমি বুঝলাম তুমি ভুল বলছো ; [কারণ] যখনই তুমি তোমার বজ্র ওঁচাও, তখন তুমি অবশ্য ভ্রান্তই থাকো।" আমার অবস্থাটা এই রকমই। আমি ইংল্যান্ডের জনগণের সাথে যুক্তিতর্ক করতে পারি, কিন্তু কর্তৃত্বের বজ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি না।

বিচারে পেইন অপরাধী সাব্যস্ত হন এবং [ইংল্যান্ডে] বেআইনি ঘোষিত হন। শীঘ্রই তিনি এক নতুন অপরাধ করে বসলেন। সেটি হচ্ছে খ্রিস্টধর্মবিরোধী বই '*এজ অব রিজন* [যুক্তির যুগ'] প্রকাশ (১৭৯৪ ও ১৭৯৬)। এটি তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন প্যারিসের কারাগারে বসে যেখানে তাঁকে পাঠিয়েছিলেন রোবস্পিয়্যার [১৭৫৮–৯৪ ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম ডিক্টেটর]। বইটি অসাধারণ এজন্য যে এটি ইংরেজি ভাষায় প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা যাতে খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিক মুক্তির পরিকল্পনা এবং *বাইবেল* গ্রন্থকে নিরাভরণ ভাষায় আক্রমণ করা হয়েছে, কোনো ছদ্মাবরণ বা বাক্‌সংযম অবলম্বন করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, এটি এমনভাবে লেখা হয়েছিল যাতে গণমানুষের কাছে পৌঁছায়। এবং তৃতীয়ত, বাইবেলের বিরুদ্ধে পেইনের সমালোচনা আগের ঈশবাদীদের মতো সেই একই ধরনের থাকলেও, পেইনই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধারণার সাথে খ্রিস্টীয় কল্পনার সামঞ্জস্যহীনতা জোরের সাথে উপস্থাপন করেছেন।

> যদিও এটি খ্রিস্টীয় ব্যবস্থার কোনো সুস্পষ্ট দফা নয় যে, এই যে–পৃথিবীতে আমরা বাস করি এটিই বসবাসযোগ্য বিশ্বের সবটা, তথাপি এই ধারণাটি ঐ ব্যবস্থার সাথে এমনভাবে গ্রথিত—মোজেসের সৃষ্টি সংক্রান্ত বিবরণ বলে যা কথিত তাতে, ইভ্ ও আপেলের গল্পে, এবং ঐ গল্পের পরিপূরক ঈশ্বরপুত্রের মৃত্যুর কাহিনীতে—যে অন্য কিছু (অর্থাৎ, এ রকম বিশ্বাস করা যে ঈশ্বর অনেক, অন্তত আকাশের তারকারাজীর সমসংখ্যক, বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন) বিশ্বাস করার সাথে সাথে খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব নগণ্য ও হাস্যকর হয়ে পড়ে এবং বাতাসে পালকের মতো তা মনের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। একই মনের ভেতর ঐ দুই বিশ্বাস একত্র-ধারণ করা যায় না ; এবং যিনি মনে করেন যে তিনি ও–দুটোই বিশ্বাস করেন, তিনি আসলে দুটোর কোনোটা নিয়েই ভাবেননি।

একজন উৎসাহী ঈশবাদী হিসেবে পেইন প্রকৃতিকেই ঈশ্বরের প্রকাশিত সত্য বলে মনে করতেন ; তাই তিনি উপরিউক্ত যুক্তিকে বিশেষ জোরের সাথে উপলব্ধি করানোর চেষ্টা করতে পেরেছিলেন। *ওল্ড টেস্টামেন্টের* কোনো কোনো কল্পকথার উল্লেখ করে তিনি বলেন,

> মানব বুদ্ধির চরমতম সীমা যার একটি অংশমাত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম, সেই বোধাতীত সমগ্রকে [অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে] যে সত্তা পরিচালনা ও শাসন করছেন তাঁর অপরিমেয়ত্ব নিয়ে যখন আমরা ভাবি, তখন এ ধরনের তুচ্ছ গল্পগুলোকে 'ঈশ্বরের বাক্য' বলতে আমাদের লজ্জা বোধ করা উচিত।

বইখানির একটি উত্তর দিয়েছিলেন বিশপ ওয়াট্‌সন যিনি ছিলেন আঠারো শতকের সেইসব প্রশংসনীয় ধর্মবেত্তাদের একজন যাঁরা ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের অধিকার স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং মনে করতেন যে, যুক্তিতর্ককে যুক্তিতর্ক দিয়েই মোকাবেলা করা উচিত, শক্তিপ্রয়োগ করে নয়। তাঁর জবাবের একটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ শিরোনাম ছিল, *অ্যান অ্যাপলজি ফর দ্য বাইবল* [বাইবেলের সমর্থন একটি কৈফিয়ত]। [ইংল্যান্ডের রাজা] তৃতীয় জর্জ [রাজ. ১৭৬০–১৮২০] মন্তব্য করেছিলেন যে, ঐ গ্রন্থের জন্য কোনো কেফিয়তের প্রয়োজন আছে একথা তাঁর জানা ছিল না। ধর্মের প্রতিরক্ষা হিসেবে ওয়াটসনের বইটি দুর্বল, তবে এটি তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে এতে বাইবেলের পেইনকৃত সমালোচনার কয়েকটি ব্যাপারে ছাড় দেওয়া হয়েছে—যে স্বীকারোক্তিগুলো বাইবেলের অভ্রান্ততার তত্ত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য কার্যকর ছিল।

এটা নিঃসন্দেহ যে *এজ অব রিজন*–এর প্রচার হওয়ার ফলেই *'সোসাইটি ফর দ্য সাপ্রেশন অব ভাইস'* [অধার্মিকতা দমন সমিতি] নামে একটা সংস্থা বইটির প্রকাশকের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নেয়। শাসক শ্রেণীর মধ্যে অবিশ্বাস সাধারণ ব্যাপার ছিল, কিন্তু এই মত দৃঢ়ভাবে পোষণ করা হতো যে ধর্ম সাধারণ জনগণের জন্য দরকারি এবং নিম্নবর্গের ভেতর অবিশ্বাস ছড়ানোর যেকোনো চেষ্টা অবশ্যই দমন করতে হবে। গরিব জনগণকে শৃংখলার মধ্যে রাখার জন্য ধর্মকে একটি দামি হাতিয়ার বলে মনে করা হতো। লক্ষণীয় যে, প্রথম দিকের যুক্তিবাদীদের মধ্যে (উল্‌স্টনের ঘটনাটি বাদ দিয়ে) একমাত্র যিনি শাস্তি পেয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন পিটার অ্যানেট, একজন স্কুলশিক্ষক, যিনি মুক্তচিন্তাকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করতে গিয়ে 'শয়তানি' (diabolical) মতামত ছড়ানোর অভিযোগে স্তম্ভদণ্ড (pillory) এবং কঠোর শ্রমদণ্ডে দন্ডিত হয়েছিলেন (১৭৬৩)। পেইন মনে করতেন, সকল নতুন ধ্যানধারণা জানতে পারার অধিকার ব্যাপক জনগণের রয়েছে এবং তিনি এমনভাবে

লিখেছিলেন যে, তাঁর বক্তব্য জনগণের কাছে পৌঁছায়। অতএব তাঁর বই অবশ্যই নিষিদ্ধ হতে হবে। বিচারের সময় (১৭৯৭) বিচারক বিবাদীর পক্ষের আইনি বিতর্কের পথে সব রকম বিঘ্ন স্থাপন করেছিলেন। পেইনের প্রকাশকের এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

পেইন সংক্রান্ত মামলা–মোকদ্দমার এখানেই ইতি হয়নি। ১৮১১ সালে '*এজ অব রিজ্যন* এর' তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়, এবং প্রকাশক হটন সাহেবকে আঠারো মাসের কারাবাস ও মাসে একবার শাস্তিস্তম্ভে (pillory) দাঁড়ানোর দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। বিচারক লর্ড এলেনবরো [১৭৫০–১৮১৮] তাঁর অভিযোগে বলেছিলেন, "যে গ্রন্থ আমাদের ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিস্বরূপ তার সত্যতা অস্বীকার করার অনুমতি কদাচ দেওয়া হয়নি"। কবি শেলি [১৭৯২–১৮২২] লর্ড এলেনবরোকে একখানা কঠোর পত্র লিখেছিলেন :

> আপনি কি মনে করেন মি. হটনের অস্তিত্বকে বিষিয়ে তুলে আপনি তাঁকে আপনার ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে পারবেন? আপনি উৎপীড়ন দ্বারা তাঁকে বাধ্য করতে পারেন আপনার মত প্রকাশ্যে সমর্থন করতে, কিন্তু তিনি সেগুলি বিশ্বাস করতে পারবেন না, যদি না আপনি সেগুলিকে বিশ্বাসযোগ্য করেন, যা সম্ভবত আপনার ক্ষমতার বাইরে। আপনি কি মনে করেন যে আপনার অতি উৎসাহের এই প্রদর্শন দ্বারা আপনি আপনার পূজিত ঈশ্বরকে খুশি করবেন? যদি তাই হয়, তাহলে অনেক জাতি যে দানবের উদ্দেশ্যে ব্যাপক নরবলি দেয়, সে দানব সভ্য সমাজের ঈশ্বর অপেক্ষা কম বর্বর।

১৮১৯ সালে '*এজ অব রিজন*' প্রকাশের দায়ে রিচার্ড কার্লাইল [১৭৯০–১৮৪৩]–এর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল এবং তাঁর দণ্ডাদেশ হয়েছিল বিরাট অংকের জরিমানা এবং তিন বছরের কারাবাস। জরিমানা দিতে সক্ষম না হওয়ায় তাঁকে তিন বছর জেলে রাখা হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী ও বোন ব্যবসাটা চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং বইটির বিক্রি অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁদেরও জরিমানা করা হয় এবং অল্প কিছুদিন পর জেলে পাঠানো হয়। তাঁদের দোকান কর্মচারীদের সবারই অনুরূপ শাস্তি হয়।

ইংল্যান্ডে তাঁর প্রকাশকেরা যেমন দুর্ভোগ পোহালেন, তেমনি লেখক পেইন নিজে যন্ত্রণা ভোগ করলেন আমেরিকায়, যেখানে তাঁর জীবনের শেষ বছরগুলো বিষিয়ে তোলার জন্য যা যা করা প্রয়োজন ছিল, অন্ধ গোঁড়ামি তার কোনোটাই বাদ রাখেনি।

জার্মানিতে জ্ঞানদীপ্তির যুগ (age of enlightenment) শুরু হয়েছিল আঠারো শতকের মাঝামাঝি। বেশির ভাগ জার্মান রাজ্যে চিন্তার স্বাধীনতা ইংল্যান্ডের তুলনায় অনেক কম ছিল। ফেড্‌রিক দ্য গ্রেটের বাবার আমলে [১৬৮৮–১৭৪০] দার্শনিক ভোল্‌ফ (wolff) [১৬৭৯–১৭৫৪]–কে প্রুশিয়া থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল এই কারণে যে তিনি চীনা মহাপুরুষ কনফুশিয়াস [আ. ৫৫১–৪৭৯ খ্রি. পূ.]–এর নৈতিক শিক্ষাকে এমন প্রশংসা করেছিলেন যা শুধুমাত্র খ্রিস্টধর্মের জন্যই সংরক্ষিত থাকা উচিত বলে মনে করা হতো। তিনি দেশে ফিরে এসেছিলেন ফ্রেড্‌রিকের সিংহাসনারোহণের পরে, যখন ফ্রেড্‌রিকের সহনশীল শাসনাধীনে প্রুশিয়া মতামতের জন্য প্রতিবেশী দেশগুলোতে নির্যাতিত লেখকদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল। ফ্রেড্‌রিক অবশ্য তখনকার অনেক ইংরেজ যুক্তিবাদীর মতো এই মত পোষণ করতেন—যা এখনো [বিশ শতকের প্রথমে] যথেষ্ট ব্যাপকভাবে পোষণ করা হয়—যে মুক্তচিন্তা গণমানুষের জন্য অভিপ্রেত নয়, কারণ তারা দর্শন বুঝতে অক্ষম। জার্মানিতে

ইংরেজ ঈশবাদীদের, ফরাসি মুক্তচিন্তা চর্চাকারীদের এবং স্পিনোজার প্রভাব অনুভূত হয়েছিল। কিন্তু এই কালপর্বে জার্মান যুক্তিবাদী প্রচারণায় খুব মৌলিক বা আগ্রহজনক কিছু নেই। এডেলমান ও বাহ্‌র্টের নাম করা যায়। এডেলমান বাইবেলের প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার বিষয়টিকে আক্রমণ করে লিখেছিলেন বলে তাঁর বইপুস্তক বিভিন্ন শহরে পোড়ানো হয়েছিল এবং তিনি নিজে বাধ্য হয়েছিলেন বার্লিনে ফ্রেড্‌রিকের আশ্রয় প্রার্থনা করতে। বাহ্‌র্ট ছিলেন ঐ সময়ের অন্য যেকোনো লেখকের চেয়ে বেশি আক্রমণাত্মক। আদিতে একজন ধর্মপ্রচারক হলেও খুব ধীর মাত্রায় তিনি নৈষ্ঠিক ধর্মবিশ্বাস থেকে ক্রমে সরে আসেন। তাঁর *নিউ টেস্টামেন্টের* অনুবাদ যাজক হিসেবে তাঁর পেশাজীবনে অসময়ে যবনিকা টেনে দেয়। তাঁর শেষ জীবন কেটেছিল একজন সরাইখানার মালিক হিসেবে। ধর্মবেত্তাদের মধ্যে বাহ্‌র্টের রচনাবলী যে পরিমাণ ঘৃণার উদ্রেক করেছিল সেটা বিচার করলে বলতে হয় তাঁর লেখাগুলো, উদাহরণস্বরূপ তাঁর জনপ্রিয় *লেটার্স অন দ্য বাইব্‌ল* [বাইবেল সম্পর্কে চিঠিপত্র], নিশ্চয়ই ভালো রকম প্রভাব ফেলেছিল।

যা হোক, সরাসরি যুক্তিবাদী প্রচারণায় নয়, বরং সাহিত্য ও দর্শনেই এ শতকের জার্মান জ্ঞানদীপ্তির অভিব্যক্তি ঘটেছিল। সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট দুই বিদ্বজ্জন, গ্যেটে [১৭৪৯–১৮৩২] (যাঁর উপর স্পিনোজার গভীর প্রভাব ছিল) এবং শিলার [১৭৫৯–১৮০৫], সকল ধর্মায়তনের বাইরে অবস্থান নিয়েছিলেন। আর তাঁদের লেখার, তথা ঐ সময়ের গোটা সাহিত্যিক আন্দোলনের, ফলে মানবীয় অভিজ্ঞতার প্রতি মুক্ততম আচরণের পথ সুগম হয়েছিল।

একজন জার্মান চিন্তানায়ক গোটা দুনিয়াকে নাড়া দিয়েছিলেন। তিনি দার্শনিক ইমানুএল কান্ট্ [১৭২৪–১৮০৪]। তাঁর *ক্রিটিক অফ্ পিওর রিজন* [বিশুদ্ধ যুক্তির সমালোচনা] দেখিয়ে দিলো যে, যখনই আমরা বুদ্ধির আলো দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও আত্মার অমরত্ব প্রমাণ করতে চেষ্টা করি, তখনই নৈরাশ্যজনকভাবে বিভিন্ন অসঙ্গতির মধ্যে পড়ে যাই। 'পরিকল্পনার যুক্তি' এবং সব রকম প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে তাঁর ধ্বংসাত্মক সমালোচনা হিউমের সমালোচনার চেয়ে বেশি পূর্ণাঙ্গ হয়েছিল। আর তাঁর দর্শন, যদিও তাঁর পদ্ধতিটি ভিন্ন ছিল, লকের মতো সেই একই বাস্তব ফল উৎপাদন করেছিল—অর্থাৎ জ্ঞানকে অভিজ্ঞতায় সীমিত রাখা। এটা সত্য যে পরবর্তীকালে নীতিশাস্ত্রের স্বার্থে কান্ট্ পেছন–দরজা দিয়ে সেই ঈশ্বরকেই চোরাপথে ঢোকাতে চেষ্টা করেন, যাঁকে তিনি সদর দরজা থেকে বিদায় করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে প্রচেষ্টা সার্থক হয়নি। তাঁর দর্শন ছিল যুক্তিকে কর্তৃত্বের জোয়াল থেকে মুক্ত করার কাজে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ ; যদিও ঐ দর্শন থেকে উদ্ভূত নতুন নতুন কল্পনামূলক ভাবতন্ত্রে ঈশ্বরের নাম ব্যবহৃত হয়েছে ঈশবাদী ধারণা থেকে অত্যন্ত আলাদা কিছু বোঝাতে।

তথ্যনির্দেশ

১. সহজবোধ্যতার খাতিরে আমি এ বই–এর সর্বত্র 'ডিইস্ট' কথাটি এই অর্থে ব্যবহার করেছি, যদিও আজকাল [1912-14] সাধারণত 'থিইস্ট' শব্দটিই চালু। [তবে বর্তমানে 'ডিইস্ট' শব্দই গ্রন্থাদিতে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।—অনুবাদক]।

২. **মেথডিজ্‌ম** (Methodism) : জন (১৭০৩–৯১) ও চার্ল্‌স ওয়েস্‌লি (১৭০৭–৮৮) এবং জর্জ হোয়াইটফিল্ড (১৭১৪–১৭৭০)–এর ধর্মপ্রচারের ভেতর দিয়ে আঠারো শতকে ইংল্যান্ডে মেথডিজ্‌মের উৎপত্তি ঘটে। ইংল্যান্ডে প্রটেস্ট্যান্ট ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় এর অবস্থান। আগের শতকে হল্যান্ডে

বিকাশিত রিফর্মড ধর্মতত্ত্বের আর্মিনীয় প্রকরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়েই ওয়েস্‌লিরা মেথডিজ্‌মের উদ্ভব ঘটান, যে কারণে এটিকে 'মেথডিস্ট আরমিনিয়ানিজ্‌ম' বলা হয়েছে। পরে মেথডিজ্‌ম আমেরিকা ও আফ্রিকায় বিস্তার লাভ করে।

৩. স্পিনোজার *থিঅলজিক্যাল পলিটিক্যাল ট্রিটিজ* [ধর্মশাস্ত্রীয় রাজনৈতিক গ্রন্থ]–এ ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বইটি ইংরেজিতে ভাষান্তরিত হয় ১৬৮৯ সালে।

৪. এই তারিখ ভুল বলে মনে হয়। কারণ কলিন্স মারাই গিয়েছিলেন ১৭২৯ সালে। *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিট্যানিকা* (১৯৬৮ সং.) বইখানি প্রকাশের তারিখ দিচ্ছে ১৭২৪, যা যুক্তিযুক্ত।

৫. **তিম্বুক্‌তু (Timbuktoo)** : পশ্চিম আফ্রিকান শহর যা এখন 'মালি' রাষ্ট্রের অন্তর্গত। সাহারা মরুভূমির দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত তিম্বুক্‌তু এক সময় নাইজার অববাহিকা ও উর্বর সুদান অঞ্চলের প্রবেশমুখ হিসেবে বাণিজ্যকেন্দ্র রূপে গড়ে উঠেছিল। খ্রিস্টীয় চৌদ্দ শতকের পূর্বেই এখানে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা পায়। মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ এটি একটি ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র তথা মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে বিকাশ লাভ করে। চৌদ্দ শতকেই সোনা ও লবণ ব্যবসায়ের কেন্দ্র হিসেবে তিম্বুক্‌তু ইউরোপে প্রসিদ্ধি পায়।

৬. বাট্‌লারের হেত্বাভাসসমূহ ও কুতর্কজালের আবরণ উন্মোচনের কাজটি সুন্দরভাবে করেছেন বেন। দেখুন–এ ডব্লিউবেন (Benn), *র‍্যাশ্‌নালিজ্‌ম ইন দা নাইন্‌টীনথ সেন্‌চুরি* [উনিশ শতকে যুক্তিবাদ], খ. ১, পৃ. ১৩৮—।

৭. **পিলোরি (Pillory) (শাস্তিস্তম্ভ)** : অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য নির্মিত এক ধরনের যন্ত্র। ভূমি থেকে কয়েক ফুট উপরে অবস্থিত একটি পাটাতনের উপরে স্থাপিত একটা কাঠের খুঁটির সাথে আরেকটি কাঠামো সংলগ্ন থাকতো। 'অপরাধীকে ঐ কাঠামোর পেছনে দাঁড় করিয়ে তার মাথা ও হাত বিভিন্ন ছিদ্র দিয়ে ঢোকানো হতো এবং পায়ে ডান্ডাবেড়ি লাগিয়ে ঐভাবে থাকতে বাধ্য করা হতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যন্ত্রটি বিশাল লোহার ফ্রেমে তৈরি হতো এবং সেখানে কয়েকজন লোককে এক সাথে শাস্তি দেওয়া হতো।

সপ্তম অধ্যায়

যুক্তিবাদের অগ্রগতি
(উনিশ শতক)

নিকোলাস কোপার্নিকাস [১৪৭৩–১৫৪৩]–এর গবেষণায় যার সূত্রপাত সেই আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয় সতেরো শতকে, যে সময়ে কোপার্নিকীয় তত্ত্বের প্রমাণ প্রদর্শন, অভিকর্ষ আবিষ্কার, রক্তসঞ্চালন আবিষ্কার এবং আধুনিক রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের গোড়া পত্তন হলো। ধূমকেতুর সঠিক প্রকৃতি নির্ণীত হলো এবং এই জ্যোতিষ্কগুলিকে ঐশ্বরিক ক্রোধের চিহ্ন বলে মনে করা বন্ধ হলো। কিন্তু কয়েক প্রজন্ম পরে প্রটেস্ট্যান্ট দেশগুলোতে বিজ্ঞান অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধর্মতত্ত্বের এক মহাশত্রুতে পরিণত হয়েছিল। উনিশ শতকের আগ পর্যন্ত প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহ পৃথিবীর গতির মতো ছোটো–খাটো বিষয়েই কেবল ধর্মগ্রন্থের বিরুদ্ধ বলে মনে হতো এবং এ সব অসামঞ্জস্য ধর্মগ্রন্থগুলোর নতুন ব্যাখ্যার সাহায্যে উড়িয়ে দেয়া যথেষ্ট সহজ ছিল। তথাপি অসাধারণ ঘটনার সংখ্যা বাড়তে লাগলো, যেগুলোর ব্যাখ্যা যদিও বিজ্ঞানে ছিল না, কিন্তু সেগুলো বাইবেলীয় ইতিহাসের বিশ্বস্ততার প্রতি হুমকি বলে প্রতীয়মান হলো। যদি নূহের জাহাজ ও মহাপ্লাবনের গল্প সত্য হয়, তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব হলো যে, সাঁতরাতে বা উড়তে পারে না এমন জীবজন্তু আমেরিকায় এবং মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে বাস করে? নতুন বিশ্বে [আমেরিকা, পশ্চিম গোলার্ধের দ্বীপসমূহ, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি] সতত যেসব অভিনব প্রজাতি আবিষ্কৃত হচ্ছে অথচ যারা পুরোনো বিশ্বে [এশিয়া, ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা] ছিল না, তাদের সম্পর্কেই বা কি বলা যাবে? অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙ্গারুরা সেখানে কোথা থেকে পড়লো? আপ্ত ধর্মতত্ত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একমাত্র ব্যাখ্যা মনে হয় এই উপকল্প (hypothesis) যে মহাপ্লাবনের পরে অসংখ্য নতুন সৃষ্টিকর্ম করা হয়েছে। প্রাকৃতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রটিতেই আঠারো শতকের বিজ্ঞানসেবী মানুষেরা [ধর্মীয়] কর্তৃপক্ষের উৎপীড়নে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ পুইয়েছেন। সুইডেনে ক্যারোলাস লিনীউস (Linnaeus) [১৭০৭—৭৮] এটা উপলব্ধি করেছিলেন, এবং ফ্রান্সে করেছিলেন জর্জ বুফোঁ (Buffou) [১৭০৭—১৭৮৮]। বুফোঁ তাঁর *ন্যাচ্‌রাল হিস্ট্রি* [প্রাকৃতিক ইতিহাস] (১৭৪৯) গ্রন্থে পৃথিবীর গঠন সম্পর্কে যেসব উপকল্প উপস্থাপন করেছিলেন সেগুলি প্রত্যাহার করতে এবং বাইবেলীয় সৃষ্টিকাহিনীকে তিনি সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করেন এই মর্মে বিবৃতি দিতে তাঁকে বাধ্য করা হয়েছিল।

উনিশ শতকের শুরুতে পিয়্যার লাপ্লাস [১৭৪৯–১৮২৭] নীহারিকা উপকল্প ভিত্তি করে মহাবিশ্বের নির্মাণকৌশল ব্যাখ্যা করলেন। নেপোলিয়ন [১৭৬৯–১৮২১]–কে তিনি বলেছিলেন যে তাঁর গবেষণার ফলাফল ঈশ্বর সংক্রান্ত উপকল্পের প্রয়োজন শেষ করে দিয়েছে। ফলে ঐ ফলাফল যথারীতি নিন্দিত হলো। তাঁর তত্ত্ব অনুসারে পৃথিবী ও সৌর জগৎ গঠিত হওয়ার

আগে এক দীর্ঘ ভৌত প্রক্রিয়া চলেছিল। কিন্তু এটি ধর্মশাস্ত্রের জন্য মারাত্মক হয়নি, কারণ সামান্য উদ্ভাবনী দক্ষতা দিয়ে বাইবেলের জেনেসিস [উৎপত্তি]–এর প্রথম অধ্যায়ের বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখা যেতে পারতো। সৃষ্টি ও মহাপ্লাবনের বাইবেলীয় গল্পের আরো জবরদস্ত দুশমন হিসেবে দেখা দিলো ভূ–বিজ্ঞান। জনৈক ফরাসি প্রকৃতি বিজ্ঞানী (কুভিএ [(Cuvier)১৭৬৯–১৮৩২])–র দেওয়া 'পৃথিবী একের পর এক অনেক মহাবিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে গেছে যার প্রত্যেকটির পরে একটি নতুন সৃষ্টিকর্মের প্রয়োজন হয়েছে'—এই তত্ত্ব কিছুদিনের জন্য ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপে বিশ্বাস টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিল। আবার মহাবিপর্যয়ের অনুমান নাকচ করতে চার্ল্‌স লিয়েল (Lyell) [১৭৯৭–১৮৭৫] তাঁর *প্রিন্সিপ্‌ল্‌স অফ জিঅলজি* [ভূবিজ্ঞানের মূল কথা] (১৮৩০) গ্রন্থে দেখালেন যে এখনো আমাদের চোখের সামনে চলতে থাকা প্রক্রিয়া দিয়েই পৃথিবী গ্রহের ইতিহাস ব্যাখ্যা করা চলে ; তবু তিনি পরপর সংঘটিত ধারাবাহিক সৃষ্টিকর্মের ধারণায় অবিচল থাকেন। এর অনেকদিন পর ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত *অ্যান্টিকুইটি অফ ম্যান* [মানব জাতির প্রাচীনতা] গ্রন্থে লিয়েল পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ পেশ করলেন, যাতে দেখা গেল মানব জাতি পৃথিবীতে বাস করছে এত সুদীর্ঘকাল ধরে যে, ধর্মশাস্ত্রের বর্ণনার সাথে তার সমন্বয়সাধন কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। শুধু পৃথিবী নয়, গাছপালা ও তির্যক প্রাণী সম্পর্কেও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল ঐ বর্ণনার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যেতে পারে, যদি ইহুদি সৃষ্টিকাহিনীতে ব্যবহৃত 'দিন' শব্দটিকে দীর্ঘতর কোনো সময়ের দ্যোতক হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু মানব সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ কৌশল প্রয়োগ অসম্ভব ছিল, কারণ পবিত্র গ্রন্থে বর্ণিত কালক্রম যথার্থ স্পষ্ট সীমাযুক্ত। সতেরো শতকের জনৈক ইংরেজ ধর্মশাস্ত্রবিদ নিপুণভাবে হিসেবে করেছিলেন যে, ৪০০৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ২৩শে অক্টোবর সকাল ৯ টার সময় পরমেশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন এবং বাইবেলোক্ত বিভিন্ন তারিখের কোনো ধরনের হিসাবই ঐ ঘটনাকে বেশি পেছনে নিতে পারবে না। অন্যান্য প্রমাণ ভূ–বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তকে আরো শক্ত করলো, তবে সৃষ্টিতত্ত্বের ঐ ইহুদি কল্পকথার ঐতিহাসিক সত্যকে সংশোধনাতীতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে ভূ–বিজ্ঞান একাই যথেষ্ট ছিল। গল্পটিকে উদ্ধার করার একমাত্র উপায় ছিল ধরে নেওয়া যে, ঈশ্বর মানুষকে প্রতারণা করার স্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে বিভ্রান্তিকর প্রমাণ সৃষ্টি করে রেখেছিলেন।

ভূ–বিজ্ঞান বাইবেলের অভ্রান্ততাকে নড়বড়ে করে দিলো বটে, কিন্তু কোনো প্রাগৈতিহাসিক আদম ও হাওয়ার সৃষ্টি এখনো একটা গ্রহণযোগ্য উপকল্প হিসেবে রয়ে গেল। তবে এখানে প্রাণীবিজ্ঞান এগিয়ে এলো এবং মানুষের উদ্ভব সম্পর্কে বক্তব্য ঘোষণা করলো। বহু পুরোনো একটা আন্দাজ এই ছিল যে, মানুষসহ উচ্চতর প্রাণী এসেছে নিম্নতর প্রাণী থেকে ; তাছাড়া প্রাগ্রসর চিন্তাবিদেরা এরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছিলেন যে, আমাদের পরিচিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা নিরন্তর প্রক্রিয়ার ফল, যে প্রক্রিয়া কখনো অতিপ্রাকৃত হস্তক্ষেপে ছিন্ন হয়নি এবং অবিচল প্রাকৃতিক নিয়মাবলী দিয়েই ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাখ্যা করা যায়। যদিও অজৈব পদার্থের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে [প্রাকৃতিক] নিয়মের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হলো, কিন্তু জীবনের জগৎটা এমন একটি ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হওয়া অসম্ভব ছিল না যেখানে ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ, যতক্ষণ পর্যন্ত বিজ্ঞান বিভিন্ন প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদের উদ্ভবের সন্তোষজনক কারণসমূহ নির্ণয় করতে সক্ষম না হয়। এজন্য ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত চার্ল্‌স ডারউইন [১৮০৯–১৮৮২]–এর *অরিজিন অফ স্পিশীজ* [জীব

প্রজাতিসমূহের উদ্ভব] শুধু বিজ্ঞানেই নয়, বিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যে লড়াই–এর ইতিহাসেও এক বিশিষ্ট ঘটনা। যখন এ বই বের হলো তখনই অক্সফোর্ডের বিশপ স্যামুয়েল উইলবারফোর্স [১৮০৫–১৮৭৩] ঠিকই বলেছিলেন যে, "প্রাকৃতিক নির্বাচনের সূত্র ঈশ্বরের বাক্যের সাথে খাপ খাওয়ানোর যোগ্য নয়।" আর জার্মানিতে ও ফ্রান্সে, এবং ইংল্যান্ডেও ধর্মতত্ত্ববিদেরা ঈশ্বরের সিংহাসনচ্যুতির আশংকার বিরুদ্ধে উচ্চস্বরে চীৎকার করতে লাগলেন। ডাইউইনের পরবর্তী প্রকাশনা *ডিসেন্ট অফ ম্যান* [মানুষের বংশপরিচয়] (১৮৭১) গ্রন্থে তির্যক প্রাণী থেকে মানব জাতির উদ্ভবের পক্ষে প্রমাণাদি সুদক্ষ শক্তিমত্তার সাথে সাজিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং বইটির প্রকাশ ঐ কোলাহলকে নতুন করে জাগিয়ে তুললো। বাইবেলে বলা হয়েছে, ঈশ্বর মানুষকে তাঁর নিজের প্রতিমূর্তি হিসেবে সৃষ্টি করেছিলেন, ডারউইন বললেন মানুষ একটা বানর জাতীয় প্রাণীর বংশধর। নিষ্ঠাবান ধার্মিকদের অনুভূতি মি. গ্ল্যাডস্টোন [১৮০৯–১৮৯৮]–এর কথা দিয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে : "বিবর্তন বলে কথিত ব্যাপারটির ভিত্তিতে ঈশ্বরকে সৃষ্টি করার কষ্ট থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে, এবং অপরিবর্তনীয় নিয়মের নামে তাঁকে জগৎ পরিচালনার দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।" হারবার্ট স্পেন্সার [১৮২০–১৯০৩]–এর পর্যবেক্ষণ অনুসারে এই অব্যাহতিদান শুরু হয়েছিল আইজ্যাক নিউটন [১৬৪২–১৭২৭]–এর অভিকর্ষ আবিষ্কারের সাথে সাথে। এখন একথা স্বীকৃত যে, ডারউইন জীবপ্রজাতিসমূহের উদ্ভবের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা সরবরাহ করেননি। কিন্তু তাঁর গবেষণা অতিপ্রাকৃত সৃষ্টিতত্ত্বকে গুঁড়িয়ে দিয়ে এই মত দৃঢ়ভাবে অনুমোদন করেছিল যে, জীবজগৎ ও অজৈব জগৎ উভয় ক্ষেত্রেই অবিরাম উন্নয়ন চলছে—যে ধারণার প্রতি অনেক সমর্থ চিন্তাবিদ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এইভাবে [ঈশ্বর কর্তৃক] সৃষ্টি ও 'আদমের পতন'–এর বিশ্বাসের শবাধারে আর একটা পেরেক ঠোকা হলো এবং ত্রাণতত্ত্বকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় রইলো এই যে, যে ইহুদি কল্পকথার উপর তত্ত্বটি দাঁড়িয়েছিল, সেটা থেকে তাকে মুক্ত করা।

ডারউইনবাদ বলে পরিচিত এই মতবাদের বৃহত্তর ফল হলো এই যে, অপরিমেয় ক্ষমতার অধিকারী এক বহিঃস্থ বুদ্ধিমান সত্তা কর্তৃক লক্ষ্যের সাথে পন্থাকে মানিয়ে নেয়ার তত্ত্বটির মর্যাদাহানি ঘটলো। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে 'পরিকল্পনার যুক্তি' যে যথেষ্ট নয়, তা আগেই প্রদর্শিত হয়েছিল হিউম [১৭১১–১৭৬৬] ও কান্টের [১৭২৪–১৮০৪] লজিকে। কিন্তু প্রকৃতিতে জীব–প্রক্রিয়ার পর্যবেক্ষণ দেখিয়ে দেয় যে, প্রকৃতি ও কলার মধ্যে সাদৃশ্যের উপমা আদৌ টেকসই নয়—যে উপমার উপর উক্ত 'পরিকল্পনার যুক্তি' নির্ভরশীল' উপমাটি যে যথার্থ নয় তা বেশ জোরালো ভঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়েছেন জনৈক জার্মান লেখক (ফ্রিড্রিখ লাঙ্গে [Lange ১৮২৮–১৮৭৫])। যদি কোনো লোক কোনো মাঠে অবস্থানরত একটা খরগোশকে গুলি করতে চায়, তাহলে সে হাজার হাজার বন্দুক এনে মাঠটিকে ঘেরাও করে সকল বন্দুক দিয়ে গুলি ছোঁড়ার ব্যবস্থা করে না। অথবা যদি সে বসবাসের জন্য একটি বাড়ি চায় তাহলে একটা গোটা শহর নির্মাণ করে একটি ছাড়া বাকি বাড়িগুলোকে নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য রোদ–বৃষ্টি–ঝড়ের মুখে ছেড়ে আসে না। যদি এই কাজ দুটোর কোনোটাও সে করতো, আমরা তাকে উন্মাদ কিংবা বিস্ময়কর রকমের নির্বোধ বলতাম। তার কাজকর্ম লক্ষ্যের সাথে পন্থার খাপ খাইয়ে নেওয়ায় দক্ষ এক শক্তিশালী মনের পরিচয় বহন করে এমন ধারণা নিশ্চয়ই করা হবে না। কিন্তু এমন ধরনের কাজকর্মই প্রকৃতি করে থাকে। জীবকুলের

বিস্তারসাধনের কাজে প্রকৃতির অপচয়শীলতা বেপরোয়া। একটিমাত্র জীবন উৎপন্ন করতে সে অসংখ্য জীবাণু নষ্ট করে। হাজারের মধ্যে মাত্র একটি ক্ষেত্রে 'লক্ষ্য' সাধিত হয়। যেটা নিয়মিত, তা হচ্ছে ধ্বংস ও ব্যর্থতা। এই চরম বিশৃংখল প্রক্রিয়ার সাথে যদি কোনো বুদ্ধিমত্তার সম্পর্ক থেকে থাকে, তাহলে সেই বুদ্ধিমত্তা অপরিমেয়রূপে নিম্নস্তরের। আর সম্পূর্ণ উৎপাদিত বস্তুটিকে পরিকল্পনাজাত কাজ বলে ধরা হয়, তবে তা ঐ পরিকল্পনাকারীর অযোগ্যতাই নির্দেশ করে। মানুষের চোখের কথাই ধরুন। একজন অতি বিশিষ্ট বিজ্ঞানসেবী (হারম্যান হেল্‌ম্‌হোল্ট্‌স [১৮২১–১৮৯৪]) বলেছিলেন, "যদি কোনো চশমানির্মাতা যন্ত্র হিসেবে এটি [অর্থাৎ একটি মনুষ্যচক্ষু] আমার কাছে পাঠাতেন, তাহলে কাজে গাফিলতির জন্য তাকে ভর্ৎসনা করে জিনিসটি ফেরত পাঠিয়ে দিতাম, এবং আমার টাকা ফেরত চাইতাম।" ডারউইন দেখালেন, কিভাবে প্রপঞ্চকে [দৃশ্যমান প্রাকৃতিক ব্যাপার] ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটানো ব্যাপার হিসেবে নয়, বরং পরিপ্রেক্ষিতসমূহের ব্যতিক্রমী সমসংঘটনের ফলে উদ্ভূত ঘটনাবলী হিসেবে।

প্রকৃতির দৃশ্যমান ব্যাপারসমূহ বিভিন্ন বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত এমন একটি তন্ত্র যেখানে ঐ বস্তুগুলি অপরিবর্তনীয় নিয়মাবলী মেনে সহাবস্থান করে এবং একে অপরকে অনুসরণ করে। এই সাংঘাতিক প্রস্তাবটিকে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বিজ্ঞানের একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসাবে জাহির করা হয়েছিল। এটিকে সূত্রায়িত করেছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিল [১৮০৬–১৮৭৩] (তাঁর *সিস্টেম অফ লজিক* [যুক্তিবিদ্যার নিয়মনীতি], ১৮৪৩, গ্রন্থে) সেই ভিত্তি হিসেবে যার উপর দাঁড়িয়ে আছে বৈজ্ঞানিক আরোহ। এর অর্থ—যেকোনো মুহূর্তে সমগ্র মহাবিশ্বের অবস্থা তার পূর্ব মুহূর্তের অবস্থার ফল মাত্র ; পরপর ঘটে যাওয়া দুটি অবস্থার মধ্যে বিদ্যমান কারণগত পরম্পরা ছিন্ন হয় না এমন কোনো স্বেচ্ছাচারী হস্তক্ষেপ দ্বারা, যার কাজই হচ্ছে কারণ ও তার ফলের মধ্যেকার সম্পর্ককে চেপে দেওয়া বা বদলে ফেলা। কোনো কোনো প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এই নিয়মে বিশ্বাসী ছিলেন ; আধুনিক বিজ্ঞান প্রতিটি ক্ষেত্রে যে কাজ করেছে তা ঐ নিয়মের সত্যতা যাচাইকরণ বলেই মনে হয়। কিন্তু এটিকে এমন চরম রূপ দিয়ে বিবৃত করার দরকার নেই। সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞানমনস্ক লোকেরা উক্ত নিয়মটিকে অধিকতর সংযমের সাথে এবং অনেক কম অযৌক্তিকতার সাথে প্রকাশ করতে আগ্রহী। তাঁরা কবুল করতে প্রস্তুত যে, এটি একটি স্বীকার্য (postulate) মাত্র যা ছাড়া মহাবিশ্বের বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি অসম্ভব ; এবং তাঁরা এটিকে কার্যকারণের নিয়ম বলে বর্ণনা করতে অনিচ্ছুক, কেননা কার্যকারণের ধারণা অধিবিদ্যায় নিয়ে যায়। বরং এটিকে অভিজ্ঞতার একরূপত্ব (uniformity) বলতে তাঁরা আগ্রহী। কিন্তু তাঁদের পূর্বগামীরা কার্যকারণ নীতির ব্যতিক্রমগুলোকে স্বীকার করে নিতে যেমন প্রস্তুত ছিলেন না, তেমনি তাঁরাও প্রস্তুত নন এই একরূপত্বের ব্যতিক্রমগুলো মেনে নিতে।

ক্রমোন্নতির ধারণা শুধু প্রকৃতির উপরেই নয়, মানুষের মনের উপরে এবং চিন্তাধারা ও ধর্মসহ সভ্যতার ইতিহাসের উপরেও প্রয়োগ করা হয়েছে। যিনি প্রথম এই ধারণাকে সমগ্র মহাবিশ্বের উপর সুশৃঙ্খলভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন, সেই ফ্রিড্‌রিখ হেগেল [১৭৭০–১৮৩১] প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন না, ছিলেন অধিবিদ্যাবিদ্ [দার্শনিক]। তাঁর অত্যন্ত কঠিন দর্শন [ইউরোপীয়] চিন্তাধারার উপর এত ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল যে ঐ দর্শনের প্রবণতা সম্পর্কে কয়েকটি কথা না বললেই নয়। তিনি সমগ্র অস্তিত্বকে বুঝেছিলেন

'অ্যাব্‌সলিউট আইডিয়া' (Adsplute Idea) বা 'পরম ভাব' রূপে। এ ভাব স্থানে বা কালে বিধৃত নয়, কিন্তু এর অস্তিত্বের নিয়মেই বাধ্য নিজেকে বিশ্বপ্রক্রিয়ায় প্রকাশ করতে—প্রথমত, প্রকৃতিতে নিজেকে বহিরঙ্গে স্থাপন করে এবং তারপর ব্যক্তি মনের অভ্যন্তরে চেতনারূপে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সজাগ হয়ে। এ জন্যই তাঁর মতবাদকে 'অ্যাব্‌সলিউট আইডিআলিজ্‌ম' বা 'পরম ভাববাদ' বলা হয়। এই দর্শনের প্রতি যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল তা অনেকাংশে সম্ভবত এই বাস্তব কারণে যে এটি উনিশ শতকীয় চিন্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল ; যেহেতু প্রকৃতি ও ভাব দুই দিক থেকেই এই দর্শন বিশ্ব প্রক্রিয়াকে নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে উত্তরণ হিসেবে ধারণা করেছে। এ বিষয়ে অবশ্য হেগেলের দৃষ্টি ছিল সীমিত। তিনি প্রক্রিয়াটিকে এমনভাবে নিয়েছেন যেন সেটি বাস্তবে সম্পূর্ণতা লাভ করে গেছে ; ভবিষ্যতে আরো উন্নতির সম্ভাবনার বিষয়টি তিনি বিবেচনায় আনেননি ; অথচ তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য চিন্তাবিদেরা ঐ সম্ভাবনার দিকেই তাদের মনোযোগ ঘোরাচ্ছিলেন। কিন্তু এখানে যে বিষয়টি আমাদের বিবেচ্য, তা হচ্ছে এই যে, যদিও হেগেল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাখ্যা বস্তুতে নয়, মননে খুঁজে পেয়েছেন বলে তাঁর দর্শনতন্ত্র 'ভাববাদী', কিন্তু এটি যে-কোনো বস্তুবাদী দর্শনের মতোই শক্তিমত্তার সাথে গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসের ধ্বংসসাধনে সহায়ক ছিল। এ কথা সত্য যে, কেউ কেউ একে খ্রিস্টধর্মের সমর্থক বলে দাবি করেছেন। সর্বোচ্চ ধর্ম হিসেবে খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাসে এমন কিছু মতামত আছে যা অসম্পূর্ণভাবে উচ্চতম দর্শনের—যেটি তাঁর নিজেরই—কিছু কিছু ধারণা ব্যক্ত করে—হেগেলের এই মত উক্ত দাবিকে কিছুটা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে ; সাথে আছে এই ব্যাপারটিও যে, হেগেল মাঝে মাঝে 'পরম ভাব' (Absolute Idea) সম্পর্কে এমন করে কথা বলেছেন যেন সেটি একজন ব্যক্তি, যদিও ব্যক্তিত্ব এমন একটি সীমাবদ্ধতা যা তাঁর 'পরম ভাব'-এর ধারণার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, খ্রিস্টধর্মকে তিনি যতটুকু মূল্যই দিয়ে থাকুন না কেন, সেটিকে বিবেচনা করেছেন বিশুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শনের উচ্চতর অবস্থান থেকে, সত্যের কোনো বিশেষ প্রত্যাদেশ হিসেবে নয়, বরং সত্যের নিকটবর্তী কোনো একটি অবস্থান হিসেবে—যে সত্যের নাগাল একমাত্র দর্শনই পেতে পারে। আর মোটামুটি আস্থার সাথে এও বলা যেতে পারে যে, যে-কেউ হেগেলের দর্শনের প্রভাবে এলে সে অনুভব করে যে তার হাতে বিশ্বব্যবস্থার এমন একটি তত্ত্ব রয়েছে যা তাকে প্রত্যাদিষ্ট ধর্মের প্রয়োজন বা বাসনা থেকে মুক্তি দিয়েছে। জার্মানি, রাশিয়া এবং অন্যত্র হেগেলের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে খুলে দিয়েছিল অত্যন্ত ধর্মবহির্ভূত চিন্তার পথ।

হেগেল আক্রমণাত্মক ছিলেন না, তিনি ছিলেন [অন্যদের চেয়ে] শ্রেষ্ঠ। তাঁর সমকালীন ফরাসি দার্শনিক ওগুস্ত কোঁত [১৭৯৮–১৮৫৭]ও একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শনতন্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন যাতে তিনি আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ও সুস্পষ্টভাবে ধর্মতত্ত্বকে বিশ্বব্যবস্থা ব্যাখ্যার অচল পদ্ধতি হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেন। একইভাবে তিনি অধিবিদ্যাকে (metaphysics) তথা হেগেল যা কিছুর পক্ষে কথা বলেছিলেন সে সব কিছুকেই সমান রকমে অব্যবহার্য বলে প্রত্যাখ্যান করলেন এই যুক্তিতে যে, অধিবিদ্যাবিদ্‌রা কিছুই ব্যাখ্যা করতে পারেন না, শুধু প্রপঞ্চকে বিমূর্ত ভাষায় বর্ণনা করেন এবং আরো এই যুক্তিতেও যে জগতের উৎস সম্পর্কিত এবং কেনই বা জগৎ বিদ্যমান আছে সে সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী যুক্তির নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে। ধর্মতত্ত্ব ও অধিবিদ্যা উভয়েরই স্থান দখল করলো বিজ্ঞান—অর্থাৎ কারণ ও কার্য এবং সহবিদ্যমানতা নিয়ে অনুসন্ধান। সমাজের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি নির্দেশিত হবে জগৎ সম্পর্কে

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা, যে দৃষ্টিভঙ্গি অভিজ্ঞতার ইতিবাচক উপাত্তের মধ্যেই নিজেকে সীমিত রাখে। কোঁত নিশ্চিত ছিলেন যে, ধর্ম একটি সামাজিক প্রয়োজন। ঈশ্বরতাত্ত্বিক ধর্মগুলোর দিন শেষ হয়েছে ঘোষণা করে তাদের শূন্য স্থান পূরণের জন্য তিনি এক নতুন ধর্ম উদ্ভাবন করলেন—'মানব ধর্ম।' (Religion of Humanity)। পৃথিবীতে প্রচলিত বড় বড় ধর্মের সাথে কোঁতের ধর্মের পার্থক্য এই যে তাঁর ধর্মে কোনো অতিপ্রাকৃত বা অযুক্তিসিদ্ধ বিশ্বাসবিধি ছিল না, আর সে জন্যই কোঁত বিশেষ কোনো অনুসারী পাননি। কিন্তু কোঁতের 'দৃষ্টবাদী দর্শন' (positive philosophy) প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইংল্যান্ডেও এর প্রভাব কম ছিল না। সেখানে এর বক্তব্যসমূহ প্রচার করেন মি. ফ্রেডরিক হ্যারিসন [১৮৩১–১৯২৩] যিনি উনিশ শতকের শেষার্ধে কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যুক্তির সংগ্রামে একজন অক্লান্ততম কর্মী ছিলেন।

আরো একটি ব্যাপক বিশ্বদর্শনতন্ত্র কঠোর পরিশ্রমে গড়ে তুলেছিলেন একজন ইংরেজ, যাঁর নাম হারবার্ট স্পেনসার। কোঁতের দর্শনের মতো এটিও বিজ্ঞানভিত্তিক ছিল এবং এতে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে কিভাবে এক নীহারিকাবৎ বিশ্ব থেকে সমগ্র জ্ঞেয় জগৎ—মানসিক, সামাজিক তথা ভৌত—অবরোহক্রমে সিদ্ধ হতে পারে। তাঁর *সিনথেটিক ফিলসফি* [সমন্বয়ী দর্শন (বহু খণ্ড ১৮৫৫–৯৬)] ইংল্যান্ডে বিবর্তনের ধারণাকে সুপরিচিত করতে সম্ভবত অন্য সব কিছুর চেয়ে বেশি কাজ করেছিল।

আরো একটি আধুনিক বিশ্বব্যাখ্যার উল্লেখ আমাকে করতেই হবে, যেটি জার্মানির জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রাণী বিজ্ঞানী আর্নেস্ট হাএকেল (Haeckel) [১৮৩৪–১৯১৯]–এর, যাঁকে বলা যেতে পারে বিবর্তনের পয়গম্বর। তাঁর *ক্রিয়েশন অফ ম্যান* [মানব সৃষ্টি] (১৮৬৮) ডারউইনের *ডিসেন্ট* [বংশপরিচয়] [১৮৭১] যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিল সেই একই এলাকাকে আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছিল। বইটির বিপুল কাটতি ছিল এবং এটির অনুবাদ হয়েছিল, আমার বিশ্বাস, চৌদ্দটি ভাষায়। তাঁর *ওয়ার্লড–রিড্‌ল্‌স* [বিশ্বরহস্য] (১৮৯৯) একই রকম জনপ্রিয় বই। স্পেন্সারের মতো তিনিও আমাদের শিখিয়েছেন যে, বিবর্তন শুধু প্রকৃতির ইতিহাসেই প্রযোজ্য নয়, মানব সভ্যতা ও মানবীয় চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। স্পেন্সার ও কোঁত থেকে তার পার্থক্য এই যে, তিনি [দৃশ্যমান] প্রাকৃতিক প্রপঞ্চের পেছনে কোনো অজ্ঞেয় সত্যের অস্তিত্ব ধরে নেননি। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁর তত্ত্বটিকে সাধারণভাবে জড়বাদ বলে নিন্দা করেন, কিন্তু কথাটি ভ্রান্ত। স্পিনোজার মতো তিনি বস্তু ও চেতনা, দেহ ও চিন্তাশক্তি, এই দুই সত্তাকে পরম সত্যের দুটি অবিচ্ছেদ্য দিক বলে স্বীকার করেছেন এবং ঐ পরম সত্যকেই তিনি বলেন ঈশ্বর। আসলে তিনি তাঁর দর্শনকে স্পিনোজার দর্শনের সাথে অভিন্ন বলে সনাক্ত করেছেন। এবং যৌক্তিকভাবে অগ্রসর হয়ে তিনি ধারণা করেছেন যে জড় পদার্থের অনুগুলি চিৎশক্তিসম্পন্ন। বস্তুজগৎ সম্পর্কে তাঁর ধারণা প্রতিষ্ঠিত ছিল জড় পদার্থের পুরোনো সেই যান্ত্রিক ধারণার উপর, যা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে [বিশ শতকের গোড়ায়] মর্যাদা হারিয়েছে। হাএকেল তাঁর দর্শনকে *মনিজ্‌ম*[১] বা অদ্বৈতবাদ বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তাঁর এই অদ্বৈতবাদ পরে নতুন আকার পেয়েছে এবং নবরূপে এই দর্শন জার্মানিতে চিন্তাশীল লোকদের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলবে বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে। পরে আমি এই অদ্বৈতবাদী আন্দোলনের প্রসঙ্গে ফিরে আসবো।

কোঁতের একটি মৌলিক ধারণা ছিল এই যে, প্রকৃতির মতো মানবীয় কাজকর্ম ও মানুষের ইতিহাসও কার্য–কারণ বিধি দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। ১৮৫৫ সালে ইংল্যান্ডে

মনোবিজ্ঞানের দু'খানি বই প্রকাশিত হয়েছিল আলেকজাণ্ডার বেইন [১৮১৮–১৯০৩]–এর '*সেন্সেস অ্যান্ড ইন্টেলেক্ট* [ইন্দ্রিয়বর্গ ও বুদ্ধিবৃত্তি] এবং *স্পেন্সারের প্রিন্সিপ্‌ল্‌স অফ সাইকলজি* [মনোবিজ্ঞানের সূত্রসমূহ]), যা মানুষকে শিখালো যে আমাদের ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত এবং এ ব্যাপারটি হচ্ছে কারণ ও ফলের প্রবাহ থেকে উদ্ভূত অনিবার্য পরিণাম। তবে অনেক গভীরতর ছাপ ফেলেছিল দুবছর পরে প্রকাশিত হেনরি টমাস বাক্‌ল (Buckle) [১৮২১–৬২]–এর *হিস্ট্রি অফ সিভ্‌লিজেশন ইন ইংল্যান্ড* [ইংল্যান্ডে সভ্যতার ইতিহাস] (ঢের কম স্থায়ী মূল্যের একখানি বই)–এর প্রথম খণ্ড, যেখানে ইতিহাসে এই কার্যকারণ সূত্র প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। মানুষ কাজ করে প্রেরণার পরিণতিতে ; তাদের প্রেরণাসমূহ হচ্ছে পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর ফলশ্রুতি। সুতরাং "আমরা যদি আগের সকল ঘটনা সম্পর্কে এবং তাদের গতিক্রমের সমগ্র নিয়মাবলী সম্পর্কে অবহিত থাকতাম, তাহলে নির্ভুল নিশ্চয়তার সাথে আমরা তাদের অব্যবহিত ফলাফল আগেই বলে দিতে পারতাম।" এভাবে, ইতিহাস হচ্ছে কারণ ও ফলাফলের একটি অভগ্ন প্রবাহ। আপতন (Chauce) বাদ দেওয়া হয়েছে ; সেটি আমাদের জ্ঞানের ত্রুটির একটি নাম মাত্র। রহস্যময় ও ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপও বাদ পড়েছে। বাক্‌ল ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন, কিন্তু তাঁকে ইতিহাস থেকে বাদ দিয়েছেন ; এবং মানবীয় কাজকর্ম বিশ্বজনীন কার্যকারণ বিধির অধীন নয়—এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে তাঁর বইটি দুর্দান্ত এক আঘাত হেনেছিল।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নৃবিজ্ঞান ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। আদিম মানুষের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানে (ডারউইনবাদ থেকে স্বতন্ত্রভাবে) দেখা গেছে যে মানুষ উচ্চতর অবস্থা থেকে নিম্নতর অবস্থায় পতিত হয়েছিল এই মতের পক্ষে বলার কিছু নেই ; প্রমাণাদি নির্দেশ করে যে, নেহাত জান্তব অবস্থা থেকে তার ধীর উত্তরণ ঘটেছে। ধর্মীয় বিশ্বাসের উৎসসমূহ খুঁজে দেখা হয়েছে ; ফল যা পাওয়া গেছে তা ধর্মনিষ্ঠদের জন্য উদ্বেগজনক। এডওয়ার্ড টাইলর [১৮৩২–১৯১৭], ফ্রেডরিক উইলিয়ামরবার্টসন [১৮১৬–১৮৫৩], জর্জ স্মিথ [১৮৫৬–১৯৪২], এবং টমাস ফ্রেজার [১৮৫৪–১৯৪১] প্রমুখ নৃবিজ্ঞান ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ছাত্রদের গবেষণা দেখিয়ে দিয়েছে, যেসব রহস্যময় ধারণা, বদ্ধবিশ্বাস ও আচার–অনুষ্ঠান খ্রিস্টীয় প্রত্যাদেশের নিজস্ব বলে মনে করা হতো, সেগুলি সবই এসেছে বিভিন্ন আদিম ধর্মের অমার্জিত ধ্যানধারণা থেকে। এক মৃত দেবতাকে খাওয়ার যে অনুষ্ঠান সাধারণভাবে বর্বরদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তা থেকেই খ্রিস্টানদের ইউক্যারিস্ট–এর রহস্য এসেছে ; একজন দেবতার মৃত্যু ও মানুষের মূর্তিতে তাঁর পুনরুত্থান, যা খ্রিস্টধর্মের কেন্দ্রীয় সত্য ; এবং একজন ত্রাণকর্তার অলৌকিক জন্ম—পৌত্তলিক ধর্মসমূহের সাথে খ্রিস্টধর্ম সাধারণভাবে এসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এরকম সব সিদ্ধান্ত খ্রিস্টধর্মের জন্য চরমভাবে ক্ষতিকর। এটা বলা যেতে পারে যে, ঐ সিদ্ধান্তগুলো বর্তমান খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের দাবিসমূহের জন্য এমনিতে মারাত্মক নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এটা মনে করা যেতে পারে যে, খ্রিস্টীয় প্রত্যাদেশের অংশ হিসেবে ঐ ধারণাগুলো একটা নতুন তাৎপর্য অর্জন করেছিল। আরো মনে করা যেতে পারে যে, ঈশ্বর বিজ্ঞজনের মতো মানুষের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। মিথ্যা ও নৃশংস আচরণের কারণ হওয়া সত্ত্বেও ঐসব বিশ্বাস ঈশ্বর নিজেই মানুষের মধ্যে সঞ্চার করেছিলেন। আর তাঁর ঐ সুযোগ গ্রহণ করার উদ্দেশ্য ছিল একটি প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা মানুষের সংস্কারের কাছে আবেদন রাখতে পারে। কারো কারো মন এ ধরনের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্টি খুঁজে পেতে পারে। কিন্তু অনুমান করা যায়, ধর্মবিশ্বাসের উৎস নিয়ে যেসব আধুনিক গবেষণা হয়েছে সেগুলো যে অল্প সংখ্যক লোক পড়েন তাঁদের অধিকাংশ উপলব্ধি

করবেন যে, যেসব বৈশিষ্ট্য খ্রিস্টধর্মকে অন্য সকল ধর্ম থেকে আলাদা করেছে বলে ধরা হতো, সে বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁদের চোখের সামনেই বিলীন হচ্ছে।

বিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাধারণ ফল এই হয়েছে যে, এতে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশ্বদৃষ্টির উদ্ভব হয়েছে, যাতে অবৈজ্ঞানিক যুগের ধ্যানধারণার উপর, তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মানুষের জন্যই তৈরি করা হয়েছিল এই দাম্ভিক অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত খ্রিস্টীয় পরিকল্পের (scheme) কোনো উপযুক্ত বা যুক্তিসঙ্গত স্থান নেই। পেইন যদি একথা একশো বছর আগে উপলব্ধি করে থাকেন, এখন এটা আরো অনেক বেশি স্পষ্ট প্রতীয়মান। সকলের মন অবশ্য এই অসামঞ্জস্যের দ্বারা সমানভাবে প্রভাবিত নয়। অনেকেই আছে যারা স্বীকার করবে যে, বিজ্ঞান প্রমাণ করে দিয়েছে মানুষের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে বাইবেলের বিবরণ মিথ্যা ; কিন্তু তারা আবার জগৎ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ও ধর্মশাস্ত্রীয় ধারণার মধ্যে বিদ্যমান অসামঞ্জস্যের দ্বারা মোটেই প্রভাবিত হয় না।

এ ধরনের মানসিকতার অধিকারীদের জন্য বিজ্ঞান বয়ে আনতে পেরেছে কতিপয় সুরক্ষা মাত্র, যেগুলো আবার বেশি ক্ষতি স্বীকার না করেই পরিত্যাগও করা যায়। বিজ্ঞান বাইবেলের অভ্রান্ততা সম্পর্কে নিষ্ঠাবানদের পুরোনো মতকে টিকিয়ে রাখার অযোগ্য করে দিয়েছে এবং সৃষ্টিতত্ত্ব ও প্রথম মানুষের স্বর্গ থেকে পতনের তত্ত্বকে লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছে। কিন্তু বাইবেলের কর্তৃত্বের তত্ত্বকে কিছুটা পরিবর্তিত করে এবং প্রায়শ্চিত্তের তত্ত্বকে সংশোধন করে খ্রিস্টধর্মের পক্ষে তখনো সম্ভব ছিল তার অতিপ্রাকৃত দাবি বজায় রাখা, যদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাক্ষ্যই একমাত্র সত্যসমষ্টি হতো যার সাথে খ্রিস্টধর্মের সংঘর্ষ ঘটেছিল। এই মর্মে তর্ক করা যেতে পারতো যে বিশ্বজনীন কার্য–কারণ বিধি এমন একটি উপকল্প (hypothesis) যা অভিজ্ঞতা থেকে অনুমিত ; কিন্তু সেই অভিজ্ঞতার মধ্যে আছে ইতিহাসের সাক্ষ্য এবং সুতরাং *নিউ টেস্টামেন্ট* প্রদত্ত অলৌকিক ঘটনাবলীর সুস্পষ্ট প্রমাণ অবশ্যই হিসাবে ধরতে হবে (যে প্রমাণ অকাট্য, এমনকি ঐ বইটি যদি ঈশ্বর–প্রত্যাদিষ্ট নাও হয়ে থাকে)। এভাবে ঐতিহাসিক সত্যের দৃঢ় ভূমির উপর দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানের সাধারণীকরণের বিরুদ্ধে একটা অবস্থান নেওয়া যেতে পারতো। সেই শক্ত ভূমি কিন্তু ধ্বসে পড়েছে ঐতিহাসিক সমালোচনার তোড়ে, যা ছিল আঠারো শতকের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান–প্রসূত সমালোচনার চেয়ে বেশি মারাত্মক।

বাইবেলে বিধৃত বিবরণগুলোর পদ্ধতিগত পরীক্ষা করা, সেগুলোকে এমনভাবে ব্যবহার করা যেন সেগুলো খাঁটি মানবীয় দলিল,—এটি উনিশ শতকের কাজ। কিছুটা তো অবশ্য আগেই করা হয়ে গিয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্পিনোজা [১৬৩২–১৬৭৭] (উপরে পৃ. ৬৭) ও রিচার্ড সিমঁ (Simon) [১৬৩৮–১৭১২] নামক জনৈক ফরাসি লেখক যাঁর বই পোড়ানো হয়েছিল, এঁরা দুজনে ছিলেন পথপ্রদর্শক। আর *ওল্ড টেস্টামেন্টের* আধুনিক সমালোচনা শুরু করেছিলেন আস্ত্রুক (প্যারিসে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অধ্যাপক), যিনি *বুক অফ জেনেসিস* [সৃষ্টি–পুস্তক]–এর সংকলক কর্তৃক ব্যবহৃত দলিলকে আলাদা করে চিহ্নিত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন (১৭৫৩)। তাঁর সমসাময়িক জার্মান লেখক যিনি *নিউ টেস্টামেন্টের* ছাত্র ছিলেন, সেই হারমান এস. রাইমারুস (Reimarus) [১৬৯৪–১৭৬৮] এই আধুনিক সিদ্ধান্তে আগেই উপনীত হয়েছিলেন যে একটা নতুন ধর্ম সংস্থাপনের কোনো ইচ্ছাই যিশুর ছিল না। তিনি আরো দেখেছিলেন যে, সন্ত জন–এর *গস্‌পেল* অন্য গস্‌পেল–প্রণেতা (Evangelist)–দের কথিত যিশু থেকে ভিন্ন এক ব্যক্তিত্বকে যিশু হিসেবে উপস্থাপন করেছে।

কিন্তু হোমার ও প্রাচীন রোমান ইতিহাসের দলিলপত্রের ক্ষেত্রে জার্মান পণ্ডিতেরা সমালোচনার যে পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন, উনিশ শতকে এসে তা বিস্তৃত করে বাইবেল গবেষণাতেও লাগানো হলো। এই কাজ প্রধানত জার্মানিতে করা হয়েছিল। *পেন্টাটিউক* [পঞ্চ পুস্তক] গ্রন্থগুলি মোজেসের লেখা—এই পুরোনো প্রথাগত বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে মর্যাদা হারিয়ে ফেললো। যাঁরা প্রকৃত ঘটনা নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁরা সকলেই এখন একমত যে, বিভিন্ন ধরনের ও ভিন্ন ভিন্ন যুগের অনেকগুলো দলিল থেকে উপাদান নিয়ে *পেন্টাটিউক* প্রণয়ন করা হয়েছিল। আর ঐসব দলিলের সবচেয়ে পুরাতনগুলি খ্রিস্টপূর্ব নবম শতক থেকে শুরু করে সবচেয়ে শেষেরটি খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক পর্যন্ত সময়ের রচনা ; তাছাড়া আরো পরের কিছু গৌণ সংযোজনও আছে। এই প্রকটনে একজন ইংরেজ, নাটালের বিশপ কোলেন্‌সো [১৮১৪–১৮৮৩], একটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অনিচ্ছাকৃত অবদান রেখেছিলেন। এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, সনাক্ত করা দলিলগুলোর মধ্যে যেটি সবচেয়ে প্রাচীন সেটি ছিল একটি আখ্যান যা শুরু হয়েছিল *জেনেসিস*-এর প্রথম অধ্যায়ে। কিন্তু সমস্যা ছিল এই যে, ঐ আখ্যানটি ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিল লেভিটিকাস প্রণীত আইনের সাথে, যে আইন খ্রি. পূ. পঞ্চম শতকের বলে প্রমাণ করা যেতে পারতো। ১৮৬২ সালে কোলেনসো তাঁর *পেন্টাটিউক অ্যান্ড দ্য বুক অফ জোশুআ ক্রিটিক্যালি এগ্‌জামিন্‌ড* [পঞ্চপুস্তক ও জোশুআর পুস্তক সমালোচনামূলকভাবে পরীক্ষিত] বই এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করলেন। *ওল্ড টেস্টামেন্টে* বর্ণিত ইতিহাসের সত্যতা সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ জাগিয়েছিল জনৈক নবদীক্ষিত জুলু, যে এই বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল যে, সে সত্যিই মহাপ্লাবনের গল্প বিশ্বাস করতে পারে কি না।

> যে, বিভিন্ন গরম ও ঠাণ্ডা দেশ থেকে সমস্ত বড় ও ছোট পশু, পাখি, ও মাটির উপর বুকে হেটে চলা প্রাণী এভাবে জোড়ায় জোড়ায় এসে নোআহ্‌র জাহাজে প্রবেশ করলো? এবং নোআহ্ কি তাদের সকলের জন্য, অর্থাৎ পশুদের জন্য ও শিকারি পাখিদের জন্য, তথা বাকি সব প্রাণীর জন্য খাদ্য সংগ্রহ করেছিলেন?

তখন বিশপ সাহেব প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত সাংখ্যিক বিবৃতিগুলি নিরীক্ষা করে ঐসব গ্রন্থের সত্যতা পরীক্ষা করতে উদ্যোগী হলেন। ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে ঐ গ্রন্থগুলির জন্য এই প্রচেষ্টার ফল হয়েছিল মারাত্মক। অলৌকিক ঘটনাবলীর (যেগুলোর সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি কোনো প্রশ্ন করেননি) বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা রেখেই, তিনি দেখালেন যে মিশরে ও জনমানবহীন ভূখণ্ডে ইস্রাইলীয়দের সাময়িক অবস্থানের পুরো গল্পটাই নানা আজগুবি ও অসম্ভব জিনিসে ভরা। কোলেনসোর বইখানি ইংল্যান্ডে ঘৃণা ও ক্রোধের ঝড় তুললো—তিনি পরিচিত হলেন 'দুর্বৃত্ত বিশপ' হিসেবে। কিন্তু মহাদেশীয় ইউরোপে বইটি একেবারে অন্য রকম অভ্যর্থনা পেলো। *পেন্টাটিউক* ও *জোশুআর* যেসব অংশকে তিনি অনৈতিকহাসিক প্রমাণ করেছিলেন সেগুলি ঠিক সেই কাহিনীরই অন্তর্ভুক্ত ছিল যেটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল। আর তার ফলাফল থেকে সমালোচকেরা সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, কাহিনীটি সম্পর্কিত ছিল যে লেভিটিকীয় আইনের সাথে, ঐ আইনের মতোই কাহিনীটিও [খ্রি. পূ.] পঞ্চম শতকে সৃষ্ট একটি অর্বাচীন বস্তু।

ওল্ড টেস্টামেন্ট নিয়ে গবেষণার আকর্ষণীয় ফলাফলের একটি ছিল এই যে, দেখা গেল ইহুদিরা নিজেরাই তাদের ঐতিহ্যগত কাহিনীগুলোকে স্বাধীনভাবে পরিচর্যা করেছে। পরপর প্রস্তুত যেসব দলিল পরবর্তীকালে একসাথে গ্রথিত হয়েছিল, তার প্রত্যেকটি লেখা হয়েছিল

এমন সব লোক দ্বারা যাঁরা পুরাগত কাহিনীগুলোর প্রতি সম্পূর্ণ মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন ; তাঁদের এমন সন্দেহ কদাচ হয়নি যে সেগুলো ঐশ্বরিক উৎস থেকে এসেছিল, এবং তাই তাঁরা ঐ সাহিত্যের কর্তৃত্বের সামনে মাথা নত করেননি। ইহুদিদের এইসব দলিল শুধু প্রবণতার দিক থেকেই নয় (কারণ তারা বিভিন্ন যুগের চেতনার প্রতিফলন ধারণ করেছিল), অনেক ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর দিক থেকেও পরস্পর অসম্বদ্ধ ছিল ; এগুলোর বাছবিচারহীন দঙ্গলের [lump] সবটাকেই অভ্রান্ত কর্তৃত্ব প্রদান করার কাজটি খ্রিস্টানদের জন্য রেখে দেয়া হয়েছিল। *ওল্ড টেস্টামেন্টের* অন্যান্য পুস্তকের অধিকাংশের পরীক্ষাও অনুরূপভাবে এমন সব সিদ্ধান্ত দিয়েছে, যা ঐসব পুস্তকের উৎস ও চরিত্র সম্পর্কে গোঁড়া ধার্মিকদের মতের বিরুদ্ধে গেছে। গত অর্ধ শতাব্দীকালে [অর্থাৎ আনুমানিক ১৮৬০–১৯১০ কাল পর্বে] পুনরুদ্ধারকৃত ব্যাবিলনীয় সাহিত্য থেকে অনেক বিষয়ে নতুন জ্ঞান আহরণ করা গেছে। একেবারে প্রথম দিকের (১৮৭২) ও সবচেয়ে রোমাঞ্চকর আবিষ্কারগুলোর একটি ছিল এই যে, ইহুদিরা তাদের মহাপ্লাবনের গল্পটি পেয়েছিল ব্যাবিলনীয় পুরাণ কথা থেকে।

নিউ টেস্টামেন্টের আধুনিক সমালোচনা শুরু হয়েছিল ব্রুনো ব্যর (Baur) [১৮০৯–১৮৮২] ও ডেভিড স্ট্রাউস [১৮০৮–১৮৭৪]–এর লেখা দিয়ে। তাঁদের *লাইফ অফ যীযস* [যিশু–জীবনী] (১৮৩৫)–এ অতিপ্রাকৃতকে সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়েছিল। বইখানি বিরাট সাফল্য পেয়েছিল এবং প্রচণ্ড বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। এই দুই যুক্তিবাদীই হেগেলের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। একই সময়ে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে পারদর্শী কার্ল লাখ্‌মান [১৭৯৩–১৮৫৭] গ্রীক ভাষায় লিখিত *নিউ টেস্টামেন্টের* প্রথম বিজ্ঞানসম্মত সংস্করণ বের করে [১৮৩১,১৮৪২–৫০] ঐ গ্রন্থের সমালোচনার ভিত্তি স্থাপন করলেন। তখন থেকে সত্তর বছরব্যাপী [মোটামুটি ১৮৪০–১৯১০] কাজ করে কিছু নিশ্চিত ফল মিলেছে যা এখন সাধারণভাবে গৃহীত।

প্রথমত, আধুনিক সমালোচনা পড়েছেন এমন কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি আজ আর সেই পুরোনো মত বিশ্বাস করেন না যে, যিশুর চারটি জীবনীর [অর্থাৎ গস্‌পেল চতুষ্টয়ের] প্রত্যেকটি একেকখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ এবং ভেতরে যেসব ঘটনার বর্ণনা আছে সেগুলোর পক্ষে একেকটি স্বতন্ত্র সাক্ষ্য। এটা স্বীকৃত যে, যেসব অংশ একের বেশি জীবনীতে রয়েছে এবং অভিন্ন ভাষায় লেখা, সেগুলোর উৎস এক এবং তারা একটিমাত্র সাক্ষ্যই ধারণ করে। দ্বিতীয়ত, এটা মেনে নেওয়া হয়েছে যে, প্রথম গস্‌পেলই প্রাচীনতম গস্‌পেল নয়, এবং খ্রিস্টশিষ্য ম্যাথিউ এটির প্রণেতা নন। তা ছাড়া এই মর্মে মোটামুটি একটা সাধারণ ঐকমত্য আছে যে মার্কের বইটিই সর্বপ্রাচীন। প্রথম গস্‌পেলের মতো চতুর্থ গস্‌পেলও একজন প্রত্যক্ষদর্শীর রচিত বলে মনে করা হতো ; এখন সেই চতুর্থ গস্‌পেলের রচয়িতা কে তা নিয়ে বিতর্ক চলছে ; কিন্তু যাঁরা পুরোনো মত আঁকড়ে আছেন তাঁরাও স্বীকার করেন যে এই পুস্তকে এমন এক যিশুতত্ত্ব হাজির করা হয়েছে যা অন্য তিনজন জীবনীকারের [গস্‌পেল প্রণেতার] অভিমত থেকে বহুলাংশে আলাদা।

ফলত, এখন আর মোটেই বলা চলে না যে, যিশুর জীবনবৃত্তান্তের জন্য প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য আছে। সবচেয়ে পুরোনো বিবরণটি (মার্ক) লেখা হয়েছিল কম পক্ষে যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার তিরিশ বছর পর। যদি এ ধরনের সাক্ষ্যকে ঐ দলিলে বর্ণিত অলৌকিক ঘটনার সত্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট যোগ্য বলে মনে করা হয়, তাহলে খুব কম অলৌকিক

ঘটনাবলীই আছে যেগুলি বিশ্বাস করার একই রকম অধিকার আমাদের নেই। প্রকৃত পক্ষে, তিরিশ বছর সময়ের ব্যবধান সামান্যই ভিন্নতা আনতে পারে, কারণ আমরা জানি লোক কাহিনী গড়ে উঠতে সময় লাগে না। প্রাচ্য জগতে আপনি এমন সব অলৌকিক ঘটনার কথা শুনতে পাবেন যেগুলো গত পরশুই মাত্র ঘটেছিল। ধর্মের জন্ম সব সময়ই কল্পকথায় আচ্ছন্ন থাকে এবং, এম. সালোমন রাইনাখের কথায়, খ্রিস্টধর্মের জন্মকাহিনী যদি খাঁটি ইতিহাস হতো তাহলে সেটাই হতো একটা অলৌকিক ব্যাপার।

প্রথম তিন গস্‌পেলের পক্ষপাতহীন বিচার–বিবেচনার আর একটি অস্বস্তিকর ফল এই যে, যদি লিখিত আকারে প্রাপ্ত যিশুর কথাগুলোকে খাঁটি উত্তরাধিকার বলে গ্রহণ করা হয়, তাহলে [স্বীকার করতে হয় যে] নতুন একটি ধর্ম স্থাপনের কোনো অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। এবং তাঁর সম্পূর্ণ প্রত্যয় জন্মেছিল যে পৃথিবীর ধ্বংস আসন্ন। বর্তমানে প্রাগ্রসর সমালোচনার মুখ্য সমস্যা মনে হয় এটাই যে, যিশুর সমগ্র উপদেশই এই ভ্রান্ত প্রত্যয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল কি না।

এ কথা বলা যেতে পারে যে, জ্ঞানের অগ্রগতি আত্মার অমরত্বের তত্ত্বটির উপর কোনো আলোই ফেলতে পারেনি,—যে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব আমাদেরকে গ্রহণ করতে বলা হয় ধর্মগ্রন্থের নির্দেশ মেনে। একটি স্নায়ুতন্ত্র ছাড়া কোনো চিন্তাশীল মনের অস্তিত্ব কল্পনা করার অসুবিধাগুলোর উপর শারীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান উভয়ই নিশ্চিতরূপে জোর দিয়েছে। কেউ কেউ যথেষ্ট আশাবাদী যে মানসিক ঘটনাবলীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা সম্ভবত একদা জানতে পারবো মৃত মানুষদের 'আত্মারা' [সত্যিই] আছে কি না। যদি এ রকম একটা আত্মার জগতের অস্তিত্ব কখনো প্রমাণ করা যেতো, তাহলে সেটাই হতো এযাবৎ খ্রিস্টধর্ম যতো আঘাত সহ্য করেছে তার মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে বড় আঘাত। কারণ, এই ধর্মের তথা আরো কতিপয় ধর্মের বড় আবেদনটি রয়েছে একটি ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিশ্রুতির মধ্যে, যে জীবন সম্পর্কে অন্যভাবে আমাদের কোনো জ্ঞানই থাকতে পারে না। যদি মরণোত্তর অস্তিত্ব প্রমাণিত হতো এবং তা অভিকর্ষের নিয়মের মতো একটি বৈজ্ঞানিক সত্যে পরিণত হতো, তাহলে প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম তার ক্ষমতা হারাতো। কারণ, প্রত্যাদিষ্ট ধর্মের সমগ্র ব্যাপারটিই হলো এই যে, এই ধর্ম বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আমি যতদূর জানি, যাঁরা আধ্যাত্মিক পরীক্ষা দ্বারা এই মর্মে নিশ্চিত হয়েছেন যে, মৃত মানুষের আত্মাদের সাথে তাঁদের সত্যিই আলাপ হয়েছে, এবং সাক্ষ্য যতোই বিভ্রান্তিকর হোক, যাঁদের কাছে এই আলাপ অভিজ্ঞতা দ্বারা বাস্তব বলে প্রমাণিত, তাঁরা আর ধর্মে আগ্রহ অনুভব করেন না। তাঁরা জ্ঞানের অধিকারী, তাই বিশ্বাসকে বিদায় দিতে পারেন।

বিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক সমালোচনা গত একশো বছরে ধর্মনিষ্ঠদের বিশ্বাসের ভুবনে যে ধ্বংসকাণ্ড ঘটিয়েছে, তার কাছে শান্তভাবে আত্মসমর্পণ করেনি নৈষ্ঠিক পক্ষ, এবং বিতর্কই তাদের একমাত্র অস্ত্র ছিল না। জার্মানির ট্যুবিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ট্রাউসের অধ্যাপক পদ কেড়ে নেওয়া হয় এবং তাঁর কর্মজীবন ধ্বংস হয়ে যায়। যাঁর লেখা উত্তেজক বই *লাইফ অফ যীজস* [যিশু–জীবনী]–এও অতিপ্রাকৃতকে বাতিল করা হয়েছিল, সেই আর্নেস্ট রেনঁ (Renan) [১৮২৩–৯২] 'কোল্যাজ দ্য ফ্রঁস' [ফ্রান্সের মহাবিদ্যালয়]–এ তাঁর অধ্যাপকের পদ হারিয়েছিলেন। *ফোর্স অ্যান্ড ম্যাটার* [শক্তি ও পদার্থ] নিয়ে লেখা লুড্‌ভিগ ব্যুখ্‌নার (Biichner) [১৮২৪–৯৯]–এর বই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যাসমূহের অসারত্ব প্রদর্শন

করে সাধারণ জনগণের অন্তরে সাড়া জাগিয়েছিল ; আর এজন্য তাঁকে ট্যুবিংগেন থেকে বিতাড়িত করা হয় (১৮৫৫)। হাএকেলকে জেনা থেকে তাড়ানোর একটা চেষ্টা হয়েছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একজন ফরাসি ক্যাথলিক, আবে আলফ্রেড লোআসি Loisy [১৮৫৭–১৯৪০], *নিউ টেস্টামেন্ট* গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন ; এবং তাঁর পুরস্কার হয় বড় রকমের বহিষ্কার (১৯০৭) [অর্থাৎ ধর্মমণ্ডলী থেকে বের করে দেওয়া বা একঘরে করা]।

ক্যাথলিক গির্জার ভেতরে *মডার্নিজ্‌ম* [আধুনিকতাবাদ] বলে পরিচিত একটি ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের বিশিষ্টতম ব্যক্তি হচ্ছেন লোআসি। কেউ কেউ মনে করেন তেরো শতক থেকে বর্তমান পর্যন্ত খ্রিস্টীয় গির্জার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সংকট হলো এই আন্দোলন। মডার্নিস্ট [আধুনিকতাবাদী]–রা কোনো সংগঠিত দল হিসেবে গড়ে ওঠেননি ; তাঁদের কোনো কর্মসূচি নেই। তাঁরা গির্জা, গির্জার ঐতিহ্য, ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ; কিন্তু তাঁরা খ্রিস্টধর্মকে এমন একটি ধর্ম হিসেবে দেখেন যা ক্রমোন্নতি লাভ করেছে এবং যার সজীবতা নির্ভর করছে তার অব্যাহতভাবে উন্নতি করতে পারার উপর। আধুনিক বিজ্ঞান ও সমালোচনার আলোকে খ্রিস্টধর্মের ডগ্‌ম্যা বা বদ্ধবিশ্বাসগুলোকে পুনর্ব্যাখ্যা করতে তাঁরা দৃঢ়সংকল্প। ক্রমোন্নতির ধারণাটি ইতোমধ্যেই কার্ডিন্যাল জন হেনরি নিউম্যান [১৮০১–৯০] কর্তৃক ক্যাথলিক ধর্মতত্ত্বে প্রয়োগ করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন খ্রিস্টধর্ম আদিম ধর্মমতের স্বাভাবিক, অতএব বৈধ, উন্নত রূপ। কিন্তু তিনি সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হননি যে সিদ্ধান্তে মডার্নিস্টরা উপনীত হয়েছিলেন, অর্থাৎ ক্যাথলিক ধর্ম যদি তার প্রবৃদ্ধি লাভের ক্ষমতা হারিয়ে মারা যেতে না চায়, তাহলে তাকে আধুনিক চিন্তার কিছু কিছু ফল অবশ্যই আত্মস্থ করে নিতে হবে। ক্যাথলিক ধর্মের জন্য তাঁরা এটাই করার চেষ্টা করেছেন।

পোপ দশম পায়াস [১৯০৩–১৯১৪] আধুনিকতাবাদীদের দমন করার জন্য সব রকম চেষ্টা করেছেন। ১৯০৭ সালে (জুলাই) এক অনুশাসন (decree) জারি করে তিনি আধুনিক বাইবেল সমালোচনার যে বিভিন্ন ফলাফলকে লোআসির লেখায় সমর্থন করা হয়েছিল সেগুলির নিন্দা করলেন। নিউম্যানের লেখা থেকে অনুমিত হতে পারে এমন দুটি মৌলিক প্রস্তাবকে ঐ ডিক্রিতে নিকৃষ্ট বলে রায় দেওয়া হলো। প্রস্তাব দুটো এই : ১. "গির্জার আঙ্গিক গঠনতন্ত্র অপরিবর্তনীয় নয়, পরন্তু প্রত্যেক মানব সমাজের মতো খ্রিস্টীয় সমাজও এক নিরন্তর বিবর্তনের অধীন।" এবং ২. "যেসব ডগ্‌ম্যা বা বদ্ধবিশ্বাসকে গির্জা প্রত্যাদিষ্ট বলে মনে করেন, সেগুলো আকাশ থেকে পড়েনি, বরং মানবমন দীর্ঘ শ্রমে যেসব ধর্মীয় সত্যে উপনীত হয়েছে তারই [মনুষ্যকৃত] ব্যাখ্যা ওগুলো"। তিন মাস পরে পোপ মডার্নিস্টদের মতামতের বিস্তৃত আলোচনাসম্বলিত এক দীর্ঘ 'এনসাইক্লিক্যাল' পত্র প্রকাশ করলেন, যাতে ঐ অমঙ্গল উচ্ছেদ করার জন্য বিভিন্ন উপায়ের বিধান দেওয়া হয়েছিল। কোনো মডার্নিস্টই স্বীকার করবেন না যে এই দলিলে তাঁর মতামতের পরিষ্কার প্রতিফলন ঘটেছে। তবু কিছু মন্তব্য খুবই যথার্থ বলে মনে হয়। তাঁদের একখানা বই–এর কথাই ধরুন : [পোপ দশম পায়াসের ভাষায়]

> এক পৃষ্ঠায় হয়তো একজন ক্যাথলিকও স্বাক্ষর দেবেন ; পৃষ্ঠা ওল্টান, আপনার মনে হবে আপনি একজন যুক্তিবাদীর লেখা পড়ছেন। ইতিহাস লিখতে গিয়ে তাঁরা খ্রিস্টের দেবত্বের কথা উল্লেখ করেন না ; কিন্তু গির্জার প্রচারবেদিতে উঠে তাঁরা কথাটি উচ্চরবে ঘোষণা করেন।

প্রাচীন বদ্ধবিশ্বাসের পুরোনো অর্থ ঝেড়ে ফেলে শুধু অক্ষরগুলো রেখে দেওয়ার এসব প্রয়াস দেখে একজন সরল-সহজ মানুষ ধাঁধায় পড়ে যেতে পারেন, এবং ভাবতে পারেন এটা খুবই স্বাভাবিক যে, ক্যাথলিক ধর্মের প্রধান নেতা ঐ ধর্মের মূল নীতিসমূহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর নতুন জ্ঞানের বিরুদ্ধে একটা পরিষ্কার ও নির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করবেন। অতীতে বহু বছর ধরে প্রটেস্ট্যান্ট গির্জাগুলোর অভ্যন্তরে উদারপন্থী ধর্মোপদেষ্টারা সেই কাজটিই করে আসছিলেন যা এখন মডার্নিস্টরা করছেন। 'খ্রিস্টের দেবত্ব' কথাটি ব্যবহার করা হয়, কিন্তু তা এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যাতে কোনো অলৌকিক জন্মের ইঙ্গিত না থাকে। পুনরুত্থানের কথা প্রচার করা হয়, কিন্তু এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যাতে কোনো অলৌকিক শারীরিক পুনরুত্থান বোঝা না যায়। বাইবেলকে 'ইন্‌স্‌পায়ার্ড' [প্রত্যাদিষ্ট] গ্রন্থ বলা হয়, কিন্তু 'ইন্‌স্‌পিরেশন' [প্রেরণা] শব্দটি সেখানে অস্পষ্ট অর্থে ব্যবহৃত—অনেকটা সেই রকম যখন কেউ বলে যে প্লেটো 'ইন্‌স্‌পায়ার্ড' [স্বীয় অন্তরে অনুপ্রাণিত] ছিলেন। এবং 'ইন্‌স্‌পিরেশন'-এর এই নতুন ধারণার অস্পষ্টতাকে এমন কি একটি উৎকর্ষ বলে পেশ করা হয়। অলৌকিককে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা এবং পুরোনো ধর্মনিষ্ঠা—এই দুই চরম মতের মাঝখানে বিশ্বাসের অনেকগুলো পর্যায় রয়েছে। আজকের চার্চ অফ ইংল্যান্ড [ইংল্যান্ডের গির্জা]তার সাধারণ সদস্যদের কাছ থেকে অথবা যাজকদের কাছ থেকে ন্যূনতম কতটা বিশ্বাস দাবি করে তা বলা মুশকিল। সম্ভবত প্রত্যেক নেতৃস্থানীয় পুরোহিত একটি ভিন্ন উত্তর দেবেন।

ইংল্যান্ডের গির্জার অভ্যন্তরে যুক্তিবাদের উত্থান একটি আকর্ষণীয় বিষয় এবং এই ঘটনা গির্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের একটি বিশদ চিত্র দেয়। *ইভান্‌জেলিক্যালিজ্‌ম* [সুসমাচারবাদ] নামে পরিচিত ভক্তিবাদী আন্দোলনকে জনপ্রিয় করার কাজে উইলিয়ম উইলবারফোর্স [১৭৫৯-১৮৩৩]-এর *প্রাক্‌টিক্যাল ভিউ অফ ক্রিশ্চিআনিটি* [খ্রিস্টধর্মের বাস্তবসম্মত পর্যবেক্ষণ] (১৭৯৭) অনেক অবদান রেখেছিল। এই ইভান্‌জেলিক্যালিজ্‌ম অ্যাংগ্লিক্যান ধর্মমণ্ডলীর অভ্যন্তরে মেথডিজ্‌ম [নিয়মনিষ্ঠাবাদ]-এর ভাবধারা সঞ্চার করে আঠারো শতকের সেই উৎফুল্ল মেজাজের পাদ্রিদের দিন শেষ করে দেয়, যাঁরা এডওয়ার্ড গিবন [১৭৩৭-১৭৯৪]-এর ভাষায় ধর্মবিধি "মেনে চলতেন একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিংবা একটু স্মিত হাস্য সহকারে।" 'স্যাবাথ' বা কর্মবিরতির দিন সংক্রান্ত কঠোর নিষেধাজ্ঞা পুনরায় চালু করা হলো, মঞ্চাভিনয় বর্জনীয় ঘোষিত হলো, মানবপ্রকৃতির কলুষ হলো প্রধান বিবেচ্য বিষয়, এবং বাইবেল আগের সকল সময়ের চেয়ে আরো বেশি করে একটা 'ফিটিশ' (fetish) বা পূজার পাথরে পরিণত হলো। এই তথাকথিত ধর্মীয় 'প্রতিক্রিয়া'র সাফল্যের পেছনে, কারণ হিসেবে না হলেও, সহায়ক উপাদান হিসেবে ছিল এই সাধারণ বিশ্বাস যে ফরাসি বিপ্লব মুখ্যত ধর্মে অবিশ্বাসের কারণেই ঘটেছিল। জনগণকে শৃংখলার মধ্যে রাখার জন্য ধর্মের মূল্য প্রদর্শনকারী শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে ঐ বিপ্লবকে গ্রহণ করা হয়েছিল। খোদ ফ্রান্সেও একটা ধর্মীয় 'প্রতিক্রিয়া' হয়েছিল। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই এর অর্থ এই নয় যে মুক্ত চিন্তার প্রভাব কমে গিয়েছিল, বরং সংখ্যাগুরুর বিশ্বাস এখন আরো আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিল এবং তা অনেক শক্তিমান মুখপাত্র পেয়েছিল, আর আঠারো শতকীয় ধাঁচের যুক্তিবাদ চলনবহির্ভূত হয়ে পড়েছিল।

দর্শনের সাথে খাপ খাওয়ানোর মতো করে নৈষ্ঠিক ধর্মের একটা উদারপন্থী ব্যাখ্যা দানে উৎসাহী এক নতুন ধরনের যুক্তিবাদের প্রতিনিধিত্ব করতেন স্যামুয়েল টেলর কোল্‌রিজ

[১৭৭২–১৮৩৪] যিনি প্রভাবিত ছিলেন জার্মান দার্শনিকদের দ্বারা। কোলরিজ ছিলেন গির্জার একজন সমর্থক এবং তিনি উদারনৈতিক ধর্মতত্ত্বের একটি দার্শনিক গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছিলেন ; আর ঐ ধর্মতত্ত্বের প্রভাব [উনবিংশ] শতাব্দীর মধ্যকালের পরে অনুভূত হয়েছিল। নতুন 'হাই চার্চ' [উন্নত গির্জা] দলের সবচেয়ে বিশিষ্ট নেতা নিউম্যান বলেছিলেন যে তিনি এতটা কল্পনার স্বাধীনতা চর্চা করতেন যা কোনো খ্রিস্টানের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব ছিল না। শতাব্দীর দ্বিতীয় চতুর্থাংশে বিকশিত হওয়া 'হাই চার্চ' আন্দোলন ধর্মীয় চিন্তার স্বাধীনতার প্রতি ইভ্যান্‌জেক্যালিজ্‌মের মতোই বৈরিভাবাপন্ন ছিল।

পরিবর্তনটা এলো শতাব্দীর মধ্যভাগের পরে, যখন হেগেল ও কোঁতের দর্শনের তথা বাইবেলের বিদেশী সমালোচনার ফল ইংল্যান্ডের গির্জার অভ্যন্তরে অনুভূত হতে শুরু করলো। এই সময়ে মুক্তচিন্তাজাত দুখানা অসাধারণ বই প্রকাশিত হয়। ব্যাপক হারে পঠিত এ দুটি বই ছিল এফ. ডব্লিউ. নিউম্যানের *ফেজেজ অফ ফেইথ* [বিশ্বাসের পর্যায়সমূহ] এবং ডব্লিউ. আর. গ্রেগের *ক্রীড অফ ক্রিস্টেন্‌ডম* [খ্রিস্টজগতের ধর্মমত] (উভয়ই ১৮৫০)। নিউম্যান (কার্ডিনাল নিউম্যানের ভাই) খ্রিস্টধর্মের সাথে সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন করেছিলেন এবং যে মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি তাঁর একদা পোষিত বিশ্বাসসমূহ পরিত্যাগ করলেন তা তাঁর বই–এ বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত সব চেয়ে কৌতূহলজনক যে বিষয়টির উল্লেখ তিনি করেছেন, তা হচ্ছে নীতিশাস্ত্র হিসেবে *নিউ টেস্টামেন্ট* শিক্ষার অসম্পূর্ণতা। গ্রেগ ছিলেন একজন ইউনিট্যারিয়ান বা একত্ববাদী। তিনি বদ্ধবিশ্বাস (dogma) ও প্রত্যাদেশ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেকে একজন খ্রিস্টান মনে করতেন। স্যর জেম্‌স এফ. স্টিফেন [১৮২৯–১৮৯৪] রসিকতা করে গ্রেগের অবস্থানের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে তাঁর অবস্থা হচ্ছে এক ভক্ত শিষ্যের মতো "যিনি 'সারমন অন দ্য মাউন্ট' [পাহাড় চূড়ার ভাষণ] শুনেছিলেন, অলৌকিক ঘটনাবলীর প্রতি যাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করাই হয়নি, এবং যিনি পুনরুত্থানের আগেই মারা গিয়েছিলেন।"

অল্প কয়েকজন ইংরেজ যাজক (প্রধানত অক্সফোর্ডের লোক) [বাইবেলের] জার্মান সমালোচনায় আগ্রহী ছিলনে এবং উদার মতামতের দিকে ঝুঁকেছিলেন। এসব মতামত অবিশ্বাস থেকে অভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়েছিল ইভান্‌জেলিক্যাল ও হাই চার্চ পুরোহিতদের কাছে। অক্সফোর্ডের ঐ ধর্মবিদ্‌দের আমরা 'ব্রড চার্চ' [প্রশস্ত গির্জা] নামে অভিহিত করতে পারি—যদিও এই নামটি এসেছে পরবর্তীকালে। ১৮৫৫ সালে বেনজামিন জোওয়েট (Jowett) [১৮১৭–১৮৯৩] (পরে ব্যালিঅলের [Balliol] মাস্টার হয়েছিলেন) সন্ত পলের পত্রাবলীর কয়েকখানির একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন, যাতে তিনি খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের স্বরূপ উন্মোচন করেছিলেন। এই প্রকাশনায় ছিল অ্যাটোনমেন্ট বা খ্রিস্টীয় প্রায়শ্চিত্ত বিধির এক বিধ্বংসী সমালোচনা, 'অরিজিন্যাল' সিন' বা আদি পাপের সুস্পষ্ট প্রত্যাখ্যান এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রশ্নটির একটি যুক্তিবাদী আলোচনা। কিন্তু এই রচনা এবং উদারপন্থী ধর্মশাস্ত্রীদের অন্য কতিপয় অনৈষ্ঠিক রচনা খুব সামান্যই গণমনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, যদিও তাদের প্রণেতাদের ছোটখাটো নির্যাতন সইতে হয়েছিল। পাঁচ বছর পর জোওয়েট এবং ঐ উদারপন্থী ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর আর কয়েকজন সদস্য "অত্যন্ত ডাহা সত্যের বিবরণ দিতে বাধা দেয় যে জঘন্য সন্ত্রাসবাদী ব্যবস্থা" তাকে অমান্য করার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রকাশ করলেন এক খণ্ড '*এসেজ অ্যান্ড রিভিউজ* [প্রবন্ধমালা ও নিরীক্ষাবলী'] (১৮৬০), যার সাত জন লেখকের মধ্যে

ছ'জনই ছিলনে পুরোহিত। এই রচনাগুলিতে যেসব মতের পক্ষে বলা হয়েছে সেগুলি আজ যথেষ্ট কোমল মনে হবে এবং তার অনেকগুলিই এখনকার অধিকাংশ সুশিক্ষিত পাদ্রি গ্রহণ করবেন, কিন্তু সেই সময়ে সেগুলি বড় যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি সৃষ্টি করেছিল। প্রণেতাদেরকে 'খ্রিস্টবিরোধী সাত জন' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। [তাঁদের রচনার দৃষ্টান্তে] নিয়ম তৈরি হয়ে গেল যে, বাইবেলকে অন্য যেকোনো বই-এর মতোই ব্যাখ্যা করা চলবে।

> একজন তরুণ ছাত্র যেসব নীতি সাধারণ বই-এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে ইতস্তত করবে, ধর্মশাস্ত্রের ক্ষেত্রে সেই নীতিগুলিই প্রয়োগ করা ; সাধারণ ইতিহাসের বেলায় যেসব অসমাঞ্জস্যের বিরোধ দূর করার কথা সে চিন্তাও করবে না, সে ধরনের অসামঞ্জস্যের আনুষ্ঠানিক সমন্বয়সাধন করা ; সরল শব্দাবলীকে দু'রকম অর্থে ভাগ করে ফেলা ; পাদ্রি ও ভাষ্যকারদের খেয়ালি কল্পনা ও আন্দাজি ধারণাগুলোকে প্রকৃত জ্ঞান বলে গ্রহণ করা—এ রকম কাজকর্ম ঐ তরুণ ছাত্রের জন্য মোটেই দরকারি শিক্ষা নয়।

এ রকম ধারণা দেওয়া হয়েছে যে হিব্রু বাইবেলের ভাববাণীগুলিতে ভবিষ্যৎকথনমূলক কোনো উপাদান নেই। পরস্পরবিরোধী বিবরণ, অথবা আন্দাজি কল্পনাবলেই সামঞ্জস্য বিধান করা যায় এমন সব বিবরণ, সম্ভবত ঈশ্বর কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হতে পারে না। ম্যাথ্যু ও লুক-এ বর্ণিত যিশুর বংশ লতিকার মধ্যে অসামঞ্জস্য, কিংবা পুনরুত্থানের বিভিন্ন বিবরণের মধ্যে অমিল "না আমাদের ক্ষমতার কোনো ত্রুটির উপর, না যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমিত কোনো গুপ্ত প্রাজ্ঞ পরিকল্পনার উপর, না বর্ণনাকারীদের কোনো আংশিক আধ্যাত্মিক গুণের উপর" আরোপ করা যায়। অলৌকিক ঘটনাবলীর সমর্থনে সত্যতার সর্বোচ্চ প্রমাণ হিসেবে প্রত্যক্ষদর্শীদের জোরালো বক্তব্যের উপর গুরুত্ব দিয়ে ধর্মনিষ্ঠদের তর্কজালকে বাতিল করা হয়েছে এই যুক্তিতে যে, সাক্ষ্য একটি অন্ধ পথনির্দেশক এবং তা যুক্তির বিপরীতে, তথা বিশ্বে স্থায়ী শৃংখলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করার সপক্ষে আমাদের যে শক্ত ভিত্তি আছে তার বিপরীতে, কিছুই অবলম্বন করতে পারে না। তর্কচ্ছলে এও বলা হয়েছে যে, 'উনচল্লিশ ধারা'-র আওতায় এ ধরনের গল্প—যেখানে গাধা মানুষের স্বরে কথা বলে, নিরেট স্তূপের আকারে দাঁড়িয়ে থাকে জলরাশি, ডাইনি ও নানা ধরনের প্রেত ও অপচ্ছায়ার কথা থাকে—সেগুলোকে "রূপক কাহিনী কিংবা কাব্য অথবা কিংবদন্তী" হিসেবে গ্রহণ করা অনুমোদনযোগ্য ; আরো অনুমোদনীয় শয়তানের ব্যক্তিত্ব কিংবা আদিকালে স্যাব্যাথ বা সাপ্তাহিক কর্মবিরতি প্রবর্তনের মতো প্রশ্নগুলিকে আমাদের নিজস্ব ভঙ্গিতে বিচার করা। পুস্তকখানির সমগ্র মেজাজ সম্ভবত নিচের পর্যবেক্ষণে ব্যক্ত হয়েছে।

> যদি কেউ উপলব্ধি করে যে,
>
> খ্রিস্টধর্মের উৎসটি কি বিরাট পরিমাণে সম্ভাব্য প্রমাণের উপর নির্ভরশীল, তার নীতিই তাকে বাঁচাবে অনেক জটিলতা থেকে, যেগুলো অন্যথায় অত্যন্ত উদ্বেগজনক হতে পারে। কারণ যেসব বিবরণ ইতিহাসের বিষয়বস্তু হিসেবে সন্দেহজনক ভিত্তির উপর অবস্থান করে এবং ইতিহাস হিসেবে যাদের সত্য নির্ধারণ করা বা যাচাই করা সম্ভব নয়, সে ধরনের বিবরণও সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত সত্য ব্যাপারের সাথে সমানভাবে অভ্রান্ত ধারণার সন্ধান দিতে পারে। অর্থাৎ সেগুলোর একটি আধ্যাত্মিক তাৎপর্য থাকতে পারে, যদিও ঐতিহাসিক দিক থেকে তারা মিথ্যা।

প্রবন্ধগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দুঃসাহসী ছিল রেভারেণ্ড ব্যাডেন—পাওয়েলের "স্টাডি অফ দ্য এভিডেন্সেস্ অফ ক্রিশ্চিয়ানিটি" [খ্রিস্টধর্মের প্রমাণাদি সংক্রান্ত আলোচনা]। তিনি বিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন, ডারউইনবাদ গ্রহণ করেছিলেন এবং অলৌকিক ঘটনা অসম্ভব বলে মনে করতেন। যা হোক, বিশপেরা প্রবন্ধ গ্রন্থটিকে দোষাবহ বলে নিন্দা করে বিবৃতি দিলেন। ফলে ১৮৬২ সালে দুজন প্রবন্ধ রচয়িতাকে উৎপীড়ন করা হয় ও ধর্মীয় আদালতে বিচার করা হয়, কেননা যাজকত্র সম্পত্তিভোগী পুরোহিত ছিলেন বলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি হামলার সুযোগ ছিল। কিছু অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেলেও বাকিগুলিতে দোষী সাব্যস্ত হয়ে তাঁরা এক বছরের জন্য কর্মচ্যুত (suspended) থাকার শাস্তি পেলেন। তাঁরা প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করলেন। মন্ত্রী পরিষদের আইনবিষয়ক কমিটির রায় ঘোষণা করলেন লর্ড ওয়েস্ট্‌বেরি (লর্ড চ্যান্সেলর), যাতে ধর্মীয় আদালতের সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে গেল। কমিটি অন্যান্য বিষয়ের সাথে এই মতও পোষণ করে যে অনন্তকালব্যাপী [নরকবাসের] শাস্তিতে বিশ্বাস করা একজন ধর্মযাজকের জন্য অপরিহার্য নয়। এই রায়ের ফলেই লর্ড ওয়েস্ট্‌বেরির উপর এই তির্যক মন্তব্য করা হয়েছিল : "স্বীয় পার্থিব জীবনের শেষ দিকে তিনি খরচসহ নরক বাতিল করেছিলেন এবং চার্চ অফ ইংল্যান্ডের ধর্মনিষ্ঠ সদস্যদের কাছ থেকে তাঁদের অনন্ত নরকবাসের শেষ আশাটুকুও কেড়ে নিয়েছিলেন"।

এ ছিল 'ব্রড চার্চ দলের জন্য একটা বিরাট বিজয় এবং ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় গির্জার ইতিহাসে এ একটি কৌতূহলজনক ঘটনা। অযাজকীয় ব্যক্তিবর্গ (ক্যান্টারবারি ও ইঅর্কের আর্কবিশপদের মতামত বাতিল করে) নির্ধারণ করলেন ধর্মীয় বিধিবিধানের কোন্‌গুলি একজন যাজকের জন্য বাধ্যতামূলক এবং কোন্‌গুলি তা নয়, এবং গির্জার অভ্যন্তরে মতপোষণের এমন এক স্বাধীনতা অনুমোদন করলেন যাকে গির্জার অধিকাংশ প্রতিনিধি মারাত্মক ক্ষতিকর বলে মনে করতেন। এই স্বাধীনতা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৬৫ সালে পার্লামেন্টের একটি আইন দ্বারা। যেরূপে যাজকদেরকে 'উনচল্লিশ ধারা'মেনে চলার অঙ্গীকার করতে হতো, তা বদলে দেয় ঐ আইন। '*এসেজ অ্যান্ড রিভিউজ*' গ্রন্থের এই কাহিনী ইংল্যান্ডে ধর্মীয় চিন্তার ইতিহাসে একটি সূচক ঘটনা (Landmark)।

ব্রড চার্চের পুরোহিতদের উদার মতামত এবং বাইবেলের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী তাঁদের সাথে যাঁদের মতপার্থক্য সব চেয়ে বেশি ছিল সেই তাঁদের উপর ক্রমান্বয়ে কিছু প্রভাব ফেলেছিল। আর আজকের দিনে হয়তো তেমন কেউই নেই যিনি অন্তত স্বীকার না করবেন যে, *বাইবেলের* 'জেনেসিস', অধ্যায় ১৯–এর মতো একটা অনুচ্ছেদ ঈশ্বরের সরাসরি প্রত্যাদেশ ছাড়াই রচিত হয়ে থাকতে পারে।

পরের কয়েক বছরে ধর্মনিষ্ঠ জনমত আঘাত পেয়েছিল বা বিক্ষুব্ধ হয়েছিল কয়েকখানি অসাধারণ বই প্রকাশিত হওয়ায়, যেগুলি ধর্মীয় কর্তৃত্বের সমালোচনায় মুখর ছিল, কিংবা তাদেরকে উপেক্ষা বা অমান্য করেছিল। এসব বই–এর মধ্যে ছিল লিয়েল–এর '*অ্যান্টিক্যুইটি অফ ম্যান* [মানবের প্রাচীনতা] ১৮৬৩ জে. আর. সীলি [১৮৩৪–১৮৯৫]–র '*একসি হোমো* [কন্টককিরীটী যিশু (১৮৬৫)] (যে বই ছিল, ধর্মাত্মা লর্ড শফট্‌স্‌বেরি [১৮০১–১৮৮৫]–র ভাষায়, "নরকের চোয়ালের মধ্য থেকে বমন করা"), এবং ডবল্যু, এইচ, লেকি [১৮৩৮–১৯০৩]–র *হিস্ট্রি অফ* র‍্যাশ্‌ন্যালিজ্‌ম [যুক্তিবাদের ইতিহাস (১৮৬৫)]। তা ছাড়া স্বাধীনতার এক নতুন কবির উদয় হলো যিনি কর্তৃপক্ষ পবিত্র মনে করতেন এমন সব কিছুর বিরুদ্ধেই অবজ্ঞার উচ্চতম সুর ধ্বনিত করতে ভয় পাননি। উনিশ শতকের সব বড় কবিই কমবেশি

ধর্মে অনৈষ্ঠিক ছিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ [১৮৭০–১৮৮০] তাঁর সর্বোচ্চ প্রেরণার দিনগুলোতে ছিলেন একজন সর্বেশ্বরবাদী। এবং সকলের চেয়ে বড় শেলি [১৭৯২–১৮২২] ছিলেন একজন ঘোষিত নিরীশ্বরবাদী। নির্ভীক উচ্চারণে, দেবগণের ও সরকারসমূহের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে অবিকম্পিত উদ্দীপনায় সুইনবার্ন [১৮৩৭–১৯০৯] ছিলেন শেলিরই মতো। নিজের লেখা নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের উক্তির জন্য কবিকে জবাবদিহি করতেই হবে এমন নয়, তথাপি সুইনবার্নের নাটক *অ্যাট্যালান্টা ইন ক্যালিডন* [ক্যালিডনে অতলান্তা] (১৮৬৫) "চূড়ান্ত অমঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বর"–কে নিন্দা করে এক নতুন বীরের আগমন ঘোষণা করলো, যে বীর কর্তৃত্বের সকল দুর্গকে অগ্রাহ্য করবে। আর পরের বছরে তাঁর *পোএম্‌স অ্যাণ্ড ব্যালাড্‌স* [কবিতাবলী ও গাথাসঙ্গীতমালা] ব্যক্ত করলো এক অপধর্মীর মানসিকতা, যে খ্রিস্টীয় জগতের সকল সংস্কার ও পবিত্র অলঙ্ঘনীয়তাকে বিদ্রূপ করে।

তবে ইংল্যান্ডে ধর্মীয় অধিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে তীব্র ও উত্তেজনাপূর্ণ সাহিত্যিক লড়াই শুরু হয় ১৮৬৯ সালের দিকে এবং তা প্রায় এক যুগ স্থায়ী হয়। এই সময়ে বদ্ধবিশ্বাসের শত্রুরা, সকল গোষ্ঠীর অন্তর্গত শত্রুরা, শতাব্দীর অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে কম সংযতবাক্ এবং বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিলেন। লর্ড মর্লে [১৮৩৮–১৯২৩] মন্তব্য করেছেন যে, "দূরকল্পী (speculative) সাহিত্যের শক্তি সর্বদা বাস্তবে সময়োচিত হওয়ার উপর নির্ভর করে," এবং এই মন্তব্যের দৃষ্টান্তস্থল হচ্ছে [আঠারো শো] সত্তরের দশকের যুক্তিবাদী সাহিত্য। সেটা ছিল আশা ও ভয়ের একটা সময়, প্রগতি আর বিপদেরও কাল। অনাধ্যাত্মিকতাবাদী ও যুক্তিবাদীরা উৎসাহিত হয়েছিলেন আয়ারল্যান্ডে গির্জাকে সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন করায় (১৮৬৯), নাস্তিকদেরকে বিচারালয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার অধিকার দিয়ে আইন পাশ হওয়ায় (১৮৬৯), এবং ১৮৭১ সালে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মীয় পরীক্ষা নেওয়ার প্রথা বিলুপ্ত হওয়ায় (যে পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা আগে অনেক বারই ব্যর্থ হয়েছিল)। অপর পক্ষে, ১৮৭০ সালের শিক্ষা আইন, প্রগতিমুখী হলেও, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার প্রবক্তাদের হতাশ করেছিল, এবং তা ছিল যাজকীয় প্রভাবের শক্তিমত্তার এক অবাঞ্ছিত সংকেত। তা ছাড়া ছিল পোপের [নবম পায়াস (১৮৪৬–১৮৭৮)] অভ্রান্ততা সংক্রান্ত অনুশাসন (ভ্যাটিক্যান কাউন্সিল ১৮৬৯–১৮৭০ কর্তৃক) জারি হওয়ায় রোমান ধর্মমণ্ডলীর বাইরের ইউরোপের সকলের মধ্যে এবং ঐ মণ্ডলীর ভেতরেও কিছু লোকের মধ্যে অনুভূত বিপদসঙ্কেত। এবং জনৈক ইংরেজ (কার্ডিনাল ম্যানিং [১৮০৮–১৮৯২]) ছিলেন ঐ অনুশাসন জারি করানোর ব্যাপারে সবচেয়ে সক্রিয় উৎসাহীদের একজন। অনুশাসনটি হয়তো এতটা আশঙ্কার কারণ হতো না, যদি পোপ কর্তৃক আধুনিক 'ভুল–ভ্রান্তি'র কঠোর নিন্দাবাদ মানুষের স্মৃতিতে জাগরুক না থাকতো। ১৮৬৪ সালের শেষে তিনি দুনিয়াকে চমকে দিয়েছিলেন "আমাদের যুগের প্রধান প্রধান ভ্রম অন্তর্ভুক্ত করে" একখানি "সিলেবাস" [নির্ঘন্ট] প্রকাশের মাধ্যমে। এসব ভ্রমের মধ্যে এই প্রস্তাবগুলো ছিল : ১. প্রত্যেক ব্যক্তি, যুক্তির আলোকে যে ধর্মকে সে সত্য বলে মনে করে, তা স্বাধীনভাবে গ্রহণ ও প্রচার করতে পারবে ; ২. শক্তিপ্রয়োগের কোনো অধিকার গির্জার নেই ; ৩. ধর্মীয় ও যাজকীয় কর্তৃত্বের পরোয়া না করে অধিবিদ্যা (metaphysics) [অর্থাৎ সৃষ্টি ও জ্ঞান সম্পর্কিত দর্শনশাস্ত্র] চর্চা করতে পারা যাবে ও যাওয়া উচিত, ৪. বিদেশাগত অভিবাসীদেরকে তাদের নিজ নিজ ধর্ম প্রকাশ্যে চর্চা করতে দেওয়া ক্যাথলিক রাষ্ট্রগুলির অন্যায় নয় ; এবং ৫. পোপের উচিত প্রগতি, উদারতাবাদ, ও আধুনিক সভ্যতার সাথে আপোস করা। এই দলিলকে 'আলো জ্বালানোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা' বলে ধরে নেয়া

হয়েছিল, আর ভ্যাটিক্যান কাউন্সিল অনুষ্ঠানকে [১৮৬৯] ধরা হয়েছিল 'অন্ধকারের বাহিনীর প্রথম রণকৌশগত পদক্ষেপ' হিসেবে।

মনে হলো, জ্ঞানালোকবিরোধী শক্তিসমূহ তাদের মাথা তুলছে নতুন এক ভীতি প্রদর্শন করতে, এবং সহজাত প্রেরণা থেকে একটা অনুভূতি এলো যে, যুক্তির পক্ষের সকল শক্তিকে মাঠে নামানো উচিত। গত চল্লিশ বছরের [আ. ১৮৭০–১৯১০] ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে যে, বদ্ধবিশ্বাসে পর্যবসিত অভ্রান্ততার তত্ত্ব এখন আর আগের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর নয়। কিন্তু কাউন্সিল অনুষ্ঠানের পরের বছরগুলোতে ক্যাথলিক গির্জা কর্তৃক ফরাসি প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটানোর এবং নতুন জার্মান সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরানোর প্রচেষ্টা ছিল যথেষ্ট উদ্বেগজনক। এর বিপরীতে স্থাপন করতে হবে পোপদের অযাজকীয় ক্ষমতা লোপ এবং ইতালির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা [১৮৭০]। এই ঘটনা ছিল সুইনবার্নের *সংগ্স বিফোর সানরাইজ* [সূর্যোদয়ের আগের গান] (যা বেরিয়েছিল ১৮৭১–এ)–এর সূর্যোদয়। আর সুইনবার্নের ঐ বইখানি ছিল নিরীশ্বরবাদ ও বিপ্লবের একটি বীজচক্রান্ত যা বপন করা হয়েছিল ধর্মমতসমূহ ও উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে অপ্রশমনীয় ঘৃণা সহকারে। বইটির সব চেয়ে বিস্ময়কর কবিতা "দ্য হিম্ অফ ম্যান" [মানবস্তোত্র] লেখা হয়েছিল ভ্যাটিক্যান কাউন্সিল চলতে থাকা কালে। এটি ছিল পুরোহিতদের ঈশ্বরের উপর–পোপের অযাজকীয় ক্ষমতা লোপের আঘাতে আহত ঈশ্বরের উপর—বিজয়ের গান। শেষের পংক্তিগুলিতে কবিতাটির মর্মকথা প্রকাশ পেয়েছে :

তোমার নামে—যে নাম লেখা ছিল নরকের আগুনে,
যে নাম দগ্ধ তোমার তলোয়ারের আঁগায়,
তুমি আহত, তুমি ঈশ্বর, তুমি আঘাতপ্রাপ্ত ;
তোমার মৃত্যু তোমারই উপরে, হে প্রভু।
আর তুমি যবে মরে যাও, পৃথিবীর প্রেমগান
তারই পাখার বাতাসে হয় অনুরণিত—
মানুষকেই দেই সর্বোচ্চ গৌরব ! কেননা
মানুষই তো সব কিছুর প্রভু।

এ রকম এক খণ্ড বই যে কোনো রকম শাস্তি ছাড়াই প্রকাশিত হতে পেরেছিল—এ ঘটনা অতি স্পষ্টরূপে বিশদ করে দেয় যে, ঈশ্বরনিন্দা–বিরোধী আইন শুধুমাত্র সাধারণ জনগণকে লক্ষ্য করে লেখা রচনাবলীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই ইংল্যান্ডের নীতি ছিল।

এভাবে রাজনৈতিক প্রতিবেশ যুক্তিবাদীদের সাহসের সাথে সামনে এগিয়ে আসতে আমন্ত্রণ জানালো ও উৎসাহিত করলো। কিন্তু আমরা বুড চার্চ আন্দোলন ও ডারউইনবাদের প্রভাবকে অবশ্যই হিসাব থেকে বাদ দেবো না। ডারউইনের *ডিসেন্ট অফ ম্যান* [মানববংশ পরিচয়] ঠিক ঐ ১৮৭১ সালেই প্রকাশিত হয়। গির্জার প্রচারবেদিগুলিতে এক নতুন, বদ্ধবিশ্বাসবর্জিত (undogmatic) খ্রিস্টধর্ম প্রচারিত হচ্ছিল। মি. লেসলি স্টিফেন [১৮৩২–১৯০৪] মন্তব্য করেছিলেন (১৮৭৩) ঃ

> মোটেই অতিরঞ্জিত না করে বলা যেতে পারে যে, ধর্মে এমন কোনো বিধি নেই যার বিরোধিতা করে শাস্তি এড়ানো না যায়। শুধু তাই নয়, বরং এমন বিধিও নেই যার বিরোধিত ধর্মনিষ্ঠ হিসেবে খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে না করা যায়, যে ভাষণ একটি বিশপ পদ লাভের জন্য হিসেব করে নেওয়া পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হতে

পারে। এক সাবধানী গির্জা–তত্ত্বাবধায়ক সম্পর্কে সুপরিচিত গল্পটিতে জনগণের মনের অবস্থার স্বরূপটি ধরা পড়েছে বলে মনে হয়। ঐ তত্ত্বাবধায়ক তাঁর গির্জায় পদাধিকারী পাদ্রির ধর্মভাষণের সাধারণ ধারার প্রশংসা করতে গিয়ে একটি বিষয়ে আপত্তি তোলার ঝুঁকি নিতে দায়বদ্ধ অনুভব করলেন : "দেখুন মহাশয়, "কৈফিয়তের সুরে তিনি বললেন, "আমার মনে হয় একজন ঈশ্বর আছেন।" ধর্মের প্রথম বিধিটি সম্পর্কে সন্দেহের ইঙ্গিত দিতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছিল এটি একটি রুচির ভুল, অথবা বিচারের।

নন্দনতাত্ত্বিক আন্দোলন (জন রাস্কিন [১৮১৯–১৯০০], উইলিয়ম মরিস [১৮৩৪–১৮৯৬], প্রাক্–রাফায়েলীয় চিত্রশিল্পীরা ; আর ওয়ালটার পেটার [১৮৩৯–১৮৯৪]–এর লেক্চার্স অন দ্য *রেনেসাঁস* [রেনেসাঁসের উপর বক্তৃতামালা], ১৮৭৩) বিদগ্ধ শ্রেণীগুলোর মধ্যে যে প্রভাব ফেলেছিল তাও ঐ সময়ের একটি নিদর্শন। কারণ এসব সমালোচক, শিল্পী, ও কবির মনোভাব ছিল মূলত পেগান বা পৌত্তলিক অপধর্মাত্মক। [খ্রিস্টীয়] ধর্মতত্ত্বের দীর্ঘকাল সঞ্চিত সত্যসমূহ তাঁদের কাছে এমন ছিল যেন ওগুলো আদৌ নেই। সুখের আদর্শ এমন একটি অঞ্চলে খুঁজে পাওয়া গেল যেখানে স্বর্গ ছিল উপেক্ষিত।

সময়টা তখন জোর গলায় কথা বলার জন্য উপযুক্ত বলে মনে হলো। এই উত্তেজনাময় বছরগুলোতে ধর্মনিষ্ঠাবর্জিত যেসব বই ও প্রবন্ধ[১] তরুণদেরকে প্রভাবিত ও বিশ্বাসীদেরকে শঙ্কিত করেছিল তার অধিকাংশই ছিল এমন লোকদের রচনা যাদেরকে খুব ন্যায্যভাবেই বর্ণনা করা যায় অ্যাগ্নস্টিক [অজ্ঞেয়বাদী] শব্দদ্বারা, যে ব্যাপক অর্থবহ নামটি সম্প্রতি উদ্ভাবন করেছিলেন প্রফেসর টমাস হাক্স্লি [১৮২৫–১৮৯৫]।

অজ্ঞেয়বাদী মনে করেন মানবীয় যুক্তির সীমা আছে এবং ধর্মতত্ত্ব ঐ সীমার বাইরে পড়ে। ঐ সীমার অভ্যন্তরে অবস্থান করছে সেই জগৎ যা নিয়ে কাজ করে বিজ্ঞান (মনোবিজ্ঞানসহ)। বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে প্রপঞ্চময় জগৎ নিয়ে কাজ করে, এবং প্রপঞ্চাতীত চরম সত্যের প্রকৃতি সম্পর্কে তার কিছুই বলার নেই। এই চূড়ান্ত সত্যের প্রতি চার প্রকার সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গি আছে। ১. অধিবিদ্যাবিদ ও ধর্মতত্ত্ববিদের দৃষ্টিভঙ্গী : তাঁরা নিশ্চিত যে ঐ সত্য শুধু যে অস্তিত্ববান তাই নয়, বরং তা অন্তত আংশিকভাবে জানাও যায়। ২. পরাবাস্তব সত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না এমন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী : কিন্তু তিনিও অবশ্যই অধিবিদ্যাবিদ হবেন, কারণ একমাত্র অধিবিদ্যাগত যুক্তিতর্ক দিয়েই ঐ সত্যের অস্তিত্ব অপ্রমাণ করা যায়। ৩. এরপর আছেন সেই সব লোক যাঁরা দাবি করেন যে ও রকম কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু আমরা সে সম্পর্কে কিছু জানতে সক্ষম এটা স্বীকার করেন না এবং ৪. সর্বশেষে রয়েছেন তাঁরা যাঁরা বলেন আমরা জানতেই পারি না যে চরম সত্য সত্যিই আছে কি নেই। এই শেষোক্ত শব্দটির সঠিক অর্থে 'অ্যাগ্নস্টিক' বা অজ্ঞেয়বাদী ; এঁরা সেই মানুষ যাঁরা *না জানার ঘোষণা দেন*। উপরের তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা প্রপঞ্চের ওপাশে ততোটুকুই যান যেখান থেকে দাবি করা যায় যে প্রপঞ্চের নিচে একটি চরম অথচ অবেদ্য সত্য বিদ্যমান। কিন্তু 'অজ্ঞেয়বাদী' শব্দটি সাধারণত একটি বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করা হয় যাতে তৃতীয় ও চতুর্থ—অর্থাৎ যাঁরা একটি অজ্ঞেয় তত্ত্বের অস্তিত্ব ধরে নেন, তথা যাঁরা কোনো অজ্ঞেয় তত্ত্ব আছে কি নেই তা জানেন না—এই উভয় শ্রেণীকেই বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ, কোঁত ও স্পেন্সার যাঁরা একটি অজ্ঞেয় সত্তায় বিশ্বাস করতেন তাঁদেরকে অজ্ঞেয়বাদী বলা

হয়। একজন অজ্ঞেয়বাদী ও একজন নিরীশ্বরবাদীর পার্থক্য এই যে, নিরীশ্বরবাদী কোনো ব্যক্তি–ঈশ্বরের অস্তিত্ব সরাসরি অস্বীকার করেন, আর অজ্ঞেয়বাদী এ তত্ত্বে বিশ্বাসই করেন না।

এই সময়ের যে লেখক অজ্ঞেয়বাদকে তার বিশুদ্ধতম রূপে ধারণ করতেন, এবং যিনি ধর্মশাস্ত্রের মতামতের উপর যুক্তির বিশুষ্ক আলো ফেলেছিলেন নির্মমতম যুক্তিপরম্পরার সাথে, তিনি হচ্ছেন মি. লেস্‌লি স্টিফেন [১৮৩২–১৯০৪]। তাঁর বিখ্যাততম প্রবন্ধ, "অ্যান অ্যাগ্‌নস্টিক'স্ অ্যাপলজি" [জনৈক অজ্ঞেয়বাদীর কৈফিয়ত] (*ফোর্টনাইটলি রিভিউ* [পাক্ষিক পুনরীক্ষণ], ১৮৭৬), এই প্রশ্ন ওঠায় যে, গোঁড়া ধর্মতাত্ত্বিকদের বদ্ধবিশ্বাসগুলির কোনো অর্থ আছে কি? মহাবিশ্বের বৈপরীত্যগুলির যে একটি বোধগম্য সমন্বয় আমরা চাই তা কি তারা দিতে পারে? প্রবন্ধে বিশদভাবে দেখানো হয়েছে যে, মানুষের সাথে ঈশ্বরের লেন–দেন সম্পর্কে ধর্মতত্ত্ববিদদের দেওয়া নানা রকম ব্যাখ্যাকে যুক্তিবিদ্যার চাপে ফেললে অজ্ঞতার স্বীকৃতিই মেলে। আর এটি অজ্ঞেয়বাদ ছাড়া কি? আপনি আপনার সন্দেহকে একটা রহস্য বলতে পারেন, কিন্তু রহস্য অজ্ঞেয়বাদেরই ধর্মতাত্ত্বিক অভিধা।

> যখন কোনো সৎ মানুষই ব্যক্তিগত পর্যায়ে অস্বীকার করবেন না যে প্রত্যেক চূড়ান্ত সমস্যাই প্রগাঢ়তম রহস্যে আবৃত, তখন কেন সৎ মানুষেরাই গির্জার প্রচারবেদিতে ঘোষণা করেন যে, সবচেয়ে নির্বোধ ও অজ্ঞদের কর্তব্য হচ্ছে দ্বিধাহীন নিশ্চিতি? আমরা এক দল অজ্ঞ প্রাণী, নিজেদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে অন্ধকারের মধ্যে একটু আলো খুঁজে চলেছি; কিন্তু যখনই আমাদের পথের চূড়ান্ত শুরু বা শেষ সম্পর্কে কিছু বলতে চেষ্টা করি তখনই আমরা নৈরাশ্যজনকভাবে বিবাদ করতে থাকি। এবং তার পরেও যখন আমাদের কেউ সাহস করে ঘোষণা করে যে, আমরা ব্রহ্মাণ্ডের মানচিত্র জানি না এবং জানি না আমাদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্যারিশ বা যাজক–পল্লীর মানচিত্রও, তখন তাকে উচ্চ রবে বিদ্রূপ করা হয়, তীব্র ভাষায় গালি দেওয়া হয়, এবং হয়তো বলে দেওয়া হয় যে, বিশ্বাসহীনতার জন্য তাকে অনন্তকাল নরকে থাকতে হবে।

লেস্‌লি স্টিফেনের প্রবন্ধগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, সেগুলি অধিষ্ঠিত ধর্মতত্ত্বকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে ততোটা পরিচালিত নয়, যতোটা ব্যস্ত দেখাতে যে ঐ তত্ত্বের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই এবং বিভিন্ন সমস্যার যেসব সমাধান ঐ তত্ত্ব দিয়ে থাকে, সেগুলি অসার ধোঁকামূলক সমাধান। তত্ত্বটি যদি বিশ্বরহস্যের কোনো অংশেরও সমাধান দিতে পারতো, তাকে স্বাগত জানানো যেতো; কিন্তু তা কোনো সমাধান দেয় না, কেবল আরো নতুন সমস্যার সংযোজন ঘটায়। এ এক "চাঁদের আলোর প্রাসাদ মাত্র।" লেখক যুক্তিতর্ক প্রয়োগে প্রমাণ করার কোনো চেষ্টা করেননি যে, পরম সত্য তত্ত্ব মানবীয় যুক্তির সীমানার বাইরে অবস্থিত। তাঁর এরূপ সিদ্ধান্তের ভিত্তি হচ্ছে এই বাস্তবতা যে, দার্শনিকেরা হতাশাজনকভাবে পরস্পরের বিরোধিতা করে থাকেন। যদি দর্শনের বিষয়বস্তু বস্তুবিজ্ঞানের মতো মানববুদ্ধির নাগালের মধ্যে থাকতো, তাহলে অবশ্যই কোনো ঐকমত্যে পৌঁছানো যেতো।

ব্রড চার্চ আন্দোলন—খ্রিস্টধর্মকে উদার করার, ঐ ধর্মের পুরোনো শরাব নতুন বোতলে ঢালার, ধর্মটিকে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতামুক্ত ও বদ্ধবিশ্বাসমুক্ত করার, ধর্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের মধ্যে আপোস মীমাংসার সন্ধান করার নানা চেষ্টা—লেস্‌লি স্টিফেনের আনুকূল্য পায়নি; বরং তিনি এই সবকে বিশেষ অবজ্ঞার সাথে সমালোচনা করেছিলেন। প্রার্থনার কার্যকারিতা নিয়ে একটা বিতর্ক ছিল। উদারণস্বরূপ, বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা কি যুক্তিযুক্ত? এখানে বিজ্ঞান

ও ধর্মতত্ত্ব বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল এমন একটি বাস্তব বিষয় নিয়ে যেটি পড়ে বিজ্ঞানের আওতায়। কোনো কোনো ধর্মতত্ত্ববিদ এই আপোসমূলক অবস্থান গ্রহণ করেন যে, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করা হবে বোকার মতো কাজ, কিন্তু বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে। স্টিফেন লিখলেন—

> একটি ঘটনা ঠিক আর একটির মতোই নির্ধারিত কারণনিচয়ের ফল। যেখানে কারণের শক্তিসমূহ এত সহজবোধ্য যে ঘটনা সম্পর্কে আগেই বলে দেওয়া যায়, সেখানে ঐশী হস্তক্ষেপে বিশ্বাস করা সহজ নয় ; কিন্তু যেখানে ঘটনার কারণিক শক্তিসমূহের মধ্যে অপরিমেয় রকম জটিল খেলা চলে, যা নৈসর্গিক ঘটনা সংক্রান্ত আমাদের হিসাব-নিকাশে ধরা পড়ে না, সেখানে দেবদূতের হস্তক্ষেপ কোথাও লুকিয়ে আছে এমন ধরে নেওয়া আমাদের কল্পনাশক্তির পক্ষে বেশ সোজা। বৈজ্ঞানিক অর্থে এই পার্থক্য অবশ্যই অসিদ্ধ। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের শক্তি নাবিকদের পঞ্জিকায় বর্ণিত ঘটনাবলীতে এবং যেগুলোর বর্ণনা সেখানে নেই সেগুলোতে একই রকম সহজভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে। কেউ এমনটা ধরে নিতে পারেন না যে, বিজ্ঞান যতো এগোচ্ছে ঈশ্বর ততোই পিছোচ্ছেন, এবং ফ্র্যাংক্‌লিন বেনজামিন [১৭০৬-১৭৯০] বজ্র ও বিদ্যুতের নৈসর্গিক নিয়মাবলী আবিষ্কার করার আগে পর্যন্ত ঈশ্বর বজ্র-বিদ্যুতের মাধ্যমেই কথা বলতেন।

অবার এক সময় নরক সম্পর্কিত একটা বিতর্ক জনগণের মনোযোগ দখল করেছিল এবং অন্যান্য বিষয়ে গোঁড়া কিছু ধর্মতত্ত্ববিদ নিজেরাই মনে করলেন যে অনন্ত নরক ভোগ একটা বীভৎস ধারণা এবং তারপর দেখলেন যে বিষয়টির পক্ষে প্রমাণ একেবারে চূড়ান্ত নয় ; তাঁরা সাহস করে বললেনও সে কথা। তখন লেস্‌লি স্টিফেন এগিয়ে এলেন স্মরণ করিয়ে দিতে যে, যদি তা-ই হয়, তবে ঐতিহাসিক খ্রিস্টধর্মের সবচেয়ে সাংঘাতিক শত্রুরা এ বিষয়ে ঐ ধর্ম সম্পর্কে যা কিছু বলেছে, সে সবই ধর্মটির প্রাপ্য। যখন খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাস সত্য-সত্যই মানুষের বিবেকবুদ্ধিকে শাসন করতো, তখন কেউ নরক সংক্রান্ত বদ্ধবিশ্বাসের সত্যতার বিরুদ্ধে একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারেনি। যদি মূল ধর্মমতের সাথে ঐ বদ্ধবিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ গঠনগত যোগাযোগ না থাকতো, যদি নেহাত গুরুত্বহীন এক আকস্মিক ব্যাপার হতো, তবে যেখানেই খ্রিস্টধর্ম শক্তিশালী ছিল সেখানেই ঐ বিশ্বাস এতো প্রবল ও অনড় হতে পারতো না। এটিকে বর্জন অথবা লঘু করার চেষ্টা অবনতির চিহ্ন। এই উপলব্ধি থেকে স্টিফেন লিখলেন—

> অবশেষে এখন আপনাদের ধর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। মানুষ বুঝে ফেলেছে যে আপনারা ঐ ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানেন না ; এবং স্বর্গ ও নরক কল্পনারাজ্যের জিনিস। তারা আরো বুঝে গেছে যে, গ্রাম্য গির্জার যে পাতি পুরোহিত ধৃষ্টতা দেখিয়ে আমাকে বলে যে তার কুসংস্কারের অংশীদার না হওয়ার জন্য আমাকে অনন্তকাল নরকের আগুনে পুড়তে হবে, সে ব্যাটা আমার মতোই অজ্ঞ এবং আমার নিজের জানাশোনা আমার কুকুরটার মতোই। এবং তারপর আপনারা শান্তভাবে আবার বলছেন, "এটা সবই একটা ভুল। শুধু একটা কিছুতে বিশ্বাস করো—আমরা তোমার জন্য সব কিছু যতদূর সম্ভব সহজ করে দেবো। নরকের আগুনে একটা সুন্দর সুষম তাপ থাকবে, যা দেহতন্ত্রের জন্য সত্যিই ভালো ; জুদাস্ ইস্কারিয়াত ও আর দু'একজন ছাড়া সেখানে কেউ থাকবে না ; এবং এমনকি বেচারা শয়তানও একটা সুযোগ পাবে যদি সে তার আচার-ব্যবহার সংশোধন করে।"

মি. ম্যাথ্যু আর্নল্ড [১৮২২–১৮৮৮] আমার ধারণায় অজ্ঞেয়বাদীদের মধ্যে গণ্য হতে পারেন, কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত আলাদা ধরনের। তিনি চালু করলেন বাইবেলের এক নতুন রকম সমালোচনা—সাহিত্যিক সমালোচনা। নৈতিকতা ও ধর্মের ব্যাপারে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন, এবং প্রতিষ্ঠিত গির্জার একজন সমর্থক, আর্নল্ড বাইবেলকে তাঁর বিশেষ নিরাপত্তায় নিলেন এবং যাঁরা খ্রিস্টধর্মকে কলুষিত করেছেন বলে তিনি মনে করতেন সেই গোঁড়া ধার্মিক ব্যাখ্যাকারদের হাত থেকে গ্রন্থখানিকে উদ্ধার করার প্রচেষ্টায় তিনখানি বই লিখলেন—*সেন্ট পল অ্যান্ড প্রটেস্ট্যান্টিজ্‌ম* [সন্ত পল ও প্রটেস্ট্যান্ট মতবাদ] (১৮৭০), *লিট্‌রেচার অ্যান্ড ডগ্‌ম্যা* [সাহিত্য ও বদ্ধবিশ্বাস] (১৮৭৩), এবং *গড অ্যান্ড দ্য বাইবেল* [ঈশ্বর ও বাইবেল] (১৮৭৫)। তিনি বলেন, বাইবেলের বাজে সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য গোঁড়া ধর্মতত্ত্ববিদদের প্রতি 'অবিশ্বাসী' শব্দটি ছুঁড়ে দেওয়া এবং "প্রতি রোববারে আমাদের প্রচারবেদিগুলো থেকে অবিশ্বাসের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হওয়ার" কথা বলা "সম্ভবত খ্রিস্টানোচিত হবে না," কিন্তু ন্যায্য হবে। খ্রিস্টধর্ম কলুষিত হওয়ার কারণ হচ্ছে : ১. ধর্মতত্ত্ব, "যাতে আছে ঈশ্বর সম্পর্কে ইতিবাচক উক্তি করার কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রশ্রয়, [এবং আছে আত্মার] অনশ্বরতা সম্পর্কে কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রশ্রয় ;" ২. "একজন অতিবর্ধিত ও অপ্রাকৃত মানুষ মানজবজাতি ও পৃথিবীর সকল ব্যাপারের শীর্ষে আছেন" এই অনুমান ; এবং ৩. "বাইবেলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উক্তিগুলো একত্র জড়ো করে এবং সেগুলোকে আক্ষরিক অর্থে নিয়ে তৈরি করা" ঈশ্বর সংক্রান্ত একটি কাল্পনিক বিবরণ। ঈশ্বরের আচরণ ও পরিকল্পনা সম্পর্কে যে জ্ঞান রাখেন বলে গোঁড়ারা ভাবেন, তাঁদের সেই জ্ঞানকে আর্নল্ড মার্জিত শ্লেষ সহকারে ভর্ৎসনা করেছেন। "ত্রিত্বময় ঈশ্বরের দরবারে কি কি পাশ হলো তা তাঁরা জানেন বলে মনে করা তাঁদের জন্য কঠিন নয়। তাঁরা সহজেই চিন্তা করতে পারেন যে, ত্রীশ্বরের দরবার কক্ষের দেয়ালে কি কি ঝোলানো ছিল এমন কি তাও তাঁরা জানেন।" তথাপি,

> *ত্রিত্বময় ঈশ্বর* এই কথাটি বাইবেলীয় ধর্মের গোটা ধারণার ও চরিত্রের সাথে বেমানান। কিন্তু একথা শুনে পাছে আবার সোশিনীয়রা বেশি উল্লসিত হয়ে ওঠেন, তাই আমরা সাথে সাথে যোগ করতে চাই যে, বিরাট এক 'ব্যক্তিত্ববান প্রথম কারণ' শব্দাবলীও ঐ একই রকম ও একই মাত্রায় বেসুরো বাজে।

মহাবিশ্বের শৃঙ্খলা, যাকে বুদ্ধি খুঁজে পেতে চায় নিয়মরূপে, এবং হৃদয় খুঁজে ফেরে উপকাররূপে, সেই বস্তুর সব চেয়ে কম অসম্পূর্ণ নাম হিসেবে তিনি ঈশ্বর [God] শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এবং ঐ শৃংখলাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে : এটি "প্রবণতার প্রবাহ যার মাধ্যমে সকল বস্তু তাদের অস্তিত্বের নিয়মকে সফল করার প্রয়াস পায়।" জিনিসটির আরো সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেন যে এটি একটি শক্তি যা ন্যায়ের লক্ষ্যে এগিয়ে যায়। এভাবে তিনি অজ্ঞেয়বাদী অবস্থান অতিক্রম করে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন। বাইবেলীয় দলিলসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা করে অসঙ্গতি ও অদ্ভুত উক্তি আবিষ্কার করা তিনি সহ্য করতে পারতেন না, এবং তিনি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব আলোচনারও দাম দিতেন না। কিন্তু যখন আমরা পড়ি কোনো গির্জায় অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক এক সম্মেলনে জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি বিধান দেন যে, [বাইবেলস্থ] জোনাহ্ ও দানিএলের পুস্তকের বর্ণনাসমূহ সত্য বলে মেনে নিতে হবে এজন্য যে, যিশু সেগুলো উদ্ধৃত করেছেন, তখন আমাদের মনে হতে পারে যে, আর্নল্ড যদি এখন এখানে থাকতেন এবং "বুদ্ধিবৃত্তিক গুরুত্ববোধের অভাবের" জন্য গোঁড়াদেরকে ভর্ৎসনা করতেন !

এই বছরগুলোতেই আঠারো শতকের ফরাসি মুক্তচিন্তকদের নিয়ে লেখা মি. জন মর্লের [লর্ড মর্লে ১৮৩৮–১৯২৩] *ভলতেয়ার* (১৮৭২), *রুসো* (১৮৭৩), এবং *দিদ্‌রো* (১৮৭৮) শীর্ষক বইগুলো প্রকাশিত হয়। তিনি *ফোর্টনাইট্‌লি রিভিউ* সম্পাদনা করতেন, এবং কতিপয় বছর ধরে এই পত্রিকা শক্তিমান লেখকদের রচিত এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা জনগণ–অনুসৃত খ্রিস্টধর্মের সুদক্ষ সমালোচনা প্রকাশ করে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। *কম্প্রোমাইজ* [আপোস মীমাংসা] নামে যে বই তিনি পরে প্রকাশ করেছিলেন তার একাংশ ১৮৭৪ সালে *ফোর্টনাইট্‌লিতে* বেরিয়েছিল। "যেসব উদ্দেশ্যমুখী প্রস্তাব নিয়ে সমকালে জনগণের ধর্মবিশ্বাস গড়ে উঠেছে সেই গোটা তন্ত্রটাকেই" *কম্প্রোমাইজ*–এ ক্ষতিকর বলে নিন্দা করা হয়েছে এবং যাঁরা ধর্মে অবিশ্বাসী তাদেরকে স্পষ্ট করে কথা বলার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। খোলাখুলি কথা বলা একটি বুদ্ধিবৃত্তিকে কর্তব্য কর্ম। ইংরেজদের একটা জোরালো রাজনৈতিক দায়িত্ববোধ আছে, এবং রয়েছে ঠিক ততোখানিকই দুর্বল বুদ্ধিবৃত্তিক দায়িত্ববোধ। গতানুগতিক নয় এমন মনের মানুষেরাও রাজনৈতিক উত্তেজনায় খারাপভাবে প্রভাবিত হন এবং রাজনৈতিক উত্তেজনা "হচ্ছে সেই দুর্দান্ত শক্তি যা সত্যপ্রিয়তা ও নির্ভুল যুক্তিবিচারকে দ্বিতীয় স্থানে ফেলে দেয়।" আর রাজনীতিতে যেসব নীতির প্রাধান্য আছে, ধর্মতত্ত্ব আবার সেগুলিই গ্রহণ করেছে তার নিজস্ব প্রয়োজনে। প্রথম ক্ষেত্রে সুবিধা আগে, সত্য পরে ; অপর ক্ষেত্রটিতে প্রথমে আবেগগত স্বস্তি, দ্বিতীয় স্থানে সত্য। ধর্মের ক্ষেত্রে আত্মার অমরত্ব যদি কম স্থূল মনে হয়, তাহলে বুঝতে হবে সেখানে "বুদ্ধিবৃত্তিক অসাধুতার কলঙ্ক আছে।" আর এটি হচ্ছে সমাজের বিরুদ্ধে একটা অপরাধ, কারণ "যারা সত্যপরায়ণতাকে বিকৃত করে এবং যে উদ্দেশ্যেই তা করুক না কেন, তারা মানব জাতির প্রগতির জীবনী শক্তিকেই বিকৃত করছে।" যে বুদ্ধিবৃত্তিক কপটাচারের নিন্দা এখানে করা হলো, তা আজও সমানে চলছে। ইংরেজরা তাদের স্বভাব পরিবর্তন করেনি ; এখনো 'রাজনৈতিক' উদ্দীপনা অব্যাহতভাবে বেড়েই চলেছে এবং আমরা শাসিত হচ্ছি এই মত দ্বারা যে, রাজনীতিতে আপোস দরকারি বলে তা বুদ্ধিবৃত্তির এলাকাতেও একটা ভালো জিনিস।

মি. মর্লের পরিচালনাধীন *ফোর্টনাইট্‌লি* জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের একটি কার্যকর যন্ত্রস্বরূপ ছিল। এই দ্বন্দ্বময় বছরগুলোতে প্রকাশিত অন্যান্য পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীদের রচনা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করার মতো স্থান আমার হাতে নেই। তবে এটুকু বলতেই হবে যে, গির্জার প্রচারবেদিগুলো থেকে যেমন আধুনিক চিন্তার নিন্দাবাদ বর্ষিত হচ্ছিল, তেমনি জনগণের মধ্যে মুক্তচিন্তা প্রসারের কাজও চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পরের কাজটি বিশেষভাবে করছিলেন মি. চার্লস ব্রাড্‌লাফ [১৮৩৩–১৮৯১] তাঁর প্রকাশ্য জনসভায় দেওয়া বক্তৃতাগুলোতে এবং তাঁর *দ্য ন্যাশনাল রিফর্মার* [জাতীয় সংস্কারক] পত্রিকার পৃষ্ঠায় এবং এতে বেসামরিক প্রশাসনের সাথে তাঁর সংঘর্ষও হয়েছিল।

গত দুই শতাব্দী যাবৎ ইংল্যান্ডে অধিষ্ঠিত ধর্মের সমর্থক নয় এমন মতামতের প্রকাশ বন্ধ করার জন্য বেসামরিক প্রশাসন হস্তক্ষেপ করেছে এ ধরনের ঘটনাগুলো যদি আমরা বিবেচনায় নিই, তাহলে দেখতে পাই যে সব সময়ই এ কাজের উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ জনগণের মধ্যে মুক্তচিন্তার প্রসার রোধ করা। এসব ক্ষেত্রে নেওয়া ব্যবস্থার শিকার হয়েছিল হয় গরিব, অশিক্ষিত মানুষজন, নয় তো সে সব লোক যাঁরা জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে মুক্তচিন্তা প্রচার করছিলেন। ইতঃপূর্বে টম পেইন [১৭৩৭–১৮০৯] সম্পর্কে বলতে গিয়ে

আমি এ বিষয়টির উল্লেখ করেছিলাম এবং এখন উনিশ ও বিশ শতকের মোকদ্দমাগুলো থেকে তার সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। এর পেছনের কারণটি সব সময়ই [শাসককুলের] জনগণভীতি, যদিও তা কখনো কবুল করা হয়নি। ধর্মতত্ত্ব গরিব জনগণকে শৃংখলায় রাখার জন্য একটি উত্তম হাতিয়ার হিসেবে এবং ধর্মে অবিশ্বাস বিপজ্জনক রাজনৈতিক মতামতের কারণ অথবা সঙ্গী হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। এমন ধারণা এখনো সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়নি যে, গরিবদের মধ্যে মুক্তচিন্তা বিশেষভাবে অশোভন, পরিতৃপ্ত রাখার নিমিত্ত তাদেরকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন রাখা অতীব বাঞ্ছনীয় এবং গরিবদের জন্য তাদের উচ্চতর কর্তারা যেসব ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা করে রেখেছেন তার জন্য তাদের উচিত যথাযথভাবে কৃতজ্ঞ থাকা। আমি মি. ফ্রেডরিক হ্যারিসনের একটি প্রবন্ধ থেকে ছোট্ট একটি কাহিনী উদ্ধৃত করতে পারি, যেটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি গরিবদের শোভন দৃষ্টিভঙ্গি প্রশংসনীয়ভাবে প্রকাশ করেছে।

> একবার ইসেক্সের এক দরিদ্রাশ্রমের অধ্যক্ষকে এক নিঃস্ব মৃত্যুপথযাত্রীর ধর্মোপদেষ্টার কাজ করার জন্য ডাকা হয়েছিল। হতভাগ্য লোকটি অস্ফুটস্বরে স্বর্গ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আশা ব্যক্ত করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু অধ্যক্ষ সাহেব অকস্মাৎ তাকে থামিয়ে দিয়ে সাবধান করলেন এই বলে যে, সে যেন তার শেষ ভাবনাগুলোকে নরকমুখী করে। তারপর তিনি বললেন, "আর তোর উচিত কৃতজ্ঞ হওয়া এ কারণে যে তোর মতো লোকের যাওয়ার জন্য একটা নরক আছে।"

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজ মুক্তচিন্তক যাঁরা জনগণের কাছে আবেদন রেখেছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন ব্রাড্‌লাফ, এবং 'ধর্মনিরপেক্ষতা'-র দূত বলে পরিচিত হোলিওক।[৩] যে মহা অর্জনের জন্য ব্রাড্‌লাফ সবচেয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তা হচ্ছে—ধর্মবিশ্বাসী নন এমন সদস্যদের শপথগ্রহণ ছাড়াই পার্লামেন্টে বসার অধিকার আদায় (১৮৮৮)। যে মুখ্য কাজটি হোলিওক (যিনি প্রথম জীবনে ধর্মনিন্দা [blasphemy]-র জন্য জেল খেটেছিলেন) অবদান রেখেছিলেন তা ছিল সংবাদপত্রের উপর আরোপিত বিভিন্ন কর বিলোপ ; কারণ ঐ করারোপের ফলে জনগণের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছিল।[৪] ইংল্যান্ডে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ অনেক আগেই উঠে গিয়েছিল (উপরে, পৃ. ৭৮)। অন্য ইউরোপীয় দেশগুলোর ক্ষেত্রে ঐ নিয়ন্ত্রণ বাতিল হয়েছে উনিশ শতকের মধ্যে।[৫]

ইউরোপের প্রগতিশীল দেশগুলোতে গত ত্রিশ বছরে [মোটামুটি ১৮৮০–১৯১০] সহনশীলতা লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে (আমি আইনি সহিষ্ণুতার কথা বলছিনে, বলছি জনমতের সহনশীল স্বভাবের কথা)। এক প্রজন্ম আগে লর্ড মর্লে লিখেছিলেন :

> প্রাথমিক পর্যায়ে এখনো পৌছানো যায়নি–যে পর্যায়ে জনমত প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার চারদিকের লোকজনের চাপ থেকে মুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে নিজের বিশ্বাসগুলোকে আকারদান করার অবাধ অধিকার দেয়।

আমি মনে করি এই প্রাথমিক স্তর এখন অতিক্রান্ত। ইংল্যান্ডের কথাই ধরুন। আমরা এখন সে সব দিন থেকে দূরে এসে গেছি যখন অধার্মিক মতামতের জন্য ড. টমাস আর্নল্ড [১৭৯৫–১৮৪২] জ্যেষ্ঠ মিল [জেম্‌স মিল ১৭৭৩–১৮৩৬]-কে বট্‌নি বে-তে পাঠাতেন। তবে আমরা ঐ সব দিন থেকেও দূরে যখন ডারউইনের *ডিসেন্ট অফ ম্যান* একটা শোরগোল তুলেছিল। ডারউইনের কবর হয়েছে ওয়েস্টমিন্‌স্টার অ্যাবে-তে। আজ যিশুর ঐতিহাসিক

অস্তিত্ব অস্বীকার করে বই বেরোতে পারে, কোনো হৈচৈ সৃষ্টি না করেই। লর্ড অ্যাকটন [১৮৩৪–১৯০২] ১৮৭৭ সালে যা লিখেছিলেন তা এখন [১৯১৩–১৯১৪] সত্য হবে কি না সে সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা যেতে পারে : "আমাদের কালে অনেক শিক্ষিত লোক আছেন যাঁরা নির্যাতন করাকে সঠিক কাজ বলে মনে করেন।" ১৮৯৫ সালে লেকি ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্বের একজন প্রার্থী ছিলেন। তাঁর যুক্তিবাদী মতামতের কথা তাঁর বিরুদ্ধে তোলা হয়েছিল, কিন্তু তিনি জয়লাভ করেছিলেন, যদিও নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকাংশই ছিলেন নিষ্ঠাবান ধার্মিক। আঠারো শো সত্তরের দশকে প্রার্থী হলে তাঁকে হতাশ হতে হতো। একজন মুক্তচিন্তক নিশ্চয় অনৈতিক ব্যক্তি হবেন—এই পুরোনো মামুলি কথা এখন আর কেউ শুনতে চায় না। আমরা বলতে পারি যে, আমরা এখন এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি যেখানে গণ্য করার মতো প্রতিটি মানুষ (ভ্যাটিক্যানবাসীরা ব্যতীত) স্বীকার করে যে, পৃথিবীতে বা স্বর্গে এমন কিছুই নেই যা পুরোনো দিনের [ধর্মীয় বা রাজনৈতিক] কর্তৃপক্ষের চাপিয়ে দেওয়া কোনো আনুমানিক ধারণা ব্যতীতই বৈধভাবে আলোচনা করা না যায়।

উনিশ শতকে যুক্তির বিজয়ের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা বিবেচনায় নিয়েছি বিজ্ঞান ও সমালোচনার ফলে আবিষ্কৃত তথ্যাবলী যা পুরোনো ধর্মাধিষ্ঠানকে যৌক্তিক দিক থেকে অরক্ষণীয় করে ফেলেছিল। কিন্তু চিন্তার স্বাধীনতায় অগ্রগতি, এবং আজকের দিনে ধর্মীয় কর্তৃত্বের প্রতি [ইউরোপের] সকল দেশে মানুষের যে সাধারণ মনোভাব, একশো বছর আগের মনোভাবের সাথে তার স্পষ্ট পার্থক্য—এসব ব্যাপার কেবলমাত্র যুক্তিতর্কের শক্তি দিয়ে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায় না। পুরোনো ধ্যান–ধারণার সমালোচনা ততোটা নয়, যতোটা নতুন ধ্যান–ধারণা ও স্বার্থের আবির্ভাব সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টিয়ে দেয়। যুক্তিতর্ক দ্বারা দেখিয়ে দেয়া নয়, বরং নতুন সামাজিক ধারণাসমূহ চূড়ান্ত সমস্যাবলীর প্রতি মনোভাবের সাধারণ রূপান্তর ঘটায়। এখন মানবজাতির প্রগতির ধারণাই, আমার মনে হয়, মনোভাবের এই পরিবর্তনের জন্য প্রধানত দায়ী বলে ধরতে হবে। আমি মনে করি, এটিই ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্বাসসমূহ নষ্ট করে ফেলার শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ করেছে বলে অবশ্যই ধরতে হবে। দিদ্‌রো ও তাঁর সহযোগীরা শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, মানুষের কর্মশক্তি পৃথিবীকে মনোরম করার কাজে নিয়োজিত হওয়া উচিত—একথা আমি আগে বলেছি [পৃ. ৭৭–৭৮]। ধর্মতত্ত্বীয় প্রস্তাবসমূহের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আদর্শের বদলে এক নতুন আদর্শ গৃহীত হয়েছিল। এই আদর্শ উৎসাহিত করেছিল ইংরেজ উপযোগবাদী (Utilitarian) দার্শনিকদেরকে (জেরিমি বেনথাম [১৭৪৮–১৮৩২], জেম্‌স মিল, জে. এস. মিল, জর্জ গ্রোট [১৭৯৪–১৮৭১]) যাঁরা প্রচার করতেন যে, সর্বোচ্চসংখ্যক মানুষের সর্বোচ্চ সুখই হচ্ছে কর্মোদ্যোগের মহত্তম লক্ষ্য এবং নৈতিকতার ভিত্তি। এই আদর্শ জোরালো পুষ্টি পেয়েছিল ঐতিহাসিক প্রগতির মতবাদ থেকে, যার শুরু হয়েছিল ফ্রান্সে (১৭৫০) জ্যাক তুর্গো (Turgot) [১৭২৭–১৭৮১] কর্তৃক, যিনি প্রগতিকে ইতিহাসের গাঠনিক সূত্র বলে স্থির করেছিলেন। ঐতিহাসিক প্রগতির এই ধারণাকে আরো পুষ্ট করেন মার্কুইস দ্য কোঁদোর্সে (Condorcat) [১৭৪৩–১৭৯৪] (১৭৯৩), আর ইংল্যান্ডে এটি উপস্থাপন করেন জোসেফ প্রিস্টলি [১৭৩৩–১৮০৪]। ধারণাটি দ্রুত লুফে নিলেন ফরাসি সমাজতান্ত্রিক দার্শনিক ক্লোদ সঁ–সিমোঁ (Saint-simon) [১৭৬০–১৮২৫] ও চার্ল্‌স ফুরিয়ে [১৭৭২–১৮৩৭]। ফুরিয়ের আশাবাদ এতটাই এগিয়ে গিয়েছিল যে, তিনি এমন এক ভবিষ্যৎ সময়ের অনুমান করেছিলেন

যখন মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতাবলে সমুদ্র পরিণত হবে লেমনেড্ বা লেবু-শরবতে, যখন তোমারের মতো মহান তিন কোটি সত্তর লাখ কবি থাকবেন, মোলিয়ের [১৬২২-১৬৭৩]-এর মতো বড়ো লেখক থাকবেন তিন কোটি সত্তর লাখ, নিউটনের সমান বিজ্ঞানী হবেন তিন কোটি সত্তর লাখ। সে যাই হোক, তবে প্রগতির মতবাদকে গুরুত্ববান ও শক্তিমান করেছিলেন কোঁত। তাঁর সামাজিক দর্শন এবং তাঁর মানবধর্মের ভিত্তি ছিল এই মতবাদ। একের পর এক বিজ্ঞানের বিজয় এর অনুকূলে যায়। বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাথে এর সংশ্লিষ্টতা আছে, যদিও এটি অপরিহার্যরূপে ঐ তত্ত্বে নিহিত নয়। এবং এ কথা সম্ভবত ন্যায্যতই বলা যায় যে *প্রগতিবাদই* ছিল উনিশ শতকের আত্মিক চালিকা শক্তি। আমরা খুব একটা ভুল করবো না যদি বলি ভবিষ্যৎ নিয়ে এবং মানবজাতির প্রগতি নিয়ে অভিনব আগ্রহ অচেতনভাবে ক্ষতি করে গেছে, কবরের পরবর্তী জীবন নিয়ে যে পুরোনো আগ্রহ ছিল তার। এবং প্রগতির এই তত্ত্ব মানবের মৌলিক পাপ সম্বন্ধীয় ক্ষয়কর মতবাদের অবসান ঘটিয়েছে।

জার্মানিতে বিপুল আগ্রহ সৃষ্টি করেছে (১৯১০-১৯১২) যে মনিস্টিক [অদ্বৈতবাদী] আন্দোলন, সেখানে প্রগতির তত্ত্ব এত জোরালোভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে যেমনটি আর কোথাও হয়নি। এই আন্দোলন হাএকেলের চিন্তাভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁকেই এর গুরু হিসেবে গণ্য করা হয় ; কিন্তু তাঁর সে সব ধ্যান-ধারণার অনেক পরিবর্তন হয়েছে নতুন নেতা ভিল্‌হেল্‌ম অস্‌টোআল্ড [১৮৫৩-১৯৩২]-এর প্রভাবে। হাএকেল একজন জীববিজ্ঞানী, কিন্তু অস্‌টোআল্ড তাঁর চমৎকার কাজটি করেছিলেন রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানে। নব্য মনিজ্‌ম পুরোনো মনিজ্‌ম থেকে আলাদা এ জন্য যে, প্রথমত, এটি অনেক কম বদ্ধবিশ্বাসমূলক। এই মত ঘোষণা করে যে, যা-কিছু আমাদের অভিজ্ঞতায় আছে তা একটি উপর্যুক্ত বিজ্ঞানের বিষয় হতে পারে। এটি যতোটা না একটি তন্ত্র তার চেয়ে বেশি একটি পদ্ধতি, কারণ এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সকল মানবিক অভিজ্ঞতাকে সমন্বিত জ্ঞানের মধ্যে উপলব্ধি করা। দ্বিতীয়ত, যদিও এটি হাএকেলের মতো বিবর্তনকে সজীব বস্তুসমূহের ইতিহাসের নিয়ন্ত্রক নীতি হিসেবে মেনে নিয়েছে, কিন্তু এটি তাঁর সর্বেশ্বরবাদকে এবং তাঁর 'চিন্তাশীল অণু' (thintiaug atoms) তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে। বস্তুজগতের পুরোনো যান্ত্রিক তত্ত্ব ক্রমান্বয়ে উঠে গিয়ে তার জায়গায় এসেছে শক্তিতত্ত্ব। এবং অস্‌টোআল্ড যিনি ছিলেন শক্তিতত্ত্বের প্রধান প্রবক্তাদের একজন, তিনি একে মনিজ্‌মের একটি মুখ্য ধারণায় পরিণত করেছেন। এখন আমরা যতো দূর জানি, পদার্থ নামে যাকে অভিহিত করা হয়েছে তা বিভিন্ন শক্তির একটি যৌগিক অবস্থা ছাড়া কিছুই নয়। এবং অস্‌টোআল্ড 'শক্তি' তত্ত্বকে ভৌত ও রাসায়নিক অবস্থান থেকে জৈব, মানসিক ও সামাজিক প্রপঞ্চে প্রসারিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু লক্ষণীয় শক্তির ধারণাটিকে চূড়ান্ত বলে দাবি করা হয়নি ; এটি একটি হাইপোথিসিস বা উপকল্প যা আমাদের জ্ঞানের বর্তমান স্তরের সাথে খাপ খায়, এবং জ্ঞানের অগ্রগতির ফলে [অন্য তত্ত্বের আগমনে] বাতিলও হয়ে যেতে পারে।

কোঁতের দৃষ্টবাদী দর্শন ও ধর্মের সাথে মনিজ্‌মের সাদৃশ্য আছে এই অর্থে যে দৃষ্টবাদের মতোই মনিজ্‌ম বলতে বোঝায় জীবনের প্রতি এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা পুরোপুরি বিজ্ঞানকেই অবলম্বন করে এবং ধর্মতত্ত্ব, অতীন্দ্রিয়বাদ, ও অধিবিদ্যাকে পরিহার করে। এটিকে একটি ধর্ম বলা যায় যদি আমরা মি. ম্যাকটেগার্টের দেওয়া ধর্মের সংজ্ঞা গ্রহণ করি, যথা—"আমাদের ও মহাবিশ্বের মধ্যে একটা ছন্দ বিদ্যমান এই প্রত্যয়কে অবলম্বন করে গড়ে ওঠা একটি

আবেগের" নাম ধর্ম। তবে মনিজ্‌ম সম্পর্কে 'ধর্ম' শব্দটি ব্যবহার না করা অনেক ভালো। আর কোঁত্ যেমন একটা পজিটিভিস্ট [বা দৃষ্টবাদী] গির্জা স্থাপন করেছিলেন, তেমন কোনো মনিস্টিক গির্জা স্থাপনের চিন্তা মনিস্টদের নেই। তাঁরা বিশেষ জোর দেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেকার তীব্র বিরোধের উপর ; এবং ধর্ম যে ক্রমাগত কম অপরিহার্য হয়ে পড়ছে এই বাস্তবতার মধ্যে তাঁরা মানুষের আত্মিক প্রগতির চিহ্ন দেখতে পান। অতীত কালে যতোই আমরা পেছনের দিকে যাই, সভ্যতার উপাদান হিসেবে ধর্ম ততোই মূল্যবান হয় ; আর যতো আমরা বর্তমানের দিকে এগিয়ে আসি, ধর্ম ততোই আরো বেশি পশ্চাদ্‌ভূমিতে পিছিয়ে যায় এবং বিজ্ঞানকে জায়গা ছেড়ে দিতে থাকে। বর্তমান জগতের দৃষ্টিতে দেখলে, নীতির দিক দিয়ে ধর্মগুলো সব সময় নৈরাশ্যবাদী ছিল। কিন্তু মনিজ্‌ম্ নীতিগতভাবে আশাবাদী, কারণ এই মতবাদ উপলব্ধি করে যে মানুষের বিবর্তন উত্তরোত্তর বেশি মাত্রায় তার ভেতরকার মন্দ উপাদানকে পরাভূত করেছে, এবং ভবিষ্যতে আরো পরাভূত করতে থাকবে। মনিজ্‌ম ঘোষণা করে যে, উন্নয়ন ও প্রগতি মানবীয় আচরণের ব্যবহারিক নীতি। অথচ খ্রিস্টীয় ধর্মমতগুলো, বিশেষত ক্যাথলিক গির্জা, নিয়ত রক্ষণশীল থেকে গেছে এবং যদিও তারা প্রগতি থামাতে পারেনি, তারা এর লক্ষণগুলোকে চেপে রাখার প্রবল চেষ্টা করেছে—অর্থাৎ ধোঁয়াকে বোতলবন্দী করতে চেয়েছে।[৬] ১৯১১ সালে হামবুর্গে অনুষ্ঠিত মনিস্টিক কংগ্রেস এতটাই সফল হয়েছিল যে, এর উদ্যোক্তারাও বিস্মিত হয়েছিলেন। এই আন্দোলন যুক্তিবাদী চিন্তা ছড়িয়ে দেয়ার কাজে শক্তিশালী প্রভাব রাখবে এমন আভাস পাওয়া যায়।[৭]

যদি আমরা পশ্চিম ইউরোপের তিনটি বড় দেশের কথা বিবেচনা করি, যেখানে খিস্টধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ক্যাথলিক, তাহলে আমরা দেখতে পাই কিভাবে প্রগতির আদর্শ, চিন্তার স্বাধীনতা, এবং যাজকীয় শক্তির অবনতি একসাথে চলে। যেখানে গির্জা বিপুল শক্তি ও সম্পদের অধিকারী এবং এখনো আদালত ও রাজনীতিকদের উপর হুকুম চালাতে পারে, সেই স্পেনে প্রগতির ধারণার প্রভাব এখনো তীব্রভাবে অনুভূত হয়নি, অথচ ফ্রান্স ও ইতালিতে ঐ ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্পেনের ক্ষুদ্র শিক্ষিত শ্রেণীটির মধ্যে উদার চিন্তাধারার ব্যাপক প্রসার আছে বটে, কিন্তু সমগ্র জনসংখ্যার বিরাট সংখ্যাগুরু নিরক্ষর, এবং তাদেরকে এভাবে রাখা গির্জার স্বার্থানুকূল। সকল আলোকপ্রাপ্ত স্পেনীয় স্বীকার করেন যে, দেশটির জরুরি প্রয়োজন হচ্ছে আম জনতার শিক্ষার ব্যবস্থা করা। আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ লাভের আগে কি প্রচণ্ড সব বাধা অতিক্রম করতে হবে তা দেখা গিয়েছিল চার বছর আগে ফ্রান্সিস্‌কো ফেরের-এর মর্মান্তিক ঘটনার মধ্য দিয়ে, যা প্রত্যেককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে পশ্চিম ইউরোপের এক কোণে মধ্যযুগীয় চেতনা এখনো অত্যন্ত প্রবল।

ফেরের কাতালোনিয়া প্রদেশে আধুনিক স্কুল স্থাপনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন (১৯০১ থেকে)। তিনি ছিলেন একজন যুক্তিবাদী, তাঁর স্কুলগুলো ছিল সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ এবং সেগুলোর সাফল্য ছিল লক্ষণীয়। যাজকীয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে ঘৃণা করতে লাগলো এবং ১৯০৯ সালের গ্রীষ্মকালে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা তাদেরকে মিলিয়ে দিল তাঁকে ধ্বংস করার উপায়। বার্সিলোনা শহরে শ্রমিকদের এক ধর্মঘট হিংসাত্মক বিপ্লবের রূপ নেয়। আন্দোলনের শুরুতে ফেরের কাকতালীয়ভাবে কয়েকদিনের জন্য বার্সিলোনাতে ছিলেন। যদিও ঐ গোলযোগের সাথে তাঁর কিছুমাত্র যোগাযোগ ছিল না, কিন্তু তাঁর শত্রুরা সুযোগটা

লুফে নিলো ঘটনার জন্য তাঁকেই দায়ী করতে। মিথ্যা প্রমাণ (যার মধ্যে জাল করা কাগজপত্রও ছিল) তৈরি করা হলো। যেসব প্রমাণ তাঁর সহায়ক হতে পারতো সেগুলোকে চেপে দেয়া হলো। ক্যাথলিক সংবাদপত্রগুলো তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে লাগলো এবং বার্সিলোনার মুখ্য যাজকেরা সরকারকে এই বলে প্ররোচিত করলো যে, সকল গণ্ডগোলের মূলে যে আধুনিক স্কুল, সেগুলোর প্রতিষ্ঠাতা ঐ লোকটাকে যেন ছেড়ে দেওয়া না হয়। এক সামরিক বিচারসভা (tribunal) ফেরেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করলো এবং তাঁকে গুলি করে মারা হলো (অক্টোবর ১৩)। তিনি শাস্তিভোগ করলেন যুক্তি ও চিন্তার স্বাধীনতার জন্য ; যদিও ইন্‌কুইজিশন বা যাজকীয় বিচার আর চালু ছিল না বলে তাঁর শত্রুদের অরাজকতা ও রাষ্ট্রদ্রোহের মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে হত্যা করতে হয়েছিল। এই ঘটনায় ইউরোপব্যাপী যে ঘৃণা ও ক্রোধ অনুভূত হয়েছিল এবং যা ফ্রান্সে সবচেয়ে উচ্চরবে ব্যক্ত হয়েছিল, তা এ রকম চরম ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি হয়তো রোধ করতে পারবে, কিন্তু যে দেশে গির্জা এত শক্তিশালী ও এত ধর্মান্ধ এবং রাজনীতিকরা এত দুর্নীতিগ্রস্ত সেখানে যেকোনো কিছুই ঘটতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

১. গ্রীক *মোনোস* (monos), একাকী, থেকে।

২. আলোচনায় উল্লিখিত লেখাগুলো ছাড়া আরো নাম করা যেতে পারে : *উইনউড রীড, মার্টারডম অফ ম্যান* [মানুষের শাহাদত], ১৮৭১ ; মিল, *থ্রী এসেজ্ অন রিলিজ্যন* [ধর্ম নিয়ে তিন প্রবন্ধ] ; ডব্লিউ. আর. ক্যাসেল্‌স, *সুপারন্যাচরাল রিলিজান* [অতিপ্রাকৃত ধর্ম] ; জন টিনডাল [১৮২০–১৮৯৩], *অ্যাড্রেস টু ব্রিটিশ অ্যাসোসিএশন অফ বেলফাস্ট* [বেলফাস্টের ব্রিটিশ সমিতিতে দেওয়া ভাষণ], হাক্‌স্‌লি [১৮২৫–১৮৯৫] *অ্যানিম্যাল অটোমেটিজ্‌ম* [প্রাণীর স্বয়ংক্রিয়তাবাদ] ; ডব্লিউ. কে. ক্লিফোর্ড [১৮৪৫–১৮৭৯] *বডি অ্যান্ড মাইন্ড* [দেহ ও মন] ; সব ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত।

৩. উল্লেখ্য, হোলিওক তাঁর জীবনের শেষ দিকে *'র‍্যাশনালিস্ট প্রেস অ্যাসোসিএশন'* [যুক্তিবাদী মুদ্রণ সমিতি] স্থাপনে সাহায্য করেছিলেন। বহু বছর যাবৎ মি. এডওয়ার্ড ক্লড ঐ সংস্থার চেয়ারম্যান আছেন। এটিই ইংল্যান্ডে যুক্তিবাদ প্রচারের জন্য প্রধান সংস্থা। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে উল্লেখযোগ্য মুক্তচিন্তকদের লেখার সস্তা সংস্করণ বের করে চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী)। আমি জানি, এই সংস্থার সস্তা পুনর্মুদ্রণের বইগুলোর কুড়ি লক্ষেরও বেশি কপি বিক্রি হয়েছে। [উল্লেখ্য, কথাগুলো বিউরি লিখছেন ১৯১৪ সালে বা তার একটু আগে–অনুবাদক]।

৪. বিজ্ঞাপন কর উঠে যায় ১৮৫৩ সালে, স্ট্যাম্প কর ১৮৫৫ সালে, কাগজের শুল্ক ১৮৬১ সালে, এবং ঐচ্ছিক শুল্ক ১৮৭০ সালে।

৫. অস্ট্রিয়া–হাঙ্গেরিতে পুলিশের ক্ষমতা রয়েছে ছাপানো জিনিসের প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ করে রাখার। রাশিয়াতে ১৯০৫ সালে জার কর্তৃক জারিকৃত এক অনুশাসন বলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল ; কিন্তু আদেশটি অকার্যকর হয়ে পড়েছে। সংবাদপত্র এখন সম্পূর্ণ পুলিশের নিয়ন্ত্রণে। [এসব উক্তি ১৯১৩–১৯১৪ সালের, যখন বিউরি এ বইটি লিখছিলেন। – - অনুবাদক]

৬. গির্জাগুলোর প্রতি মনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে আমি এই বিষয়গুলো নিয়েছি *অসটোআল্ডের মনিস্টিক সানডে সারমনস* [মনিস্টদের রবিবাসরীয় উপদেশ–ভাষণ] (জার্মান), ১৯১১, ১৯১২, থেকে।

৭. এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, যেহেতু এ বই চিন্তাধারার ইতিহাস নয় [অর্থাৎ শুধু চিন্তার স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাস], আমি সাম্প্রতিক কালের (আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের) বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তার উল্লেখ করলাম না। কখনো কখনো দাবি করা হয়েছে যে, এ সব দর্শন ধর্মতত্ত্বকে সমর্থন দিয়ে খাড়া করে তোলার চেষ্টা করছে ; কিন্তু এগুলো সবই গভীরভাবে অধিষ্ঠিত ধর্মের প্রতিকূল।

অষ্টম অধ্যায়

চিন্তার স্বাধীনতার যৌক্তিকতা

একটি আধুনিক রাষ্ট্রের মুক্ত আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠা মানুষদের অধিকাংশই কর্তৃপক্ষের সাথে স্বাধীনতার দীর্ঘ সংগ্রামে স্বাধীনতার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। যে উৎপীড়নমূলক, এবং তাঁদের মতে অস্বাভাবিক রকম বিকৃত নীতি অবলম্বন করে সমাজ ও সরকারগুলো নিরন্তর নতুন ধ্যান-ধারণার শ্বাসরোধ করতে এবং মুক্তচিন্তা দমন করতে সচেষ্ট ছিল, সেই নীতির সপক্ষে কিছু বলা যেতে পারে এমন কথা ভাবাও তাঁরা কঠিন মনে করতে পারেন। এই পুস্তকে যে সংঘর্ষের রূপরেখা দেওয়া হলো তা আলো ও অন্ধকারের মধ্যে একটা যুদ্ধ বলে প্রতীয়মান হয়। আমরা বিস্ময়ের সাথে উচ্চকণ্ঠে বলছি যে, ধর্মের বেদি ও রাজসিংহাসন মানবজাতির প্রগতির বিরুদ্ধে এক অশুভ চক্রান্ত করেছিল। কর্তৃত্বের অন্ধ এবং হয়তো বা যৎপরোনাস্তি বিদ্বেষপূর্ণ বাহকদের হাতে যুক্তির এতো অসংখ্য সমর্থক যেসব নির্যাতন সহ্য করেছিলেন সেদিকে ফিরে তাকালে আমরা বিভীষিকাগ্রস্ত হয়ে পড়ি।

কিন্তু দমননীতির সমর্থনে কমবেশি আপাত-ন্যায্য একটি কেস খাড়া করা যেতে পারে। ব্যক্তি-সদস্যদের উপরে সমাজের যে আইনসম্মত ক্ষমতা আছে সে সম্পর্কে অত্যন্ত সীমিত দৃষ্টি দিয়ে দেখা যাক। ধরা যাক, জন স্টুআর্ট মিল [১৮০৬-১৮৭৩]-কে অনুসরণ করে আমরা নীতি নির্ধারণ করে নিলাম, "যে একটি মাত্র লক্ষ্যে মানবজাতি ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে তার কোনো সদস্যের বা সদস্যদের কর্মের স্বাধীনতায় ন্যায্যত হস্তক্ষেপ করতে পারে, তা হচ্ছে আত্মরক্ষা ;" এবং অন্যদের ক্ষতি হতে না দেওয়ার জন্যই কেবল দমননীতি ন্যায্য। রাষ্ট্র এই নিম্নতম দাবিটুকু করতেই পারে এবং এটা সবাই স্বীকার করবেন যে, নাগরিকদের ক্ষতি প্রতিরোধ করা রাষ্ট্রের অধিকারই শুধু নয়, তার কর্তব্যও বটে। এ জন্যই তো রাষ্ট্র আছে। এখন, কোনো বিমূর্ত বা স্বাধীন নীতি আবিষ্কার করা সম্ভব নয় যার ভিত্তিতে এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায় যে, কেন বাক্-স্বাধীনতা কর্মের স্বাধীনতার একটা বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত রূপ হওয়া উচিত? অথবা সমাজের যখন এই মর্মে প্রত্যয় জন্মেছে যে, তার কোনো সদস্যের ভাষণের ফলে সমাজের ক্ষতি হওয়ার হুমকি এসেছে, তখন কেন সমাজ আত্মরক্ষার অস্ত্র ফেলে দিয়ে হাতজোড় করে থাকবে? বিপদ সম্পর্কে সরকারকে বিচার-বিবেচনা করতে হবে এবং সেই বিচার ভুল হতে পারে ; কিন্তু যদি সরকারের বিশ্বাস জন্মে থাকে যে ক্ষতি করা হচ্ছে, তাহলে হস্তক্ষেপ করা কি তার সুস্পষ্ট কর্তব্য নয়?

এই যুক্তি প্রাচীন ও আধুনিক কালের বিভিন্ন সরকার কর্তৃক স্বাধীন মতামত দমনের সপক্ষে একটা কৈফিয়ত যোগায়। ইনকুইজিশন [ধর্মীয় অপরাধের জন্য বিচারসভা], সংবাদ মাধ্যম নিয়ন্ত্রণ, ধর্মনিন্দাবিরোধী আইন, এ ধরনের সকল দমনমূলক ব্যবস্থার সমর্থনে এ কথা জোর দিয়েই বলা যায় যে, যদিও ঐ ব্যবস্থাসমূহ অতিরিক্ততা দোষে দুষ্ট অথবা

অবিবেচনাপ্রসূত, তা হলেও সেগুলো নেওয়ার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল ব্যবস্থা-প্রণেতারা যাকে ঘোরতর ক্ষতি বলে সরলভাবে বিশ্বাস করতেন তার বিরুদ্ধে সমাজকে প্রতিরক্ষা দেয়া, এবং সাধারণ কর্তব্যকর্ম ছাড়া সেগুলো আর কিছুই ছিল না। (এই কৈফিয়ত অবশ্য ঐ সব কাজ সম্বন্ধে খাটে না, যেগুলো করা হতো উৎপীড়িত ব্যক্তিদের মঙ্গলের জন্য, অর্থাৎ তাদের ভবিষ্যৎ আত্মিক মুক্তি নিশ্চিত করতে।)

আজকাল আমরা এ রকম সব পদক্ষেপকে অগ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করি এবং স্বাধীন মত প্রকাশে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অধিকার অস্বীকার করি। স্বাধীনতার আদর্শ আমাদের অন্তরে এতোই গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের দমনমূলক কার্যকলাপের পক্ষে কোনো ছাড় দেওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন। কিন্তু কিভাবে এই নীতির ন্যায্যতা প্রতিপাদিত হয়? এটি দাঁড়িয়ে নেই কোনো বিমূর্ত ভিত্তির উপর, এবং খোদ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো নীতির উপর, বরং দাঁড়িয়ে আছে সম্পূর্ণরূপে উপযোগ সংক্রান্ত বিবিধ বিবেচনার উপর।

আমরা দেখেছি কিভাবে সক্রেতিস [৪৭০–৩৯৯ খ্রি. পূ.] আলোচনার স্বাধীনতার সামাজিক মূল্যের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। আমরা আরো দেখেছি কিভাবে জন মিল্টন [খ্রি. ১৬০৮–১৬৭৪] পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে, এ রকম স্বাধীনতা জ্ঞানের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু যে যুগে সহিষ্ণুতার জন্য লড়াই করা হয়েছিল এবং বস্তুত তা অর্জনও করা হয়েছিল, তখন যে যুক্তিটি বেশি সাধারণভাবে ব্যবহার করা হতো তা হচ্ছে *সততার সাথে কোনো মত পোষণ করার জন্য মানুষকে শাস্তি দেওয়া অবিচার*; যেহেতু ঐ মত পোষণ করা ছাড়া তার উপায় ছিল না, কারণ প্রত্যয় ইচ্ছার ব্যাপার নয়। অন্য কথায়, যুক্তিটি হচ্ছে এই যে, *ভুল করা কোনো অপরাধ নয়* এবং তাই এ জন্য শাস্তি দেয়া অন্যায়। এই যুক্তি কিন্তু আলোচনার স্বাধীনতার বিষয়টি প্রমাণ করে না। দমননীতির সমর্থকরা উত্তরে বলতে পারেন : আমরা মানি যে ব্যক্তিগতভাবে ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করার জন্য কাউকে শাস্তি দেওয়া অন্যায়; কিন্তু আমরা যদি নিশ্চিত হই যে, এ রকম বিশ্বাস প্রচার করা ক্ষতিকর তাহলে তার প্রচার বন্ধ করে দেওয়া অন্যায় নয়; ঐ সব বিশ্বাস পোষণ করার জন্য নয়, কিন্তু সেগুলো জনসাধারণ্যে প্রকাশ করার জন্য লোকটিকে শাস্তি দেওয়া অন্যায় নয়। সত্য হচ্ছে এই যে, নীতিসমূহ পরীক্ষার ক্ষেত্রে 'ন্যায়' শব্দটি বিভ্রান্তিকর। সকল সদ্‌গুণই শারীরিক বা সামাজিক অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ন্যায়বিচার এর ব্যতিক্রম নয়। 'ন্যায্য' বলতে বোঝায় এক শ্রেণীর নিয়মাবলী বা নীতিমালা যাদের সামাজিক উপযোগিতা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সর্বোচ্চ বলে প্রমাণিত হয়েছে, এবং যেগুলো এতো গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকৃত যে তাদের জন্য তাৎক্ষণিক সুবিধার যাবতীয় বিবেচনা উপেক্ষা করা যায়। আর *সামাজিক উপযোগিতাই হচ্ছে একমাত্র পরীক্ষা*। সুতরাং মতামতের স্বাধীনতা এমন একটি জবরদস্ত সামাজিক উপযোগিতাসম্পন্ন নীতি যা অন্য সকল বিবেচনাকে তুচ্ছ করে দেয়—এই জিনিসটি দেখাতে না পারলে মতামত দমনের জন্য কোনো সরকারকে বলা নিরর্থক যে, তারা অন্যায় কাজ করছে। স্বাধীনতা সমাজের জন্য মূল্যবান—এই চিন্তাধারা গ্রহণ করার পেছনে সক্রেতিসের মনে একটি সত্য প্রেরণা কাজ করেছিল।

যুক্তিপ্রদর্শনপূর্বক চিন্তার স্বাধীনতার ন্যায্যতা প্রতিপাদনের কাজটি করেছেন জন স্টুআর্ট মিল। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত তাঁর *অন লিবার্টি* [স্বাধীনতা প্রসঙ্গে] বই-এ তিনি

বিষয়টি উপস্থাপন করেন। এই গ্রন্থে তিনি সাধারণভাবে স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং যতদূর পর্যন্ত ব্যক্তিস্বাধীনতা নিঃশর্ত ও অনাক্রমনীয় বিবেচিত হওয়া উচিত তার সীমা নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে চিন্তা ও আলোচনার স্বাধীনতার কথা বিবেচনা করা হয়েছে। অনেকেই হয়তো ভাবতে পারেন মিল ব্যক্তির বিপরীতে সমাজের দাবিগুলোর অবমূল্যায়ন ঘটিয়ে সমাজের ভূমিকাকে অসঙ্গতভাবে খাটো করেছেন ; কিন্তু প্রায় কেউই তাঁর প্রধান যুক্তিগুলোর ন্যায্যতা অস্বীকার করবেন না, কিংবা তাঁর সিদ্ধান্তগুলোর সাধারণ বিচক্ষণতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন না।

ব্যক্তি সদস্যের ব্যাপারে সমাজের পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপের ঔচিত্য পরীক্ষার কোনো প্রতিষ্ঠিত মান স্বীকৃত নয়—এ কথা বলে মিল ঐ পরীক্ষার সন্ধান পেয়েছেন [সমাজের] আত্ম-রক্ষায়, অর্থাৎ অন্য সদস্যদের ক্ষতি প্রতিরোধে। তিনি এই প্রস্তাবকে কোনো বিমূর্ত অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠা করেননি, করেছেন উপযোগের উপর—উপযোগ বৃহত্তম অর্থে-"যা প্রগতিশীল জীব হিসেবে মানুষের স্থায়ী স্বার্থসমূহের উপর স্থাপিত।" এরপর তিনি নিচের যুক্তি ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে, মত ও আলোচনা স্তব্ধ করা সর্বদাই ঐ সব স্থায়ী স্বার্থের পরিপন্থী। যাঁরা একটি মতকে দমন করেন (ধরে নেওয়া হলো তাঁরা সৎ লোক), তাঁরা এর সত্যতা অস্বীকার করেন, কিন্তু তাঁরা তো অভ্রান্ত নন। তাঁরা ভ্রান্ত হতে পারেন, বা সঠিক হতে পারেন, কিংবা অংশত ভ্রান্ত ও অংশত সঠিক হতে পারেন। ১. যদি তাঁরা ভ্রান্ত হন এবং যে মতটিকে তাঁরা ধ্বংস করলেন সেটি যদি সত্য হয়, তাহলে তাঁরা মানব জাতিকে একটি সত্য থেকে বঞ্চিত করলেন, বা বঞ্চিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। তাঁরা বলবেন : কিন্তু আমরা ন্যায় কাজই করেছি, কারণ আমাদের সামর্থ্যের উচ্চতম সীমা পর্যন্ত আমরা আমাদের বিচার-বুদ্ধিকে প্রয়োগ করেছি। তাই কি এখন আমাদেরকে বলে দেওয়া হবে যে আমাদের বিচারশক্তি ভ্রান্তিপ্রবণ বলে আমরা তা ব্যবহার করতে পারবো না? আমরা এমন একটি মতের প্রচার নিষিদ্ধ করেছি যেটি সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে তা অসত্য ও মারাত্মক ক্ষতিকর। এতে জনগণের কর্তৃত্বে করা যেকোনো কাজের চেয়ে অভ্রান্ততার বৃহত্তর দাবির ইঙ্গিত নেই। আমাদের যদি আদৌ কাজ করতে হয়, আমাদের অবশ্যই ধরে নিতে হবে যে আমাদের নিজের মতটি সত্য। এর উত্তরে মিল বলছেন :

> একটি মতের প্রতিবাদ করার সকল সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সেটি খণ্ডন করা হয়নি এই কারণে ঐ মতকে সত্য বলে ধরে নেওয়া, এবং খণ্ডন করার সুযোগ না দেওয়ার উদ্দেশ্যে মতটিকে সত্য বলে ধরে নেওয়া—এই দুই-এর মধ্যে বৃহত্তম পার্থক্য বিদ্যমান। আমাদের মতের বিরোধিতা করা এবং তা অপ্রমাণ করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই হচ্ছে সেই শর্ত যা কাজ করার উদ্দেশ্যে ঐ মতকে সত্য বলে ধরে নেওয়ায় আমাদের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করে। এবং অন্য কোনো শর্তেই মানবীয় গুণসম্পন্ন একটি প্রাণীর নির্ভুল হওয়ার যৌক্তিক নিশ্চয়তা থাকতে পারে না।

২. যে স্বীকৃত মতটিকে ভ্রান্তির অনধিকারপ্রবেশ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা হচ্ছে সেটি যদি সত্য হয়, সে ক্ষেত্রেও আলোচনা করতে না দেওয়া সাধারণ উপযোগের পরিপন্থী। একটি স্বীকৃত মত ঘটনাক্রমে সত্য হতে পারে (সম্পূর্ণরূপে সত্য হওয়া অতীব বিরল ঘটনা) ; কিন্তু এটি যে সত্য তার যৌক্তিক নিশ্চয়তা পাওয়া যেতে পারে কেবলমাত্র এই ঘটনায় যে, মতটি সম্পূর্ণরূপে আলোচিত হয়েছে, কিন্তু তাকে নড়ানো যায়নি।

আরো সচরাচর ও আরো গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ৩. সেই ক্ষেত্র যেখানে সংঘর্ষে লিপ্ত দুটি মতই আংশিকভাবে সত্য। এ ক্ষেত্রে জনমত বিবেচনায় নিতে অপরাগ এমন সব সত্য দিয়ে জনপ্রিয় একপেশে সত্যের ঘাটতি পূরণ করার উপযোগিতা প্রমাণ করা মিলের পক্ষে মোটেই কঠিন হয়নি। এবং তিনি পর্যবেক্ষণ করেন যে, সত্য ভাগাভাগি করে নেওয়া ঐ দুই মতের যেকোনোটির যদি শুধুমাত্র টিকে থাকার নয় বরং উৎসাহিত হওয়ার দাবি থেকে থাকে, তাহলে সেটি সংখ্যালঘুর পোষিত মতই হবে, কারণ ওটিই সেই মত "যা ঐ সময়ের জন্য উপেক্ষিত স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে।" দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি রুসো [১৭১২–১৮৭৮]–র মতবাদের কথা বলেন, যেসব মত মারাত্মক ক্ষতিকর বলে নিষিদ্ধ হতে পারতো এমন অনুমান করা যায়। আত্মতুষ্ট আঠারো শতকে রুসোর ঐ সব মত এসেছিল "এক উপকারী আঘাত হিসেবে, যা একপেশে মতের শক্ত পিণ্ডকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল।" প্রচলিত মতসমূহ অবশ্যই রুসোর মত অপেক্ষা সত্যের নিকটবর্তী ছিল, সেগুলোতে ভুলের পরিমাণ অনেক কম ছিল।

> তা সত্ত্বেও রুসোর মতবাদের মধ্যে ঠিক কাঙ্ক্ষিত সত্যগুলির একটা বিরাট অংশ নিহিত ছিল যা মতামতের [ঐতিহাসিক] ধারা বেয়ে রুসের তত্ত্বোপদেশের (doctrine) সাথে নেমে এসেছে ; আর এগুলিই হচ্ছে বন্যার জল সরে যাওয়ার পর পড়ে থাকা পলল স্তর।

মিলের প্রধান যুক্তিতর্কের প্রবাহটা এরকমই। বর্তমান লেখক মতামতের স্বাধীনতার যৌক্তিকতা কিছুটা ভিন্ন রূপে বর্ণনা করতে চান, যদিও তা মিলের যুক্তিক্রম অনুসারেই হবে। সভ্যতার অগ্রগতি যদি অংশত মানুষের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েও থাকে, তবু এ কথা সত্য যে ঐ অগ্রগতি আরো বেশি করে এবং ক্রমবর্ধমান হারে নির্ভর করছে মানুষের ক্ষমতাধীন বিভিন্ন বিষয়ের উপর। এগুলির মধ্যে বিশিষ্ট হচ্ছে : ১. জ্ঞানের অগ্রগতি এবং ২. নতুন পরিস্থিতির সাথে মানুষের অভ্যাস ও প্রতিষ্ঠান সমূহকে সুচিন্তিতভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়া। জ্ঞানের উন্নতি ও ভুলভ্রান্তি নিরসনের জন্য চাই আলোচনার অবাধ স্বাধীনতা। ইতিহাসে দেখা যায়, যখন গ্রীসে চিন্তাভাবনা করার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ছিল তখনই জ্ঞানের উন্নতি হয়েছিল। আরো দেখা যায় যে, আধুনিক কালে অনুসন্ধানের পথে বাধাবিঘ্ন সম্পূর্ণ দূরীভূত হওয়ায় এতো দ্রুত জ্ঞানের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে যে তা মধ্যযুগীয় ধর্মাধিষ্ঠানের গোলামদের কাছে শয়তানের কাজ বলে প্রতীয়মান হবে। তারপর, এটা সুস্পষ্ট যে, সামাজিক প্রথা, প্রতিষ্ঠান, ও নিয়মাবলীকে নতুন প্রয়োজন ও পরিবেশের সাথে পুনর্বিন্যস্ত করার জন্য অবশ্যই সেগুলির পক্ষে প্রচারণা ও বিরুদ্ধে সমালোচনা করার অবাধ স্বাধীনতা থাকতে হবে ; থাকতে হবে সবচেয়ে অজনপ্রিয় মতামত প্রকাশ করার অনিঃশেষ স্বাধীনতা, তা সেসব মত বিদ্যমান আবেগ–অনুভূতির নিকট যতোই অপরাধমূলক বিবেচিত হোক না কেন। যদি সভ্যতার ইতিহাসে শিক্ষণীয় কিছু থেকে থাকে তাহলে তা এই : *মানসিক ও নৈতিক অগ্রগতির একটাই সর্বোচ্চ শর্ত রয়েছে*, যা আয়ত্ত করা সম্পূর্ণরূপে মানুষের নিজের ক্ষমতার মধ্যেই সম্ভব *এবং সেটি হচ্ছে চিন্তা ও আলোচনার পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা*। এই স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাকে আধুনিক সভ্যতার সব চেয়ে মূল্যবান অর্জন বলে বিবেচনা করা যেতে পারে ; এবং সামাজিক প্রগতির শর্ত হিসেবে এটিকে অপরিহার্য বলে গণ্য করা উচিত। তাৎক্ষণিক সুবিধা লাভের যেসব হিসাবনিকাশ সময়ে সময়ে ঐ স্বাধীনতা লংঘনের দাবি করে বলে ভাবা যেতে পারে, সেগুলির চেয়ে অবশ্যই বেশি গুরুত্বপূর্ণ

হওয়া উচিত চিরস্থায়ী উপযোগিতা সংক্রান্ত বিবেচনা যার উপর ঐ স্বাধীনতার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত।

এটা স্পষ্ট যে এই সমুদয় যুক্তিতর্ক নির্ভর করছে এই ধারণার উপর যে মানবজাতির প্রগতি, অর্থাৎ তার বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক উন্নতি, একটি বাস্তব সত্য এবং তা মূল্যবান। ঐ যুক্তিতর্ক তেমন লোকের অন্তর স্পর্শ করবে না যিনি কার্ডিনাল নিউম্যানের মতো মনে করেন যে, "আমাদের এই মানবজাতির প্রগতি ও পূর্ণতা অর্জনে সক্ষমতা একটি স্বপ্নবিভ্রম মাত্র, কারণ প্রত্যাদেশ ভিন্ন কথা বলে।" এবং সঙ্গতভাবেই তিনি ঐ একই লেখকের এই প্রত্যয়ও মেনে নিতে পারেন যে, "যদি এই দেশটি [অর্থাৎ ইংল্যান্ড] এখন যে অবস্থায় আছে তার চেয়ে বিপুল পরিমাণে আরো কুসংস্কারাচ্ছন্ন, আরো ধর্মান্ধ, আরো অন্ধকারাচ্ছন্ন, এবং ধর্মের ব্যাপারে আরো ভয়ঙ্কর হতো তাহলে তা এ দেশের জন্য লাভের বৈ লোকসানের হতো না।"

মিলের লেখাটি প্রত্যেকেরই পড়ে দেখা উচিত। মিল যখন ঐ চমৎকার রচনাটি লিখছিলেন, তখন ঐ সময়ের (১৮৫৮) ইংরেজ সরকার অত্যাচারী শাসকদের প্রাণদণ্ড আইনসম্মত এই মতের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা শুরু করলেন এই যুক্তিতে যে মতটি অনৈতিক। সৌভাগ্যবশত মোকদ্দমাটি বেশি দিন চালিয়ে যাওয়া হয়নি। মিল বিষয়টির উল্লেখ করে বলেছেন, অত্যাচারী শাসকহত্যা (এবং, এর সাথে আমরা যোগ করতে পারি, অরাজকতা)-র মতো মতও এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নয় যে, "নৈতিক প্রত্যয়ের ব্যাপার হিসেবে যেকোনো মত, তা যতো অনৈতিক বলেই বিবেচনা করা হোক না কেন, প্রকাশ ও আলোচনা করার পূর্ণতম স্বাধীনতা থাকা উচিত।"

কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ যেখানে সমুচিত তেমন ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রগুলো নিতান্তই আপাত প্রতীয়মান. কারণ সেগুলো আসলে অন্য কোনো নিয়মের আওতায় পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি বিশেষ বিশেষ সহিংস কাজের জন্য সরাসরি প্ররোচনা দেওয়া হয়, তাহলে তা হস্তক্ষেপের জন্য একটি বৈধ ক্ষেত্র হতে পারে। কিন্তু প্ররোচনাটি অবশ্যই ইচ্ছাকৃত ও সরাসারি হতে হবে। যদি আমি বিদ্যমান বিভিন্ন সমাজের নিন্দা করে এবং একটি নৈরাজ্যের তত্ত্বকে সমর্থন করে একখানা বই লিখি এবং একজন লোক সেটি পড়ে সাথে সাথে সাংঘাতিক ক্ষতিকর কিছু করে বসে, তাহলে হয়তো এটা পরিষ্কার প্রতিপাদিত হয় যে আমার বইটি ঐ ব্যক্তিকে একজন নৈরাজ্যবাদীতে পরিণত করেছে এবং তাকে ঐ অপরাধ করতে প্ররোচিতও করেছে ; কিন্তু ঐ লোকটি যে নির্দিষ্ট অপরাধটি করেছে সেটি করার জন্য আমার বই-এ যদি সরাসরি উস্কানি না থাকে, তাহলে আমাকে সাজা দেওয়া বা বইখানিকে নিষিদ্ধ করা হবে অবৈধ।

এটা ধারণা করা যায় যে, এমন সব জটিল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যে সব ক্ষেত্রে সরকার স্বাধীনতার নীতি ভঙ্গ করতে দারুণভাবে প্রলুব্ধ হতে পারে, এবং জনগণের চেঁচামেচিতেও তারা পরিচালিত হতে পারে ঐ একই পথে। একটা ঘটনার কথা ধরে নেওয়া যাক, যা অত্যন্ত অসম্ভব হলেও আলোচ্য প্রসঙ্গটিকে বিশদ ও দ্ব্যর্থহীন করবে। কল্পনা করুন যে, অতীব আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের একজন মানুষ যিনি তাঁর নিজের ধ্যান-ধারণাকে, তা সেগুলো যতো অযৌক্তিকই হোক না কেন, অপরের মধ্যে সংক্রমিত করার আশ্চর্য ক্ষমতা রাখেন ; সংক্ষেপে একজন আদর্শ ধর্মীয় নেতা, যিনি নিশ্চিত বিশ্বাস করেন যে আগামি কয়েক মাসের মধ্যে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এ হেন ব্যক্তি দেশের মধ্যে ঘুরে ঘুরে প্রচার ও পুস্তিকা বিতরণ করতে থাকেন। তাঁর কথাগুলো বিদ্যুতের মতো কাজ করে এবং অশিক্ষিত

ও অর্ধশিক্ষিত জনগণ বিশ্বাস করে যে শেষ বিচারের দিনের প্রস্তুতির জন্য তাদের হাতে আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ সময় আছে। দলে দলে লোক তাদের পেশা ছেড়ে, কাজ ফেলে যে সামান্য সময়টুকু তাদের হাতে আছে তা প্রার্থনায় এবং ঐ ধর্মগুরুর বক্তৃতা শোনায় ব্যয় করতে শুরু করে। এই প্রকাণ্ড ধর্মঘটে গোটা দেশ অচল হয়ে পড়ে। যান চলাচল ও শিল্প উৎপাদন থেমে যায়। জনগণের সম্পূর্ণ আইনগত অধিকার রয়েছে তাদের কাজ ছেড়ে দেওয়ার, ধর্মগুরুটিরও সম্পূর্ণ আইনি অধিকার আছে তাঁর মত প্রচার করার যে, পৃথিবীর ধ্বংস আসন্ন—যে ভ্রান্ত মত যিশু খ্রিস্ট ও তাঁর অনুসারীরা তাঁদের সময়ে পোষণ করতেন। এ কথা বলা যায় যে, বেপরোয়া দুর্বৃত্তির বেপরোয়া প্রতিকার আছে এবং ঐ ধর্মোন্মাদকে দমন করার তীব্র প্রলোভন সৃষ্টি হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি আইন ভঙ্গ করছেন না, কিংবা কাউকে তা করতে উদ্বুদ্ধ করছেন না, অথবা শান্তি ভঙ্গের কারণ হচ্ছেন না, তাঁকে গ্রেফতার করা হবে একটি জ্বলন্ত উৎপীড়নমূলক কাজ। অনেকেই মনে করবেন যে, একটা প্রতারণামূলক ভ্রান্তি প্রচারের সাময়িক ক্ষতি যতো বড়োই হোক না কেন, তাকে ছাড়িয়ে যাবে স্বাধীনতার ঘড়ির কাঁটা পেছন দিকে ঠেলে দেওয়ার ক্ষতি। বাক্-স্বাধীনতা কখনো কখনো সুনির্দিষ্ট ক্ষতি করতে পারে এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। প্রত্যেক ভালো জিনিসই কখনো কখনো ক্ষতি করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সরকার, যারা সর্বনাশা ভুল করে ; আইন, যা প্রায়ই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অসহনীয় ও পক্ষপাতমূলক হয়ে দেখা দেয়। এবং খ্রিস্টানদেরকে যখন এই অপ্রীতিকর বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, তাদের ধর্মের একচেটিয়া [আধ্যাত্মিক] মুক্তির ধারণা [মানুষের] অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের কারণ হয়েছে, তখন ঐ ধর্মের সমর্থনে তারা কি আর কোনো কৈফিয়ত হাজির করতে পারে?

চিন্তার স্বাধীনতার নীতি সমাজ প্রগতির মহৎ শর্ত হিসেবে একবার গৃহীত হলে তা সাধারণ সুবিধার ক্ষেত্র অতিক্রম করে চলে যায় উচ্চতর সুবিধার ক্ষেত্রে, যাকে আমরা বলি ন্যায্যতা। অন্য কথায়, এটি একটি অধিকারে পরিণত হয় যার উপর প্রত্যেক মানুষেরই ভরসা রাখতে পারা উচিত। এই অধিকার শেষ পর্যন্ত উপযোগিতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত—এই সত্য সরকার কর্তৃক বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উপযোগিতার যুক্তিতে ঐ অধিকার খর্ব করাকে ন্যায্যতা দেয় না।

সম্প্রতি ইংল্যান্ডে ব্ল্যাস্‌ফিমি বা ধর্মনিন্দার জন্য অনেকটা আতঙ্কজনক হারে শাস্তি প্রদান এই বিষয়টির দৃষ্টান্তস্থল। সাধারণত ধরে নেওয়া হতো যে, ব্ল্যাস্‌ফিমি আইন (উপরে দৃষ্টব্য, পৃ. ৬৭) বাতিল করা না হলেও কার্যত অচল ছিল। কিন্তু ১৯১১ সালের ডিসেম্বর থেকে [পরবর্তী বছর খানেকের মধ্যে?] আধা ডজন মানুষ ঐ অপরাধে গ্রেফতার হয়েছেন। এইসব মামলায় গরিব ও কম-বেশি অশিক্ষিত লোকজন খ্রিস্টীয় ধর্মমতগুলিকে আক্রমণ করেছিল এমন ভাষায় যাকে স্থূল ও ক্রোধাত্মক বলে বর্ণনা করা যায়। কোনো কোনো বিচারক এই মত পোষণ করেন বলে মনে হয় যে, মূল নীতিসমূহ আক্রমণ করা ব্ল্যাস্‌ফিমি নয় যদি 'বিতর্কের শোভনতা' বজায় রাখা হয়, কিন্তু 'নোংরা' আক্রমণ হলে তা ব্ল্যাস্‌ফিমি। এই অবস্থান আইনগত ব্ল্যাস্‌ফিমির এক নতুন সংজ্ঞার ইঙ্গিত দেয় এবং তা ঐ আইনের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। জেম্‌স এফ. স্টিফেন (১৮২৯–১৮৯৪) দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে লর্ড হেল [১৬০৯–১৬৭৬]–এর সময় থেকে ফুট–এর বিচার (১৮৮৩) পর্যন্ত বিচারকেরা একটিই সূত্র নির্ধারণ করে এসেছেন এবং তা একই নীতির উপর স্থাপন করে এসেছেন :

সূত্রটি হচ্ছে এই যে, খ্রিস্টধর্মের মূল নীতিগুলির সত্যতা অস্বীকার করা অথবা সেগুলিকে অবজ্ঞা বা উপহাসের বিষয় করা একটি অপরাধ ; এবং এর ভিত্তিগত নীতিটি হচ্ছে এই যে, খ্রিস্টধর্ম দেশের আইনের একটি অংশ।

এ ধরনের মামলার যে কৈফিয়ত দেওয়া হয়, তা হচ্ছে এই যে সেসব মোকদ্দমার উদ্দেশ্য হলো ধর্মীয় অনুভূতিকে বিদ্রূপ ও উপহাস থেকে রক্ষা করা। স্যর জে. এফ. স্টিফেন পর্যবেক্ষণ করেছিলেন :

> আইন যদি সত্যিই নিরপেক্ষ হতো এবং বিশ্বাসীদের অনুভূতিতে আঘাত করে বলে শুধু ধর্মনিন্দার জন্য শাস্তি দিতো, তাহলে তার উচিত ছিল অবিশ্বাসীদের অনুভূতিকে আঘাত করে এমন প্রচারণাকেও শাস্তি দেওয়া। ধর্মের বেশি আন্তরিক ও উৎসাহী রূপগুলো যারা সেগুলো বিশ্বাস করে না তাদের জন্য চরম বিরক্তিকর।

যদি আইন কোনো অর্থেই খ্রিস্টীয় ধর্মনীতির সত্যতা স্বীকার না করে, তাহলে তাকে স্যালভেশন আর্মি [উদ্ধার বাহিনী]–র ক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়ম প্রয়োগ করতে হতো। প্রকৃত পক্ষে আইনের "ব্যাখ্যাদান এবং ন্যায্যতা প্রদর্শন করা যেতে পারে শুধুমাত্র নির্যাতনের নীতির ভিত্তিতে—যে নীতিকে আমি আইনের সত্যিকারের নীতি বলে মনে করি।" খ্রিস্টধর্মের বিরোধীরা ন্যায্যতই বলতে পারেন : যদি খ্রিস্টধর্ম মিথ্যাই হয়, তাহলে তাকে শুধুমাত্র মার্জিত ভাষায় আক্রমণ করতে হবে কেন? এর সত্যতার উপরই এর কল্যাণকরত্ব নির্ভর করে। যদি আপনারা এর মিথ্যাত্ব মেনে নেন, তাহলে আপনারা এ ধারণা পোষণ করতে পারেন না যে, এই ধর্ম বিশেষ রক্ষাকবচ পাওয়ার দাবিদার। কিন্তু আইন খ্রিস্টধর্মীর উপর কোনো সংযম আরোপ করে না, তার দেওয়া শিক্ষা যারা তার সাথে একমত নয় তাদের কাছে যতোই অপমানকর হোক্ না কেন। সুতরাং অপরাধজনক ভাষার ব্যবহার বন্ধ করার নিরপেক্ষ বাসনার উপর প্রতিষ্ঠিত নয় আইন। অতএব তা প্রতিষ্ঠিত এই আনুমানিক ধারণার উপর যে, খ্রিস্টধর্ম সত্য। আর তাই [আমরা বলতে পারি যে] এর নীতিই হচ্ছে নির্যাতন।

অবশ্য ব্ল্যাস্‌ফিমি সংক্রান্ত সাধারণ আইন বর্তমানে যেভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে তাতে, যেসব অবিশ্বাসীর প্রগতির অনুকূল অবদান রাখার যোগ্যতা আছে, তাদের স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এ আইন মত পোষণের ও আলোচনার স্বাধীনতা সংক্রান্ত যে উচ্চতম নীতি রয়েছে তা লংঘন করে। অশিক্ষিত লোকেরা যে বিশেষ ভঙ্গিতে কথা বলতে জানে সেভাবে বলতে তাদেরকে বাধা দেয় ঐ আইন ; অথচ যারা অন্যভাবে বেড়ে উঠেছে তারা ঐ কথাই, কোনো প্রকার শাস্তি ছাড়াই, অনেক বেশি কার্যকরভাবে ও অনেক বেশি উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে বলে। গত দুবছরে [আ. ১৯১১–১৯১২] যেসব লোককে কারারুদ্ধ করা হয়েছে তাদের কেউ কেউ শুধু কুরুচিপূর্ণ ভাষায় এমন সব মতামত ব্যক্ত করেছিল যেগুলি কমবেশি মার্জিতভাবে বিভিন্ন বই–এ বলা হয়েছে। এ সব বই যেকোনো বিশপের (যদি তিনি নেহাত অজ্ঞ না হন) গ্রন্থাগারেই রয়েছে এবং আইনের যদি কিছুমাত্র কার্যকারিতা থেকে থাকে, তাহলে তা ঐ পুস্তকগুলির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা উচিত ছিল। অতএব ঐ আইন এখন যেভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে তাতে তা শুধু মন্দ রুচিকেই দণ্ড দেয় এবং অশিক্ষিত মুক্তচিন্তকদের উপরই নানা নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেয়। যদি তাদের কথা তাদের শ্রোতাদের এত দূর বিরক্তি উৎপাদন করে থাকে যে, কোনো রকম গোলমালের সৃষ্টি হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা উচিত জনশৃংখলা ভঙ্গের জন্য,[১] তাদের কথাগুলো ধর্মনিন্দামূলক বলে নয়। যে ব্যক্তি

কোনো গির্জার কিংবা এমন কি কোনো প্রাসাদতুল্য বিশপভবনের ক্ষতিসাধন করে বা সেখান থেকে কিছু চুরি করে, তার বিরুদ্ধে মামলা হয় ধর্মস্থান অপবিত্র করার জন্য নয়, বরং চুরি কিংবা বিদ্বেষমূলক ক্ষতিসাধন কিংবা ওরকম কিছুর জন্য।

ধর্মনিন্দার জন্য শাস্তি তুলে দেওয়ার প্রস্তাব কমন্স সভায় (চার্লস ব্রাডলাফ [১৮৩৩–১৮৯১] কর্তৃক) পেশ করা হয়েছিল ১৮৮৯ সালে এবং তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। এ সংস্কারটির প্রয়োজন অতি জরুরি। এতে "বিভিন্ন সময়ে যেসব কলঙ্কজনক মামলা হয়ে থাকে তা নিবারিত হবে। এসব মামলায় একটি ক্ষেত্রেও কেউ কখনো উপকৃত হয়নি, যে উদ্দেশ্যে ওগুলো করা হয়েছিল তার সুরাহা তো আরো হয়নি। বরং কখনো কখনো এসব মোকদ্দমা ধর্মের আবরণে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ চরিতার্থ করার একটা পথ করে দেয়।"[২]

কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যুক্তির সংগ্রাম শেষ হয়েছে এমন একটি পরিণতির মধ্য দিয়ে যা এখন স্বাধীনতার চূড়ান্ত ও স্থায়ী বিজয় বলে প্রতীয়মান হয়। সবচেয়ে সভ্য ও প্রগতিশীল দেশগুলোতে আলোচনার স্বাধীনতা একটি মৌলিক নীতি হিসেবে স্বীকৃত। প্রকৃতপক্ষে আমরা বলতে পারি এটি জ্ঞানোজ্জ্বলতার একটি পরীক্ষা [বা মাপকাঠি], এবং যেকোনো পথচারী চটপট স্বীকার করতে প্রস্তুত যে রাশিয়া[৩] ও স্পেনের[৪] মতো দেশ, যেখানে মতামত কমবেশি শৃঙ্খলিত, এজন্য তাদের প্রতিবেশীদের চেয়ে অবশ্যই কম সভ্য বলে বিবেচিত হবে। গণ্য করার মতো সকল বুদ্ধিজীবী মানুষই এটা মেনে নিয়েছেন যে স্বর্গে বা মর্ত্যে এমন কোনো বিষয় নেই যার অনুসন্ধান, ধর্মশাস্ত্রীয় ধারণাগুলির প্রতি সশ্রদ্ধ মান্যতা অথবা সেগুলির উল্লেখ ব্যতীত, করা অনুচিত। কোনো বিজ্ঞানীই তাঁর গবেষণা প্রকাশ করতে এখন আর ভয় পান না, তা সেসব গবেষণা প্রচলিত বিশ্বাসসমূহের জন্য যে পরিণতিই ডেকে আনুক না কেন। ধর্মীয় নীতিমালা এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সমালোচনা এখন স্বাধীনভাবে করা যায়। আশাবাদী মানুষেরা নিশ্চিত বোধ করতে পারেন যে—১. এই বিজয় স্থায়ী, ২. বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা এখন মানবজাতির চিরকালীন সম্পত্তি হিসেবে সুরক্ষিত, এবং ৩. যেসব শক্তি এখনো এর বিরুদ্ধে এবং পৃথিবীর অধিকতর পশ্চাৎপদ এলাকাগুলোতে এর ক্রমাগত প্রসারের বিরুদ্ধে কাজ করছে, ভবিষ্যতে তাদের পতন হবে। তথাপি ইতিহাস এমন সঙ্কেত দিতে পারে যে এই প্রত্যাশা নিশ্চিত নয়। আমরা কি নিঃসন্দেহ হতে পারি যে, কোনো বড় পরাজয় আসতে পারে না? কারণ আমরা দেখেছি, আলোচনা ও কল্পনার স্বাধীনতা গ্রীক ও রোমান জগতে পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছিল, এবং তার পর খ্রিস্টধর্মের আকারে এক অভাবিতপূর্ব শক্তি এসে মানবমনের উপর শৃঙ্খল স্থাপন করলো, স্বাধীনতাকে পিষে মারলো, এবং মানুষের উপর চাপিয়ে দিলো তার হারিয়ে যাওয়া স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের এক ক্লান্তিকর সংগ্রাম। এটা কি একেবারেই অকল্পনীয় যে, একই ধরনের কিছু একটা আবারও ঘটতে পারে? এবং নতুন কোনো শক্তি অজানা উৎস থেকে উঠে এসে আকস্মিকভাবে পৃথিবীকে হতচকিত করে আবারও অনুরূপ একটা পরাজয় ঘটাতে পারে?

তেমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কিন্তু কিছু কিছু বিবেচ্য বিষয় রয়েছে যেগুলো ঐ সম্ভাবনাকে প্রায় অসম্ভব করে রেখেছে (কোনো আকস্মিক মহাবিপর্যয় ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে একেবারে মুছে ফেলার সম্ভাবনা ব্যতিরেকে)। এখনকার ও প্রাচীন যুগের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিস্থিতির মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে। বস্তুজগৎ সম্পর্কিত সামান্য কয়েকটি মাত্র প্রকৃত বিষয় গ্রীকদের জানা ছিল। যা শেখানো হতো তার অনেকটাই ছিল

অপ্রমাণিত। (গণিত ছাড়া) বিজ্ঞানের যে দুটো শাখায় গ্রীকরা সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি সাধন করেছিল সেই জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ভূগোল সম্বন্ধে তারা কি জানতো এবং আমরা কি জানি তা তুলনা করুন। যখন কাজ করার জন্য প্রদর্শিত সত্যের সংখ্যা এতো কম ছিল, তখন কল্পনা করার অবকাশ ছিল বিস্তৃততম। এখন কথা হচ্ছে, একটি তত্ত্বের অনুকূলে কতিপয় প্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্বকে নিরুদ্ধ করা, প্রতিষ্ঠিত সত্যের একেকটা গোটা তন্ত্রকে চেপে দেওয়া থেকে অত্যন্ত ভিন্ন জিনিস। যদি একদল জ্যোতির্বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে পৃথিবী সূর্যের চার দিকে ঘোরে এবং অপর দল মনে করেন যে সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, কিন্তু কোনো দলই স্বীয় প্রস্তাব প্রমাণ করতে সক্ষম হচ্ছেন না, তাহলে দমনমূলক শক্তির অধিকারী কর্তৃপক্ষের পক্ষে যেকোনো এক দলকে চুপ করিয়ে দেওয়া সহজ। কিন্তু যদি একবার সকল জ্যোতির্বিজ্ঞানী একমত হন যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে, তাহলে লোকজনকে একটা মিথ্যা মত গ্রহণ করানো কর্তৃপক্ষের জন্যই হতাশাজনক কাজ। সংক্ষেপে বলতে গেলে—যেহেতু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি সম্পর্কে বিপুল পরিমাণ অবধারিত তথ্য এখন যুক্তির অধিকারে এসে গেছে, তাই যে যুগে খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব তাকে বন্দী করেছিল, তখনকার চেয়ে যুক্তি এখন অনেক বেশি শক্ত অবস্থানে রয়েছে। এই সব প্রকৃত তথ্য যুক্তির দুর্গস্বরূপ। তা ছাড়া, ভবিষ্যতে জ্ঞানের নিরন্তর অগ্রগতি কিসে নিরুদ্ধ হতে পারে তা বোঝা দুষ্কর। প্রাচীন যুগে এই প্রগতি নির্ভরশীল ছিল অল্প কয়েক জনের উপর ; আজকাল বহু জাতি এই কাজে অংশ নিচ্ছে। বিজ্ঞানের গুরুত্ব সম্পর্কে আজ এক সাধারণ প্রত্যয় বিরাজমান, যা প্রাচীন গ্রীসে প্রাধান্য পায়নি। আর, বস্তুগত সভ্যতার অগ্রগতি বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল—এই পরিস্থিতি সম্ভবত একটি বাস্তব গ্যারান্টি যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা আকস্মিকভাবে থেমে যাবে না। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান এখন ধর্মের মতোই একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

কিন্তু যদিও বিজ্ঞান যথেষ্ট নিরাপদ বলেই মনে হয়, এমনটা সব সময়ই সম্ভব যে, যেসব দেশে বিজ্ঞানচেতনাকে মর্যাদা দেওয়া হয় তবুও সেখানে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রশ্ন নিয়ে চিন্তাভাবনার উপর কঠিন প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হতে পারে। রাশিয়াতে অনেক বিজ্ঞানী আছেন যাঁরা কারো থেকে কম নন, এবং সেই রাশিয়ার রয়েছে কুখ্যাত সেন্সর ব্যবস্থা। কোনো ভাবেই অভাবনীয় নয় যে, এখন মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে এমন দেশগুলোতে দমনব্যবস্থা চালু হতে পারে। যদি কোনো বিপ্লবী সামাজিক আন্দোলনের জয় হয়, যে আন্দোলনের নেতারা (ফরাসি বিপ্লবের নেতাদের মতো) কোনো বিধিব্যবস্থায় বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং তাদের বিশ্বাস [সকলের উপর] চাপিয়ে দিতে দৃঢ়সঙ্কল্প, তাহলে, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, প্রায় অপরিহার্যরূপেই জবরদস্তির আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকে। এতৎসত্ত্বেও, যদিও এটা ধরে নেওয়া বোকামি হবে যে ভবিষ্যতে ঘড়ির কাঁটা উল্টো দিকে ঘোরানোর চেষ্টা নাও হতে পারে, তবুও স্বাধীনতা এখন রোমান সাম্রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি অনুকূল অবস্থানে আছে। কারণ সে সময়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতার সামাজিক গুরুত্বের মূল্যায়ন হতো না, কিন্তু এখন, ঐ স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যে দীর্ঘ সংঘর্ষের প্রয়োজন হয়েছিল, তার ফলে মানুষ সচেতনভাবে তার মূল্য অনুধাবন করে। সম্ভবত এই দৃঢ় প্রত্যয় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সকল চক্রান্ত প্রতিহত করতে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে দেখা দেবে। ইতোমধ্যে *চিন্তার স্বাধীনতা যে মানব-প্রগতির একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য* এই ধারণা তরুণমনে মুদ্রিত করে দেওয়ার জন্য কোনো প্রচেষ্টাই বাদ রাখা উচিত নয়। কিন্তু এমন আশংকা করা

যেতে পারে যে, ভবিষ্যতে বেশিদিন ধরে এ কাজটি করা হবে এমন সম্ভাবনা কম। কারণ আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার পদ্ধতিগুলো কর্তৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এটা সত্য যে, নিজেদের মতো চিন্তা করার জন্য বাচ্চাদেরকে কখনো কখনো উৎসাহিত করা হয়। কিন্তু মাতা, পিতা, বা শিক্ষক যিনি এই চমৎকার উপদেশটি দেন, তিনি নিশ্চিত বিশ্বাস করেন যে, বাচ্চার নিজের মতো করে চিন্তা করার ফল তার গুরুজনরা যেসব মত কাম্য বলে মনে করেন সেগুলোর সাথে মিলে যাবে। এটা ধরে নেওয়া হয় যে, শিশুটি এমন সব নীতি অবম্বলন করে যুক্তি প্রদর্শন করবে যেগুলো কর্তৃপক্ষ আগেই তার মধ্যে সঞ্চারিত করে রেখেছে। কিন্তু যদি তার নিজের মতো করে করা চিন্তা ঐ নৈতিক বা ধর্মীয় নীতিমালার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলার আকার ধারণ করে, তাহলে তার মাতাপিতা বা শিক্ষকরা, অত্যন্ত ব্যতিক্রমী মানুষ না হয়ে থাকলে অতিশয় অসন্তুষ্ট হবেন এবং নিশ্চয়ই তাকে নিরুৎসাহিত করবেন। অবশ্য অনন্য সম্ভাবনাপূর্ণ বাচ্চাদেরই কেবল চিন্তার স্বাধীনতা এতো দূর অবধি যাবে। এই অর্থে একথা বলা যেতে পারে যে, "তোমার পিতা ও মাতাকে অবিশ্বাস করো"—এই হচ্ছে প্রতিশ্রুতিপূর্ণ প্রথম আদেশ। এটা শিক্ষার একটা অঙ্গ হওয়া উচিত যে, বাচ্চারা বুঝতে শেখার মতো বয়সের হলেই তাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে কর্তৃত্বের জোরে তাদেরকে যা বলা হয় তা গ্রহণ করা কখন যুক্তিযুক্ত এবং কখন নয়।

তথ্যনির্দেশ

১. জার্মানিতে ধর্মনিন্দা একটি অপরাধ ; কিন্তু এটি প্রমাণ করতে হবে যে, কাউকে সত্যিই আঘাত দেওয়া হয়েছে এবং এই অপরাধের শাস্তি তিনদিন কারাবাসের বেশি নয়।

২. [এই অনুচ্ছেদ ও এর পূর্ববর্তী দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে দেওয়া] উদ্ধৃতিগুলো নেওয়া হয়েছে *ফোর্টনাইটলি রিভিউ*, মার্চ ১৮৮৪, পৃ. ২৮৯–৩১৮, তে প্রকাশিত সার জে. এফ. স্টিফেনের নিবন্ধ "ব্ল্যাস্‌ফিমি অ্যান্ড ব্ল্যাস্‌ফিমাস লাইব্‌ল" [ধর্মনিন্দা ও ধর্মানিন্দামূলক কুৎসা] থেকে।

৩. বিউরি যখন লিখছেন (১৯১২–১৪) তখন রাশিয়া ছিল জার শাসিত এক প্রতিক্রিয়াশীল মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্য। ঠিক ঐ সময়টিতে রাজত্ব করছিলেন শেষ জার দ্বিতীয় নিকোলাস (—) যিনি ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবে উচ্ছেদ হয়ে যান।

গ্রন্থপঞ্জি

সাধারণ

বেন, এ. ডব্লিউ.। *দা হিস্ট্রি অব ইংলিশ র‍্যাশনালিজম ইন দ্য নাইনটিন্থ সেনচুরি* [উনিশ শতকে ইংল্যান্ডে যুক্তিবাদের ইতিহাস],। ২ খণ্ড। ১৯০৬। (অত্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ও মূল্যবান বই।)

রবার্টসন, জে.এম.। *অ্যা শর্ট হিস্ট্রি অব ফ্রি থট : অ্যানশিএন্ট অ্যান্ড মডার্ন* [মুক্ত চিন্তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : প্রাচীন ও আধুনিক যুগ], ২ খণ্ড। ১৯০৬। (ব্যাপক, কিন্তু প্রধান প্রধান চিন্তাবিদ সম্পর্কিত বিবরণ অনিবার্যভাবেই সংক্ষিপ্ত, যেহেতু গ্রন্থের ক্ষেত্র অত্যন্ত বৃহৎ। তবে বিচার-বিবেচনাগুলো সর্বদা স্বাধীন।)

লেকি, ডবলিউ. ই. এইচ.। *হিস্ট্রি অব দ্য রাইজ অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্স অব দ্য স্পিরিট অব র‍্যাশনালিজম ইন ইউরোপ* [ইউরোপে যুক্তিবাদী চেতনার উত্থান ও প্রভাবের ইতিহাস]। ২ খণ্ড। (প্রথম প্রকাশ ১৮৬৫।)

হোআইট, এ.ডি.। *অ্যা হিস্ট্রি অব দ্য ওআরফেআর অফ সায়েন্স উইথ থিঅলজি ইন ক্রিস্টেনডম* [খ্রিস্টীয় জগতে ধর্মতত্ত্বের সাথে বিজ্ঞানের যুদ্ধ : একটি ইতিবৃত্ত], ২ খণ্ড। ১৮৯৬।

গ্রীক চিন্তাধারা

গমপার্জ, টিএইচ.। *গ্রীক থিংকার্স* [গ্রীক চিন্তাবিদগণ] (ইংরেজি অনুবাদ),। ৪ খণ্ড (১৯০১–১৯১২)।

ইংরেজ ঈশবাদিগণ

স্টিফেন, লেস্‌লি। *হিস্ট্রি অব ইংলিশ থট ইন দ্য এইটিন্থ সেনচুরি* [আঠারো শতকে ইংরেজ জাতির চিন্তাধারার ইতিহাস]। ১ম খ. ১৮৮১।

আঠারো শতকের ফরাসি মুক্ত চিন্তাবিদগণ

মর্লে, জে.। *ভল্‌তেয়ার। দিদ্‌রো অ্যান্ড দা এনসাইক্লোপিডিস্ট* [দিদ্‌রো ও বিশ্বকোষ প্রণেতাগণ]। *রুসো*। (বর্তমান গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায় দ্র.)।

বাইবেলের যুক্তিবাদী সমালোচনা (উনিশ শতক)

এনসাইক্লোপিডিয়া বিব্লিকা [বাইবেলীয় বিশ্বকোষ]. ৪ খণ্ড। নির্বাচিত নিবন্ধাবলী।

কনিবেয়ার, এফ.সি.। *হিস্ট্রি অফ নিউ টেস্টামেন্ট ক্রিটিসিজম* [বাইবেলের 'নতুন নিয়ম'-এর সমালোচনার ইতিহাস]। ১৯১০।

ডাফ, এ.। *হিস্ট্রি অব ওল্ড টেস্টামেন্ট ক্রিটিসিজম* [বাইবেলের 'পুরাতন নিয়ম'-এর সমালোচনার ইতিকথা]। ১৯১০।

উৎপীড়ন ও ইনকুইজিশন

লী, এইচ.। *অ্যা হিস্ট্রি অব দা ইনকুইজিশন অব দা মিডল এজেস* [মধ্যযুগের 'ইনকুইজিশন' বা ধর্মীয় বিচার প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস],। ৩ খণ্ড। ১৮৮৮।

—।*অ্যা হিস্ট্রি অব দা ইনকুইজিশন অফ স্পেন* [স্পেনের 'ইনকুইজিশন'-এর ইতিহাস] ,৪ খণ্ড। ১৯০৬।

হেইন্‌স, ই. এস.পি.। *রিলিজিয়াস পার্সিকিউশন* [ধর্মীয় নির্যাতন]। ১৯০৪।

ফেরেরের বিষয়টির জন্য দ্রষ্টব্য :

আর্চার, ডবলিউ। *দা লাইফ, ট্রায়াল অ্যান্ড ডেথ অফ ফ্যান্সিসকো ফেরের* [ফ্যান্সিস্‌কো ফেরেরের জীবন, বিচার ও মৃত্যু]। ১৯১১।

ম্যাককাব, জে.। *দা মারটারডম অফ ফেরের* [ফেরেরের শাহাদত]। ১৯০৯।

সহনশীলতা

রুফিনি, এফ.। *রিলিজিয়াস লিবার্টি* [ধর্মীয় স্বাধীনতা] (ইংরেজি অনুবাদ)। ১৯১২

লুৎসাত্তি, এল.। *লিবার্টি অব কনশ্যান্স অ্যান্ড সায়েন্স* [বিবেক ও বিজ্ঞানের মুক্তি] (ইতালীয় ভাষায়)। এই গ্রন্থে লুৎসাত্তির প্রবন্ধগুলি যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ।

অনুবাদকের সংযোজন :

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা। ১৯৬৮ সংস্করণ

ক্যানন, জন ও অন্যান্য (সম্পা.)। *দা ব্ল্যাকওয়েল ডিকশনারি অফ হিস্টরিয়ান্স* {ব্ল্যাকওয়েল ইতিহাসবিদ অভিধান}। অক্সফোর্ড ও নিউইয়র্ক : ব্যাসিল ব্ল্যাকওয়েল, ১৯৮৮।